স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বতন্ত্র এক নারী

পূর্বা

স্বর্ণকুমারী দেবী
স্বতন্ত্র এক নারী

সম্পাদনা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
বি শ্ব ভা র তী



কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ ◆ ধীরেন শাসমল

পূর্বা কর্তৃক ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।
স্টাইলোকম্‌প্‌ ৫ ডাফ লেন কলকাতা ৬ কর্তৃক কমপিউটার টাইপ সেটিং এবং
কমলা প্রেস ২০৯এ বিধান সরণি কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩

সূচিপত্র

ভূমিকা

বঙ্গভূমিতে একবাক্যে যদি প্রধান তিন মহিলা-ঔপন্যাসিকের নাম করতে হয় তো তাঁরা হলেন, কালের দিক থেকে যথাক্রমে স্বর্ণকুমারী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবী আজ থেকে প্রায় সাত দশক পূর্বে গত হয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আর মহাশ্বেতা দেবী এখনো আমাদের মধ্যে থেকে লিখে চলেছেন। প্রায় দেড়শো বছরের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে মহিলা-ঔপন্যাসিকের সংখ্যা খুবই সামান্য, আর উল্লেখযোগ্যের মতো নাম পাঁচ-সাতজনের বেশি তো নয়। বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা-ঔপন্যাসিকের নাম নিঃসংশয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী। বছরখানেক পূর্বে স্বর্ণকুমারীর রচিত প্রবন্ধের একটি নির্বাচিত সংগ্রহ প্রকাশিত হলে বুদ্ধিজীবী বাঙালির মনে নতুন করে এই বিস্মৃত লেখিকার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা দেয়। এখন আমাদের দেশে লেখাপড়া জ্ঞানচর্চার কাজও দিন ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি দেখে করার একটা রেওয়াজ রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কারও সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা-চর্চা করতে গেলে তাঁকে অন্তত একশো, একশো পঁচিশ, দেড়শো বা দুশো বছর আগে জন্মাতে হবে! তবে প্রকাশক তাঁর সম্পর্কে বই ছাপবেন, সম্পাদক তাঁর সম্পর্কে লেখা সংগ্রহ করবেন, লেখকরা তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লিখবেন এবং পাঠকরা জন্মশতবর্ষে, সার্ধশতবর্ষে বা দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে লেখা রচনাদি পাঠ করবেন। যদি জন্মের তারিখ মনের মতো না মেলে তো মৃত্যুরও শতবর্ষ-সার্ধশতবর্ষ ইত্যাদি চলতে পারে। গত চার দশকে এই প্রবণতা এমনই দানা বেঁধে উঠেছে যে, আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ ছাড়া আমরা লেখালেখি চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার উৎসাহ যেন হারিয়ে ফেলেছি! গবেষক বা লেখকরা কাজকর্ম করতে চাইলেও বইয়ের প্রকাশক ও পত্রপত্রিকার সম্পাদকেরা এক্ষেত্রে অনুকূল মনোভাব দেখাতে প্রস্তুত নন। স্বল্প-সংখ্যক গুণী পাঠকের চেয়ে বহুগুণ বেশি পাঠকে তাঁদের আকর্ষণ। এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে চলেছে বেশ কয়েকজন অতীতের কবি-সাহিত্যিকের জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব-উল্লাস। শতবার্ষিকীর পূজার আসরে ফুল বেলপাতা দেবার মালা গাঁথবার অনেক লোক আছে। সেই তথাকথিত স্মরণ হই-হট্টগোল ডামাডোলের বাইরে একান্ত নির্জনে কয়েকজনে মিলে স্বর্ণকুমারীকে ঘিরে এক গভীর অনুধ্যানের প্রযত্ন রয়েছে আমাদের এই নিবন্ধ-সংকলনটির

মধ্যে। কী উপন্যাসে কী নাটকে কী প্রবন্ধে কী কবিতায়— সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে স্বর্ণকুমারী তাঁর স্বকীয় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। অথচ এমন এক মহান্ নারী-ব্যক্তিত্ব আমাদের নিদারুণ ঔদাসীন্যে একই সঙ্গে অবহেলিত এবং প্রায়-বিস্মৃত। বহুমুখী প্রতিভার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মধ্যে নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তিনি তাঁর কালেই বিদেশে যেভাবে সমাদৃত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন সেই সময়কালের বিচারে তা ছিল অভূতপূর্ব এবং বলা যায় ঈর্ষণীয়ও। তাঁর এই অভাবিত সমাদরে সেকালের কোনো কোনো প্রধান লেখক কি কিছু বিচলিত হয়েছিলেন? ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য তারকার মতো স্বর্ণকুমারীও মধ্যাহ্ন-আকাশে রবির উজ্জ্বল আলোকরশ্মির মাঝে স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। সে দুর্ভাগ্য যেমন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘটেছে তেমনই ঘটেছে দিদি স্বর্ণকুমারীর ভাগ্যেও। কিন্তু স্বর্ণকুমারী তাঁর কালেই সেই দুর্ভাগ্যও অনেকটা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন নিজের বিস্ময়কর প্রতিভাবলেই। তা ছাড়া স্বর্ণকুমারী ছিলেন সেকালের জাঁদরেল একজন সাহিত্য-সম্পাদক। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা-সূত্রে উনিশ শতক ও বিশ শতকের অনেকটা সময় বঙ্গভারতী তাঁর নিয়ন্ত্রণেই ছিল। দুটি শতককে এক সূত্রে সুদীর্ঘ কাল বেঁধে রেখেছিল এমন সাহিত্যপত্রিকা 'ভারতী' ছাড়া দ্বিতীয় আর কোথায়? ওই পত্রিকার উনিশ শতকের এগারো বছর [১২৯১--১৩০১ বঙ্গাব্দ] ও বিশ শতকের সাত বছর [১৩১৫—১৩২১ বঙ্গাব্দ] সম্পাদকের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এই মহীয়সী মহিলা। 'ভারতী' পত্রিকার মত প্রথম শ্রেণীর একটি মাসিকপত্রে সব মিলিয়ে মোট আঠারো বছর সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠান করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথও কিছুদিন সম্পাদনা করেছেন, করেছেন রবীন্দ্রনাথও; কিন্তু স্বর্ণকুমারী ছাড়া আর কেউই এত দীর্ঘ সময় জুড়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তো এক বছর কাজ করেই দায়িত্বভার থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর মন ও মেজাজ ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। নিজে সৃষ্টিশীল লেখিকা হলে কী হবে, সাময়িকপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনার মেজাজ ও মানসিকতা ছিল তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায়। তার ফলে পঞ্চাশ বছরের 'ভারতী'তে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সময় জুড়ে সম্পাদক— এক সুদক্ষ সফল এডিটর। এত বড় মাপের একজন সাহিত্যিক ও সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর সাত দশকের মধ্যে একটির বেশি দ্বিতীয় আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয়নি— এ বড় পরিতাপ ও লজ্জার কথা। তাঁর সম্পর্কে এখনো অনেক অনুসন্ধান করবার আছে, চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করবার আছে, নতুন করে তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। স্বর্ণকুমারী দেবী একই সঙ্গে ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখিকা এবং বিংশ শতাব্দীরও লেখিকা। তাঁর প্রথম বই বেরয় ১৮৭৬-এ, শেষ বই ১৯৩০-এ।

বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এমন রমণীব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় আর নেই। তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করা, তাঁর যোগ্য আসনে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের কালের কর্তব্য। যিনি মুখ্যত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে গেছেন, বিংশ শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে সেই সৃষ্টির মূল্য যে এই একবিংশ শতাব্দীতেও কতখানি, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা এই সংকলন। স্বর্ণকুমারী দেবীকে অবলম্বন করে একটি অ্যান্থলজি প্রকাশের প্রস্তাব প্রথম আমার কাছে নিয়ে আসেন প্রকাশন সংস্থার পক্ষে আমার একান্ত প্রীতিভাজন শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর কর্মতৎপর মধুর স্বভাব ও একগুঁয়ে মনোভাবের কাছে অনেক সময়েই হার মানতে হয়েছে— এবারেও তাই ঘটল। সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই হল। আশ্চর্য প্রতিভাময়ী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি আমার বহুদিনের আকর্ষণ ও কৌতূহল ছিল। ঠিক তাঁকে নিয়েই একটি সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনার প্রস্তাব আসায় মনে মনে উৎসাহিতও হলাম। এবং তারপরে অকারণে কালবিলম্ব না করে কাজে হাত দিলাম। সেদিন থেকে প্রকাশমুহূর্তের মধ্যে প্রায় দুটি বছর কেটেছে। যাঁদের লিখতে অনুরোধ করেছি তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত যত্ন নিয়েছেন নিবন্ধগুলি প্রস্তুত করতে। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াল তাতে স্বর্ণকুমারীকে নতুন করে নানা দিক থেকে খুঁজে দেখবার একটা সুযোগ এসে পৌঁছল। সাহিত্যে এরকম সুযোগ যত বেশি আসে ততই আমাদের উপকার। আমার অনুরোধক্রমে এই সংকলনের লেখকরা যেভাবে অশেষ পরিশ্রম করে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন তাতে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই সংকলন-গ্রন্থটির প্রকাশককেও। এই গ্রন্থ প্রকাশ করে একই সঙ্গে তিনি সাহস ও ব্যতিক্রমী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গীয় পাঠক সমাজের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আস্থা ও নির্ভরতা আছে বলেই দিনপঞ্জির হিসেব না করেই এমন একটি গ্রন্থপ্রকাশের আয়োজনে তাঁরা উদ্যোগী হতে সমর্থ হয়েছেন। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই অনুজপ্রতিম শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে— যাঁর শুধু প্রীতিপূর্ণ তাগিদই নয়, সেইসঙ্গে সদাসর্বদা সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে উপকৃত হয়েছি। যেখানে স্বর্ণকুমারীর বিষয়ে একের অধিক দ্বিতীয় আর বই নেই, সেখানে এমন একটি সংকলন হাতে পেয়ে পাঠকসমাজ আনন্দিত ও উপকৃত হবেন বলেই আমরা আশা করি।

'আনন্দমঠ', শান্তিনিকেতন
১ জানুয়ারি ২০০০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

দারজিলিং পত্র

স্বর্ণকুমারী দেবী

দারজিলিং এলেম--- কোথায় এখানকার নির্ঝর ঝরঝরে, তরুশাখার মর্ম্মরে, পাখীর কলতানে, মেঘমালার স্তর বিন্যস্ত বর্ণমিলনে প্রাণ ঢেলে মুক্ত পাখীর মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব--- ওমা এসেই শয্যাগত।...

আমাদের এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যে একটা পড়ার মজলিস হয়— সে সময় তার জন্য আমি বড়ই হা-প্রত্যাশ করে থাকতেম। দিনের বেলা অন্যেরা মাঝে মাঝে আমাকে দেখতেন আবার যে যার কাজকর্ম্ম করতেন, বেড়াতেন চেড়াতেন, সন্ধ্যাবেলাটা এলে আমরা যখন সকলে একত্র হতেম তখন যেন আর আমার কোন অসুখই থাকত না।

এ বাড়ীর একটা নাম আছে খুব মস্ত, লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের বাড়ী ছাড়া দারজিলিং-এ শুনতে পাই এত বড় বাড়ী আর নেই, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে কাসলটন হাউষ। যখন লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের দারজিলিং-এ স্বতন্ত্র বাড়ী তৈয়ার হয়নি— তখন নাকি তিনি এইখানেই থাকতেন। ...সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে, তার চারিদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান।...

যা হ'ক তখনকার দিনগুলত এইরূপ সুখে দুঃখে এক রকম কেটে গেছে। এখন যে অন্যরকম কাটছে তা যদিও নয়।... তখন আমি সারাদিনই বিছানায় পড়ে থাকতেম, এখনো যে থাকিনে তা নয়— তবে সে থাকা আর এ থাকার মধ্যে বিশেষ তফাৎ এই--- এখন আমি ইচ্ছা করলেই উঠতে পারি— বেড়াতে যেতে পারি--- তখন তা পারতেম না। ...যাই হোক, বেশী বেড়াই না বেড়াই বেড়াবার ইচ্ছার অভাব নেই। বিছানায় বসে বসে কত জায়গায় যাবারি যে পরামর্শ হয় তার ঠিক নেই। ...এতদিন এসেছি, পার্ক আর মলরোডই আমাদের আড্ডা।...

মলরোড আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে। অবজারভেটরি হিল বলে (Observatory Hill) একটা ছোট ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড় বেড়ে, লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের বাড়ীর কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে এই রাস্তাটা চলে গেছে। ...এ রাস্তাটার মত মুক্ত, সমতল, সুখে বেড়াবার জায়গা সমস্ত দারজিলিং-এ আর নেই। এখানে গাছপালার জঙ্গল আদপে নেই, কলকাতার রাস্তার মত রাস্তার ধারে ধারে এক একটি গাছ, মন্দারের গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা, গবর্ণমেন্ট হাউসের কাছে একটি চাঁপার গাছে দুই একটি ফুল ধরে আছে, তাহার গন্ধেই তার আশপাশ ভরপুর। এক একটি গাছে সুন্দর পরগাছার ফুল। রাস্তার পশ্চিমধারে অল্প খাড়াই ঢালু তৃণময় স্থানে কত রকম সুদৃশ্য ঘাস, কত ফার্ণ, মাঝে মাঝে ছোট বন গোলাপের গাছে ছোট ছোট গোলাপফুল। এই ঢালু স্থানের পরপারে পশ্চিমে, রাস্তার কিছু নীচে ইংরেজদের সুসজ্জিত দোকান আর এই মুখে দারজিলিং সহরের ও জলা পাহাড়ের মুক্ত দৃশ্য। পাহাড়ের সবুজ গায়ের উপর দারজিলিং-এর শাদা

ধবধবে বাড়ীগুলি স্তরে স্তরে উঠেছে-- দেখতে বড়ই সুন্দর। রৌদ্রের সময় কাচের বাড়ীর মত এ বাড়ীগুলি ঝলমল করতে থাকে, আর রাত্রিকালে বাড়ীর আলোগুলি নক্ষত্রের মত পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকে।...

পার্ক মলরোডের ঠিক বিপরীত দিকে, আসলেও বিপরীত। মল যেমন লোকজন পূর্ণ; পার্ক তেমনি নির্জন, মল যেমন মুক্ত স্থান পার্ক তেমনি গাছপালায় ঢাকা। সহর হবার আগে দারজিলিং কিরূপ জঙ্গল ছিল, তার চিহ্ন গবর্ণমেণ্ট এইখানে রেখেছেন। পার্কের যে রাস্তা, তার দুই ধারের পুরাতন অরণ্য বজায় আছে, তবে এই রাস্তা এত বড় বড়, এত যত্ন নির্মিত— যে পাশের বন আর বন বলে মনে হয় না। ইংরাজের মেয়েরা অনেক সময় যত্ন করে এলেথেলো রকমে যে রকম সাজসজ্জা করেন শুনতে পাওয়া যায়, এই অরণ্যের ভাবও আজকাল সেইরকম।...

একদিন পার্কে আসতে আসতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলেম। আমরা সকলে মিলে পার্কে যাচ্ছি, এখন আমি এত আস্তে চলি যে আমার সঙ্গে চলে ওঠা সকলের পুষিয়ে ওঠে না, তাতে অন্য সকলেরি অসুবিধা, সুতরাং আমি তাদের বিধিমতো আশ্বাস দিয়ে— একটু আগিয়ে চলতে বল্লেম। পার্কের রাস্তা এত সোজা ও নির্জন যে, সে রাস্তা ধরে গম্য স্থানে পৌঁছবার আমার কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তাঁরা ইতঃস্তত করে একটু একটু এগোতে এগোতে অবশেষে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন, আমি কচ্ছপ গতিতে চলতে লাগলেম। এক জায়গায় দুটো রাস্তা, উপরটা পার্কের, কিন্তু আমি রাস্তার ধারের হেলান পাহাড়-গায়ের হেলান উঁচু উঁচু গাছগুলো দেখতে দেখতে এমন ভাবতে ভাবতে চলেছি যে ও রাস্তাটা আমার নজরেই পড়ে নি— আমি আনমনে সমান পথে নীচের রাস্তা ধরে অবিরত চলে যাচ্ছি, আর ভাবছি যে,— মানুষরা যারা এইরূপ বেঁকে জন্মায় তাদের সোজা করার উপায় কি?...

হঠাৎ আমার ভাবনাটা ভেঙ্গে গেল, একটা ভুটিয়া কোমরে একখানা কুকড়ি (একরূপ ছোরা) বাঁধা, আমার দিকে দেখি চেয়ে যাচ্ছে। আমি একটু চমকে চারিদিক চেয়ে দেখি— এ ত পার্কের রাস্তা নয়— এ কোথায় এসে পড়েছি। আমি ফিরে দ্রুত পদে চলতে লাগলেম। ...আমি হাতের গহনা জামার ভিতর দিকে গুঁজে ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে জড়সড় হয়ে চটপট চলতে লাগলেম, খানিকদূব এসে সাহস করে দু-এক জন ভুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম পার্কের রাস্তা কোথা! তারা আমার কথা বুঝলে না— না কি— একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্লে 'জানিনে'— বলে চলে গেল। আমি তখন নিজের উপরই একান্ত নির্ভর করে চলতে লাগলেম— অবশেষে ঘুরে ফিরে— শ্রান্ত ক্লান্ত হলে পার্কের রাস্তাতেই এসে পড়লেম। যা হউক এখন অবশ্য আর রাস্তা ভুল হয় না। ...

জলপাইগুড়ির অল্প পরেই সিলিগুড়ি স্টেশন, সিলিগুড়ি দার্জিলিঙের উপত্যকা। এখান থেকে পাহাড়ে ওঠার রেলগাড়ীতে চড়তে হয়, এ গাড়ীগুলি সাধারণ রেলগাড়ির মত নয়। ঘোড়ার ট্র্যাম গাড়ী হতেও এগুলি ছোট। এই গাড়ীর বেঞ্চগুলি মাটী হতে আধ হাত উঁচু হবে কিনা সন্দেহ। গাড়ী চড়ে রাস্তাব ধারের দুই পাশের গাছপালা অনায়াসে হাত দিয়ে ধরা যায়। সিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গাড়ি যতই উপরে উঠতে থাকে, ততই পাহাড়ের শোভা চোখের উপর ফুটে ওঠে।...

দারজিলিং-এর শোভা দারজিলিং পৌঁছবাব অনেক আগে থেকে আরম্ভ।...

আগেকার চেয়ে আমরা ঢের বেশী বেড়াইয়া বেড়াই, লোকে বলে আমাদের পা হইয়াছে, তবু কিন্তু বেড়াইয়া সাধ মেটে না, মনে হয় সারাদিনই বাহিরে থাকি, পর্ব্বতের মুক্ত দৃশ্যের

মধ্যে এমন একটা উদার মহান ভাব আছে, যে শোকতাপের গুরুভারও সেখানে লঘু হইয়া আসে, প্রাণের ক্ষুদ্রতা— সেই অনন্তের মধ্যে যেন দাঁড়াইতে পারে না, সেই অনন্তের মধ্যে অনন্ত প্রসারণ লাভ করিয়া হৃদয় যেন অনন্তহারা-হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একত্ব লাভ করে। এই অনুভবে যে পবিত্র পুলক, যে একটি কোমল ধীর আনন্দ পাওয়া যায় তাহা কিন্তু যেমন সহসা পাওয়া যায়— তেমনি সহসা হারাইয়া ফেলিতে হয়,— এই আনন্দ ধরিয়া রাখিবার কৌশলই বুঝি ঋষিরা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার নামই বুঝি যোগানন্দ। কিন্তু আমার মনে হয়-- সংসারী লোকের হৃদয়ে দুঃখ তাপের মধ্য দিয়াই এই আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠে, দুঃখ তাপই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকাশ করে— জীবনের জীবনত্ব গঠিত করে।...

আমাদের বাড়ী হইতে অনেকটা দূরে— একটা নীচের পাহাড়ে গিয়া এখানকার প্রধান ঝরণা--- ভিক্টোরিয়া ওয়াটার ফল্স্ দেখা যায়। এখানকার লোকেরা এই ঝরণাকে কাকঝোরা বলে। আমরা দুই তিনদিন সেখানে গিয়াছিলাম, সে স্থানটির কি একটা রুদ্র গম্ভীর সৌন্দর্য্য— এমন দৃশ্য দারজিলিং-এর আর কোথাও দেখি নাই। আমরা পাশের রেলিং দেওয়া একটি রাস্তায় দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, আমাদের পদতলে পাহাড়--- বামে পাহাড়, ডাহিনে পাহাড়— আর সম্মুখের সুদূর উচ্চ পাহাড় গাত্র দিয়া একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তুষারশ্বেত জলস্ফুলিঙ্গ রাশি বিকীর্ণ করিয়া সহস্রধারায় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নীচের শত সহস্র বড় বড় পাথর চাঙ্গড়ার উপর আসিয়া পড়িতেছে। তাহার অবিশ্রান্ত ঝমঝম শব্দে চারিদিকের সেই গম্ভীর ভাব কি এক মহানতর ভাবে পরিণত হইতেছে।...

গতবারের পত্রে আমি যে অবজারভেটরি হিলের কথা বলিয়াছি, একদিন আমরা ইতিমধ্যে তার উপর উঠিয়াছিলাম। ... এই পাহাড় হইতে চারিদিকের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাছাড়া এখানে দুটি দেখিবারো জিনিস আছে। প্রথম— এখানে দুর্জয় লিং দেবতার অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়— এই পাহাড়ে একটি দর্শনীয় গুহা আছে। কেহ কেহ বলেন, দারজিলিং শব্দ দুর্জয় লিঙ্গের অপভ্রংশ, দুর্জয় লিং দেবের নিকেতন হইতে এই পাহাড়টির নাম দারজিলিং। কিন্তু বাবু শরৎচন্দ্র দাস যিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন তাঁর ভিন্ন মত। তিনি বলেন, তিব্বতী ভাষার দারজিলিং কথা হইতে দারজিলিং হইয়াছে। দর্জি অর্থে বজ্র— কিন্তু উক্ত ভাষায় বজ্র শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, লিং অর্থে স্থান, দারজিলিং অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থান। সিকিমে দারজিলিং বলিয়া একটি মঠ এখনো আছে, এখানেও নাকি তাহার একটি শাখা মঠ ছিল। তাই ইহার নাম দারজিলিং। তিনি বলেন বর্দ্ধমানের রাজা এখানে যখন আসেন তখন তিনি দুর্জ্জয় লিং প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আগে দুর্জ্জয় লিং বলিয়া এখানে কোন দেবতাই ছিল না।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল। শুনা গেল বর্দ্ধমানের রাজা এখানে আসিবার অনেক আগে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যরিস্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা এখানে আসিয়াছিলেন। তখন সবে ইংরাজ দারজিলিং পাইয়াছে, তখন পথঘাট এরূপ কিছুই নাই, কিন্তু তিনি নাকি তখনও দুর্জ্জয় লিং দেখিয়া গিয়াছিলেন। ... দুর্জ্জয় লিং দেখিয়া আমরা গুহা দেখিতে চলিলাম। পথ প্রদর্শক সঙ্গীমহাশয় অগ্রসর হইলেন, আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। দুর্জ্জয় লিঙ্গের স্থান হইতে নামিয়া একটা রাস্তায় ঘুরিয়া তিনি পাহাড়ের একটি কিনারায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—– এইখান হতে নেমে গুহা পাওয়া যাবে। দেখিলাম একটি অতি সঙ্কীর্ণ উবড়ো খাবড়ো পাহাড়ের পদ-পথ, দেখিয়া ভারী ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু অতদূর আসিয়া আর পিছান যায় না— প্রথমে আমরা দুএকজন সেই অরাস্তা দিয়া আস্তে আস্তে নামিতে লাগিলাম— তখন গুঁড় গুঁড় বৃষ্টি পড়িতেছে, যে রাস্তায় পা দিয়া নামিতেছি ভিজিয়া পিছোল হইয়াছে, রাস্তার দুদিকের ঘাসগুলা

তাও ভিজিয়া জবজব করিতেছে, আমাদের মাথায় ছাতাও নেই, কেননা ঘাস ধরিয়া পথে কখনো বসিয়া কখনো দাঁড়াইয়া কষ্টে সৃষ্টে আমরা নামিতেছি, যদি একবার পা পিছলায় তা কর্ম্ম নিকাশ, একেবারে সেই ৫০০ ফুট নীচে গিয়া পড়িব। ঘাসগুলো যে ধরিতেছি তাও ভয়— পাছে জোঁক ধরে। এখানে বড় জোঁক বিশেষ ভিজে জায়গায়। নানাদিকেই এইরূপ বিপদ— কিন্তু শেষ সুখ পরম সুখ, একমাত্র তার দিকে লক্ষ রাখিয়া এই সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া নায়িকার মত আমরা যখন গহ্বরে নামিলাম তখন? তখন চক্ষু স্থির, দেখিলাম একটা বৃহৎ পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের নিম্নদেশে এসে দাঁড়াইয়াছি— এই গুহা...! যা হউক এতখানি হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না ইহা প্রথম গুহামাত্র, ইহার মধ্যে আর একটি সুদীর্ঘ গহ্বর। গহ্বর অত্যন্ত অন্ধকার, আমরা আলো আনি নাই— সুতরাং তাহাতে নামিয়া আর দেখা হইল না। শুনিলাম প্রবাদ এই, সুড়ঙ্গ বরাবর তিব্বত পর্যন্ত গিয়াছে। দুর্জ্জয় লিং যখন দেখিলেন তিনি আর যবন হস্ত হইতে দারজিলিং রক্ষা করিতে পারিলেন না তখন এই পথে একেবারে তিব্বতে পলায়ন করিলেন। দেবতার অদৃষ্টও অখণ্ডনীয়।...

দুর্জ্জয় লিং ছাড়া এখানে আরো দেবতা দেখিয়াছি। ভুটিয়ারা দারজিলিং-এর প্রধান নিবাসী। দারজিলিং শহরের কিছু নীচে তাহাদের যেখানে প্রধান আড্ডা তাহার নাম ভুটিয়া বসতি।... ভুটিয়া বসতির আরম্ভে— বসতির কিছু উপরে— একটা গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির— ইহা একজন লামার স্মরণচিহ্ন, এইখানে তাহার দন্তনখ পোঁতা আছে। লামারা কখনো কখনো কাহারো মঙ্গল প্রার্থনায় এই গম্বুজ প্রদক্ষিণ করিয়া উৎসব করেন। কিন্তু ভুটিয়াদিগের আসল দেবস্থান ইহার পরে। এই মন্দির (ভুটিয়াদের মন্দিরকে গুম্‌পা বলে) একটি দ্বিতল গৃহ, নীচে দেবতারা থাকেন— উপরে— দেব পুরোহিত (লামা) থাকেন। নীচের দেব মন্দিরের সম্মুখে একটি বারান্দাগৃহ, মন্দিরে যাইতে হইলে প্রথমে সেই বারান্দায় প্রবেশ করিতে হয়। বড় বড় পিচকারির মত মন্ত্রচক্র বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে সারি সারি দণ্ডায়মান, একটা চক্র ঘুরাইয়া দিলে এক সঙ্গে সমস্তগুলা ঘুরিয়া যায়। দেব গৃহের দ্বারের মন্ত্রচক্র দুইটা বড় বড় দুইটা ঢোলের মত। এই চক্রের মধ্যে মন্ত্র লেখা আছে— চক্র যত ঘোরে মন্ত্র তত ঘোরে, এইরূপে যত মন্ত্র ঘুরিয়া যায়— তত পাপ ক্ষয় হয়।... দেব গৃহে মাটীতে ছোট দুইটি অদ্ভুত দেবমূর্তি দেখিলাম, একের নাম মহাকাল, অন্যের নাম মহাকালী। তাদের দেখিতে অনেকটা কালীরই মত, কালীর মত দুই জনেই পুরুষের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, কিন্তু কালী হইতেও তাহাদের চেহারা অদ্ভুত।

মন্দিরের আসল দেবতারা সম্মুখের দেয়ালে একটা কাচের দরজার মধ্যে রক্ষিত। তাহাব একটি বুদ্ধ একটি মহাদেব— আর একের কি তাহাবা নাম বলিল আমরা কোন মতেই ধরিতে পারিলাম না। ঠাকুর গৃহে দেয়ালে নানারূপ দেব চিত্র, মেজেতে শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি সজ্জিত। পূজার সময় বাজান হয়। এখানকার বৌদ্ধধর্ম আর কি হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত, তিব্বতেও তাই। ইন্দ্র চন্দ্র মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের ন্যায় বুদ্ধও তাহাদের পূজ্য এই মাত্র। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের এ সার কথা নহে, লামারা বিবাহ করেন না, কিন্তু মদ মাংস তাঁহাদের নিষিদ্ধ নহে।...

ভুটিয়ারা দেবপূজা করেন না, ভূত ছাড়াইবার জন্য হউক, পাপ ক্ষয় করিবার জন্য হউক কিম্বা অন্য কোন মানসে হউক তাহাদের পূজার আবশ্যক হইলে তাহারা লামাকে টাকা দেয়— লামা তাহাদের হইয়া পূজা করেন। সুবিধা মন্দ নয়।...

দারজিলিং-এর মত মজার জায়গা আর দেখি নাই— যেন কামরূপ, যে দিকে চাই নূতন নূতন রূপের খেলা।... মেঘ রৌদ্রের লুকাচুরী খেলা ত এখানে অনবরত চলিতেছে। এই দেখ

প্রখর রৌদ্র— হঠাৎ একটি পাহাড় হইতে তরল মেঘ ধূম উঠিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে দেখিতে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে— দেখিতে দেখিতে সেখানকার পাহাড়, দৃশ্য-গাছপালা বাড়ীঘর সেই মেঘ ধূমে একাকার হইয়া যায়, অনন্ত বিস্তৃত শূন্য সমুদ্র ছাড়া তখন আর সে দিকে কিছুই দেখা যায় না, অথচ অন্য দিকে হয়ত তখনো রৌদ্র আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ধীরে ধীরে সে মেঘ পরিষ্কার হইয়া যায়। আস্তে আস্তে সেই মেঘের মধ্য হইতে প্রথমে পাহাড়ের চূড়াগুলি, ক্রমে ক্রমে নিম্নদেশ পর্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সে বড়ই চমৎকার দৃশ্য।...

সিঞ্চল দারজিলিং হইতে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ। আগে এইখানে গবর্ণমেণ্ট সেনানিবাস ছিল। কিন্তু এখানকার শীত সেনাদের সহ্য না হওয়ায় জলাপাহাড়ে এখন বারিক হইয়াছে।... সিঞ্চলের চেহারা এখন ভগ্নাবশিষ্ট সহরের চেহারা, দেখিলে দুঃখ হয়। শত শত চিমনিস্তম্ভ ও ভগ্ন প্রাচীর বক্ষে ধারণ করিয়া দীনহীনভাবে সে পড়িয়া আছে।...

টাইগার হিল সিঞ্চলের ময়দান হইতে আবার ৫০০ ফুট উচ্চ। এইখান হইতেই ধবলগিরির একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধবলগিরি দেখিতে পাইবার যদিও আমাদের বেশী আশা ছিল না কেননা— তখন উজ্জ্বল মেঘে চারিদিকের পাহাড়ের অধিকাংশ স্থলই ঢাকিয়া পড়িয়াছিল, বিস্তৃত তুষারাচল শ্রেণীর কতক দেখা যাইতেছিল— কতক মেঘের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কথাই আছে, নিরাশার মধ্যে আশার আলো অধিক জ্বলিয়া উঠে—

Hope like the glimmering taper's light
Adorns and cheers the way
And still the darker grows the night
Emits a brighter ray

আমরাও দুরাশার আশা হৃদয়ে ধরিয়া টাইগার হিলে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। টাইগার হিলের পথ বড়ই খারাপ, এখানে ডাণ্ডি উঠে না, ছোট্ট সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। কি করি, ধবলগিরি দেখিব— পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গদর্শনের জন্য কি না করা যায়। একে ত শীত প্রচণ্ড, কিন্তু রৌদ্র তাহা হইতেও প্রচণ্ড, পথ আবার অতি অতি প্রচণ্ড! খানিক দূর যাই আর বিশ্রাম করি।... চূড়ার সমতল ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র আমাদের সমস্ত কষ্ট নিমেষে যেন দূর হইয়া গেল, চারিদিকে সুন্দর মেঘ দৃশ্য, সুন্দর রৌদ্র কান্তি, দিব্য শীত বাতাস, আমাদের শরীর মন জুড়াইয়া গেল— কিন্তু ধবলগিরির চূড়া আর দেখা হইল না, সেদিক মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। তবে আমরা ত তুষারাচল দেখিয়াছি, কল্পনা করিতে লাগিলাম— তাহারি মত ছোট একটি টুকরা মেঘের ভিতর লুকাইয়া আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্রেণী কিন্তু বেশ দেখা যাইতে লাগিল। তাহার মাথার উপর নীলাকাশ, নীচে নীল পর্ব্বত, সেই নীল পাহাড়ের খানিক উচ্চ হইতে চূড়া পর্যন্ত বরফে বরফে আচ্ছন্ন।...

আমরা ইতিমধ্যে একদিন রঙ্গিতে গিয়াছিলাম। রঞ্জিত বা রঙ্গিতে যত ভাল ও নানা রকমের ফার্ণ পাওয়া যায় দারজিলিংয়ের আর কোথাও তেমন দেখি নাই। রঞ্জিত সিকিমের একটি নদীর নাম, এই নদীর নামে তাহার চারিপাশের জায়গারও এই নাম হইয়াছে। রঙ্গিত দারজিলিং হইতে ১১ মাইল নীচে। তাহার ওপারে স্বাধীন সিকিং রাজ্য। রঙ্গিতের রাস্তা যদিও বেশ প্রশস্ত কিন্তু যেমন উবড়ো খাবড়ো তেমনি প্রায় সমস্ত পথটাই খুব চড়াই।... পরিষ্কার প্রভাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা মলরোড দিয়া ভুটিয়া বসতিতে পৌঁছিলাম। ... নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া চা ক্ষেত্রের পাশ দিয়া পাহাড় দেয়ালের পাশ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষ পরগাছায় জড়িত ফুলময় বনপথ দিয়া ডাণ্ডি নামিতে লাগিল।

কাঞ্চনজঙ্ঘার রৌদ্রদীপ্ত মূর্তি এক একবার পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পড়িতে লাগিল, আবার সম্মুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল। খানিকদূর নামিয়া একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন ৯ মাইল নামিয়াছি বেলা প্রায় ৮টা— তখন গাছপালার ফাঁক দিয়া পাহাড়ের নীচে সবুজ একটা জল দেখিতে পাইলাম; শুনিলাম ঐ রঞ্জিতের পানী। সে জল তখনো এত নীচে যে তাহার দুই ধারের বৃক্ষশ্রেণী নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, মনে হইতেছিল, জলের দুই তীর যেন সবুজ ফ্রেমে আঁটা। সেই তরুশয্যার পরেই সাদা ধবধবে বালীর চড়া। এই শ্বেত বালী বাঁধান নীল জলের রেখা গাছপালার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে আমাদের চোখের উপর চমকিয়া যাইতে লাগিল। আরো খানিকটা নামিয়া একটা গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ডাণ্ডিওয়ালারা বলিল— আমরা নদীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহা নদীর গর্জ্জন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা নদীর তীরে আমাদের নামাইয়া দিল। আমরা বালির চড়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম— কি চমৎকার দৃশ্য।

নদীর দুই তীরে, নদীর জলে, বালির চড়ার উপর বর্ষায় ভাঙা বড় বড় পাথর স্তূপীকৃত, জলের তোড়ে অধিকাংশ পাথরই ঘসিয়া গোলাকার মসৃণ হইয়াছে। এই পাথরে পাথরে আহত প্রতিহত হইয়া একটা সুবিস্তৃত কাল জলের রাশি সফেন তরঙ্গ তুলিয়া ফুলিয়া অবিরল গর্জ্জন করিয়া দুর্দান্ত বেগে চলিয়াছে।...

রঞ্জিতে দারজিলিং-এর মত শীত নাইই— শুনিলাম গরমকালে বেশ গরম হয়। আমরা নয়টায় পৌঁছিয়া আবার দুইটার পর ছাড়িলাম। এবার উপরে ওঠা— বড় সহজ ব্যাপার নয়, ডাণ্ডিওয়ালাদের জন্য আমাদের মায়া করিতে লাগিল। তাহারা বলিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্বেই দারজিলিং পৌঁছিবে, কিন্তু কি করিয়া যে এত শীঘ্র তাহারা উপরে উঠিবে আমরা ভাবিয়া পাইলাম না।...

বনের মধ্য দিয়া, সুন্দর বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়া, চা ক্ষেত্র দিয়া, ফার্ণের রাজ্য দিয়া ডাণ্ডি অগ্রসর হইতে লাগিল। বনের এক এক স্থানে এমন নূতন দৃশ্য, এক এক রকম লাল পাতার গাছে শ্যামল বন এমন সুন্দর দেখাইতেছে— দূর হইতে সে পাতাকে ফুল বলিয়া মনে হয়— কিন্তু নিকটে আসিলে দেখা যায় তাহা পাতা, এক এক জায়গায় অবিশ্রান্ত ফুটন্ত ফুলময় পরগাছা জড়িত, বড় বড় গাছের সার। দারজিলিং-এ এমন দেখি নাই। এক একটা পাহাড়ে একটি বড় গাছ নাই— কেবল ছোট ছোট বন ফুলময়। এক একটা পাহাড় আগাগোড়া চায়ের গাছে ঢাকা,— ক্ষেতে স্ত্রীপুরুষে বেতের ঝুড়ি পিঠে চা তুলিতেছে।..

সে দিন বিকালে আমরা আর কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না, তাহার দৃশ্য তখন উজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন দৃশ্য। তুষার পর্বত তখন মেঘ পর্বতে পরিণত হইয়াছে। তখন পূর্বদিকে নীল মেঘের কোলে কেবল একখানা মস্ত চাঁদ ভাসিতেছিল— যতই বেলা পড়িতে লাগিল সেই চাঁদ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, মেঘের রেখার মধ্য দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উপরে উঠিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার আগেই আমরা মলরোডে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষে মলরোড পূর্ণ— ব্যাণ্ড বাজিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, আমাদের কয়খানা ডাণ্ডি আর আরোহী পৃষ্ঠে দুইটি অশ্ব তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিল।...

লেপচা, ভুটিয়া, পাহাড়িয়া এই তিন জাতিই এখানকার প্রধান বাসিন্দা। চেহারা, ধরণ ধারণ তিন জাতিরই কাছাকাছি। লেপচারা এ দেশের আদিম নিবাসী, সম্ভবত তিব্বত সীমানার লেপচিকাং স্থান হইতে ইহারা আগত বলিয়া ইহারা লেপচা নামে অভিহিত। ভুটিয়াদের অপেক্ষা ইহারা সুশ্রী— ইহাদের নাসিকা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা প্রায়ই সত্যবাদী,

বিশ্বাসী।... ভুটিয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্যজাত। সংখ্যাতেও এখানে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভুটিয়া কথাটায় যদিও ভুটানের অধিবাসী বুঝাইবার কথা কিন্তু এখন এখানে বৌদ্ধ মাত্রেই ভুটিয়া নামে অভিহিত। নেপাল হইতে যাহারা আসে— তাহারা নেপালি ভুটিয়া— তিব্বত হইতে যাহারা আসে তাহারা তিব্বতী ভুটিয়া ইত্যাদি, আর নেপালি হিন্দু যাহারা দারজিলিং-এ থাকে তাঁহারা পাহাড়িয়া নামে অভিহিত।

এখানকার প্রায় সকলেরই মূর্ত্তি বেশ বলিষ্ঠ, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী খাঁদা খাঁদা চেপটা চেপটা, ঠোঁটগুলি বেশ পাতলা, সবসুদ্ধ দেখিতে একরকম মন্দ নয়।...

সাজগোজের প্রতি কিন্তু এদেশের লোকেদের বেশ দৃষ্টি আছে। মেয়েদের এদিকে ময়লা কাপড় কিন্তু চুলগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া বিনুনি করা। ... ফুল পরা ইহাদের সাজগোজের একটি প্রধান অঙ্গ।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বসতি প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কর দিয়া এই অঞ্চলের খানিকটা জায়গা তাঁহারা সিকিং রাজের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। তখন দারজিলিং নিতান্ত জঙ্গল ছিল, বাঙ্গালা হইতে এখানে আসিবার পথ ঘাট আদবে ছিল না বলিলেই হয়,... সিকিং রাজ ভাবিলেন— খানিকটা জঙ্গলের পরিবর্তে কর পাইব— সে ত সুবিধার কথা— তিনি ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সিকিং, ভূটানে দাস ব্যবসায় চলিত। ... দারজিলিং-এ স্থান পাইবার পর ইহা লইয়া সিকিং রাজের সহিত ইংরাজের গোল বাধিল, ইংরাজ চাহেন দাস ব্যবসার নিবারণ করিতে, সিকিং তাহাতে ক্রুদ্ধ। ... এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার জন্য দারজিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার একশত পুলিশ সৈন্য লইয়া সিকিং যাত্রা করেন। সিকিং বুঝিল, ইংরাজ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।... কমিশনার সাহেব পলাইয়া আসিয়া আবার অধিক সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে সিকিং গমন করিলেন। যাইবার আগে রাজাকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়া ছিলেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য যাইতেছেন না, কেবল কথাবার্তা কহিতে যাইতেছেন। সেবার সিকিং গিয়া ইংরাজ কৃতকার্য হইলেন, ... ইংরাজ ছয় হাজার টাকা করে সমস্ত দারজিলিং পাইলেন— কেবল তাহাই নহে, দাস ব্যবসায় সিকিং হইতে একেবারে উঠাইয়া দিতে রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর ক্রমে রাজার দায়ীত্ব আরো বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার করও ৯ হাজার হইতে ক্রমে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। কিন্তু সম্প্রতি মেকলের তিব্বত মিসনে গমনের পর হইতে এই কর একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

সিকিমের রাজা কতক দিন সিকিম কতক দিন তিব্বতে বাস করেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তিন মাসের অধিক সিকিংরাজকে তিব্বতে বাস করিতে দিতে ইচ্ছা নয়— কিন্তু তিন মাসের পরিবর্তে দুই বৎসর ধরিয়া তিনি তিব্বতে বাস করিতেছেন— সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই দুই বৎসরের খাজনা দিতে চাহেন না। আরো বলেন যে সিকিং ত্যাগ করিয়া রাজা যদি এইরূপ অধিক দিন তিব্বতে বাস করেন তবে তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার দাওয়ানকে রাজা করিবেন। মহা গোল চলিতেছে, মেকলে, পল প্রভৃতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ এখন সিকিমে। এখন ফলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক।...

শরৎবাবুর তিব্বত ভ্রমণে ভুটিয়া গানের একটি ইংরাজী তর্জমা আছে, ভুটিয়াদের সুর যেরূপ শুনিয়াছি— সে হিসাবে গানের কথাগুলি কিন্তু অনেক ভাল। আমি সেই অনুবাদের একটি বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছি— দুইটাই এইখানে তুলিয়া দিই—

All here assembled pray attend,
The eagle is the king of birds when he rises all rise,
The lion is the king of the beasts when he leaps all leap
He that drinks is prince of speech, when he speaks all hear .

মহাশয়গণ, করুণ শ্রবণ।
বাজপক্ষী পাখীদের রাজা
সে উড়িলে সব উড়ে যায়।
কেশরী সে পশুদের রাজা
সে লাফালে সকলে লাফায়।
মাতাল যে বচন-বাগীশ
সেই জন কথা কয় যবে
মন দিয়া শোনে আর সবে।...

আমাদের কলিকাতায় ফিরিবার দিন ত নিকটে আসিয়া পড়িল, এই চিঠিই হয়ত এখানকার শেষ চিঠি। আমার একজন বন্ধু গল্প করিয়াছেন দারজিলিং হইতে যাইবার সময় তিনি কাঁদিয়া গিয়াছিলেন, আমি ততদূর না বলিতে পারি. আমার দশাও তার কাছাকাছি বটে।...

একদিন আমরা জেল দেখিতে গিয়াছিলাম— জেলের বাহিরের দৃশ্য আমাদের কাছে নূতন না হউক, ভিতরের দৃশ্য আমাদের সম্পূর্ণ নূতন লাগিল, আমার ত এই প্রথম জেলখানায় প্রবেশ। ... সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। জেলখানা ছাড়াইয়াও ক্রমাগত জেলখানার কথাই মনে পড়িতে লাগিল। আমাদের চারিদিকে মধুর সুন্দর দৃশ্য— আশে পাশে তরুশ্রেণী. তরুরাজির মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাতের উচ্ছ্বাস, সম্মুখে সুবর্ণমেঘচূড়-পাহাড়, মাথায় নীলাকাশ, নিম্নে শ্যাম-পর্বতের তরঙ্গ— এই সুখকর শান্তিময় দৃশ্যের মধ্যে জেলের সেই দুঃখ কষ্ট পাপ তাপের চিত্রই মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ... বাড়ী পৌঁছিয়াও আমরা ঘরে থাকিতে পারিলাম না; সেই রাত্রে আমরা কয়জনে মিলিয়া মলরোডে যাত্রা করিলাম।... সূর্য্যালোকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যেরূপ ঝলসিত জমাট মূর্ত্তি দেখায়— এখন জ্যোৎস্নালোকে তাহার স্বতন্ত্র শ্রী, এখন কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্রেণী মেঘের গায়ের উপর উজ্জ্বল সুদীপ্ত, তরল মেঘের মতই দেখাইতেছিল। ... আমরা যখন সেই নিস্তব্ধে সেই নির্জন পাহাড়তলে দাঁড়াইয়া চাঁদের দিকে চাহিয়াছিলাম, আমার মনে হইল— তখন আমরাও যেন চন্দ্রলোকের লোক হইয়া গিয়াছি।*

*[পুরাতন 'ভারতী' পত্রিকার পাতা থেকে।
সংকলক শুচিস্মিতা চন্দ্র]

'কাহাকে'র ভূমিকা

ই এম লঙ্

*[স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ 'An Unfinished Song' ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে ডিসেম্বর ১৯১৩-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯১৪-তে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে E. M. Lang লেখিকার সঙ্গে ইংরেজিভাষী পাঠককুলকে পরিচিত করে দেওয়াব উদ্দেশ্যে একটি 'Introduction' লেখেন, যেটি পরবর্তী সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেই ভূমিকার বাংলা তর্জমা করেছেন **অম্বরীষ রায়**।]*

এই গ্রন্থটির রচয়িতা একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলা। তিনি বাংলার নারী আন্দোলনেরও একজন পুরোধা। বস্তুত তিনি ধনী ঠাকুর পরিবারেরই একজন সদস্যা। বাংলা ভাষার মান উন্নয়নে যে পরিবারের অবদান যে কোনও ভারতীয় পরিবারের তুলনায় মহত্তর। জেনানার ন্যায় প্রতিপালিতা, অন্তঃপুরে শিক্ষিতা ও খুব অল্প বয়সে বিবাহিতা হলেও শ্রীমতী ঘোষাল তাঁর অসাধারণ মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশে পিতা ও স্বামী উভয়ের কাছ থেকেই যুগপৎ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খ্যাতনামা ধর্ম-সংস্কারক। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতাও, যে সমাজ বৈদিক ধর্মের যা কিছু মহৎ ও উচ্চতাকে পালন করতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। পিতার কাছ থেকে শ্রীমতী ঘোষাল তীব্র স্বদেশানুরাগ, দেশকে সুপ্তির ঘোর থেকে জাগানো, প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করে সমাজকে অপকৃষ্ট পরম্পরার জোয়াল থেকে মুক্ত করার প্রবল ইচ্ছা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ লাভ করেছেন।

তাঁর ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ ভারতের অগ্রগণ্য কবি হিসাবে শুধু নিজ দেশের কাছেই নয়, ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও, যেখান থেকে তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি অনুবাদের আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সমাদৃত ও প্রশংসিত। দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা, যা শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ভারতী'কে উৎসর্গীকৃত, এখন অন্যতম প্রধান বাংলা সাহিত্য পত্রিকা রূপে পরিচিত। আবার মেজ ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত ঘুরে এসে পর্দার আড়ালে অবস্থিত ভারতীয় নারী সমাজকে সাঙ্ঘাতিক সব বাধা নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াসে তাঁর ভগিনীর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছেন। যে অল্প কয়েকজন মহিলা সমাজে মুক্তভাবে মিশেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।

খুব অল্প বয়সেই শ্রীমতী ঘোষালের, যাঁর সুন্দর ভারতীয় নাম শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী— অর্থাৎ স্বর্ণ-কন্যা, অসাধারণ পারদর্শিতা ও চারিত্রিক সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল। কুড়িতে পা দেওয়ার আগেই তিনি নাম-হীন একখানি উপন্যাস লিখে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। এমনকি পরে যখন লেখিকার পরিচয় প্রকাশ পায়, তখনও তা কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এর একটা বড় কারণ এই যে তখনও কোনও ভারতীয় নারী এই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হননি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পর এবার তাঁর উপর 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তাল এবং আবার যথারীতি তিনি প্রথম ভারতীয় সম্পাদিকা হিসাবে নজির সৃষ্টি করলেন। শুধু এক সংক্ষিপ্ত সময় ছাড়া, যখন তাঁর দুই কন্যা 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার নেন, তিনি

পত্রিকাটি পরিচালনা করে আসছেন আজ পঁচিশ বছর ধরে। পত্রিকা-সম্পাদনা ছাড়াও তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, প্রহসনাদি এবং বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের উপযুক্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর রচিত নাটকগুলি সারা ভারতের দর্শককুলের কাছে সমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

সাহিত্য রচনা এবং সম্পাদনা ছাড়াও স্বদেশের মহিলাদের শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন। মূল্যবোধহীন সমাজে আত্মীয়-বিতাড়িত অনাথ ও বিধবা মহিলাদের আশ্রয়কল্পে তিনি একটি সংস্থা স্থাপন করেছেন, যেটি শ্রীমতী ঘোষালের কন্যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁর আর এক কন্যা ভারতীয় রমণীদের শিক্ষার্থে 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন' স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকেন। শ্রীমতী ঘোষালের পুত্র সিভিল সার্ভিসের একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী; অবশ্য তিনি এখন তাঁর স্ত্রী কোচবিহারের রাজকুমারী সুকৃতির সঙ্গে বিলাত ভ্রমণরত। বর্তমানে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতার সন্নিকটে মস্ত ঘোষালবাড়িতে তাই তাঁকে একাই থাকতে হয়। তালগাছের ছায়ায় ঘেরা ও ফোয়ারার জলে স্নিগ্ধ এক সুন্দর ও বড় বাগানের মধ্যে বাড়িটি অবস্থিত। তাঁর স্বামী, যিনি তাঁর সকল কাজের উৎসাহদাতা ও সর্বক্ষণের সঙ্গী— কয়েকমাস পূর্বে গত হয়েছেন। এরপর থেকে তিনি নিজেকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। যদিও হিন্দু-বিধবার কঠোর বিধিনিষেধ তিনি কখনই মেনে চলেননি। আসলে, তিনি মনে করেছেন— তাঁর জীবনের আনন্দের পালা এবার সাঙ্গ হয়েছে। এক ধরনের শান্তপ্রত্যয়ে তিনি বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতে আবার তাঁদের মিলন হবে।

জরির কাজ করা সুন্দর সুন্দর শাড়ি এখন আর তিনি পরেন না। কণ্ঠহার, বালা এবং শাড়ি ও চুল বাঁধার জন্য ব্যবহৃত মূল্যবান জহরতগুলি কন্যা ও নাতনিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এখন তাঁকে সাদা সিল্কের নরম ও ঢোলা পোশাকেই বেশি দেখা যায়। দীর্ঘাঙ্গিনী, সর্বজন শ্রদ্ধেয়া এই 'বড় মা'-র মুখমণ্ডলের আভিজাত্যবোধ এবং শান্ত ও ধীর স্বভাব গভীর মর্যাদাব্যঞ্জক।

প্রত্যেকটা দিন তাঁর একইরকমভাবে কাটে। খুব ভোরে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই উঠে সামনের বড় খোলা ছাদে তিনি প্রাতঃকালীন বন্দনা করেন। বিশ্বসত্তার সঙ্গে নিজের সত্তার এক অপরূপ মেলবন্ধন এই প্রার্থনাকাল। সর্বশক্তিমানের চরণে তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য এই প্রার্থনা করেন যে, অন্ধকার থেকে আলোর যাত্রায় প্রত্যেকে যেন অপার জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। এরপর আছে এক গ্লাস দুধ পান করা এবং তারপর সাহিত্য সমালোচনা ও সম্পাদনায় ব্যাপৃত থেকে সারা সকালটা দক্ষিণের বারান্দায় কাটানো। বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি স্নান সারেন। যে কোনও ভারতীয় নারীর কাছে এই স্নানকার্য একটি আনুষ্ঠানিক মাত্রা পায়। এ সময় তিনি তাঁর কেশরাশিরও খুব যত্ন নেন। খুব সাধারণ ভাবে মধ্যাহ্নভোজন সেরে তিনি খবরের কাগজ বা বই পড়তে পড়তে একটু বিশ্রাম নেন। বিকেল চারটায় আরেক পেয়ালা দুধ পান করে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তিনি বাগানে পরিভ্রমণ করেন। যদিও এখন তিনি বাড়িতেই অতিথি-আপ্যায়ন করেন, তবে স্বামী জীবিত থাকাকালীন তিনি গাড়ি চড়ে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতেও যেতেন। রাত্রির খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বিশ্রাম নেন। পরিধানের ব্যাপারে শ্রীমতী ঘোষাল সুরুচিপূর্ণ ও আরামদায়ক দেশি বস্ত্র পছন্দ করলেও ইউরোপের সুবিধাগুলি নিতে তাঁর কখনও কোনও আপত্তি ছিল না। তাঁর প্রশস্ত বৈঠকখানায় তাই ইউরোপীয় চেয়ার টেবিলও শোভা পেয়েছে। বন্ধু-বান্ধবীদেরও তিনি এই বৈঠকখানাতেই আপ্যায়ন করে থাকেন। বন্ধু সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সুন্দর সুন্দর জাপানি পেয়ালায় চা পরিবেশন করা হয়, ট্রে তে ঢাকা দেওয়া পাত্রে কেক, স্যান্ডউইচ, চিজমাখানো বিস্কুট, স্যালাড, ফল, শরবত প্রভৃতি অজস্র স্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে জলযোগ সাজানো থাকে। তাঁকে বারণ করার আগে পর্যন্ত তিনি

তাঁর অতিথিদের হাতে একের পর এক খাবারের থালা তুলে দিতেন। অবশেষে হাত ধোয়ার পাত্র আসে।

ভবিষ্যতের নতুন নারী প্রজন্মের তিনি একজন পথ প্রদর্শিকা। পর্দার আড়াল থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হননি। তাঁর এমন কিছু আত্মীয়-আত্মীয়া কলকাতায় আছেন, যাঁরা তাঁকে পর্দার আড়ালে না দেখলে যারপরনাই দুঃখ পাবেন। এঁদের কাছে তিনি পর্দানশীন হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। এর থেকে এটাই স্পষ্ট যে ঠাকুরবাড়ির মত কৃতবিদ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারেও পরিবর্তনের হাওয়া সবে মাত্র বইতে শুরু করেছে। শ্রীমতী ঘোষাল এও মনে করেন যে নারীমুক্তিই নারীর চরম ও পরম পাওয়া নয়। অন্তঃপুরে মহিলারা এমন এক নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে বাস করেন যে, একমাত্র তাঁদের প্রিয়জনের শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু বা এই ধরনের কোনও দুঃখ ছাড়া অন্য কোনও আঘাত চট করে তাঁদের স্পর্শ করে না। মানসিক উদ্বেগে তাঁরা অনর্থক আশঙ্কিত নন। সময় নিয়ে অযথা ব্যস্ততা নেই— এমনকি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায় খুঁজতেও তাঁরা ব্যাকুল নন। শ্রীমতী ঘোষাল তাঁর সমস্ত প্রগতিবাদী ধ্যানধারণা সত্ত্বেও একজন অন্তঃপুরিকার ন্যায় অচঞ্চল মানসিকতার অধিকারী। স্বদেশের কাছে তিনি অশেষ প্রতিভাশালিনী, গুণের জন্য উচ্চপ্রশংসিত হলেও, নিজেকে কখনও তিনি প্রচার করেননি। গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়াতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। পুরোপুরি পর্দার আড়ালে বা বাইরে না থাকার সুবিধাটুকু তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মে লাগাতে পেরেছেন। গভীর ভাবনাচিন্তা ও বিস্তৃত পাঠরুচিতে শ্রীমতী ঘোষাল অভ্যস্ত। নিজে কখনও বিলেতে না গেলেও, বিলেতের সব কিছু বুঝতে ও শিখতে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। অনেক ইংরেজি বইও তাঁর পড়া। প্রিয় লেখিকা George Eliot-এর উপর তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

এই প্রথম তাঁর কোনও বই ইংরেজ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গভীর নারীসমস্যা নিয়ে ভাবিত, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এটা উল্লেখযোগ্য। বইটিতে ভারতীয় নারীর মানসিক বিকাশের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ— প্রেম ও বিবাহের প্রতি তাঁর ধারণার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পুরনো পরম্পরাগত যা কিছু ভাল, তা মেয়েটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তবুও মেয়েটি সেই স্বাধীনতার স্পর্শ পেতে খুবই উৎসুক, একদিন যা ভারতীয় নারী নিজগুণে অর্জন করবে।

ঠাকুরবাড়ির চোখে স্বর্ণকুমারী দেবী

অপর্ণা ভট্টাচার্য

ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অন্যতম নক্ষত্র স্বর্ণকুমারী দেবী। সাহিত্যের আকাশে এই পরিবারের তারকামণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল, স্নেহ প্রীতি ভালবাসা শ্রদ্ধা অনুরাগ এবং সেইসঙ্গে প্রচ্ছন্ন উপেক্ষা, ক্বচিৎ কখনও কিছু ক্ষোভ; কীভাবে উঠে এলেন এক রমণীব্যক্তিত্ব পরিবারের সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্য থেকে— তারই এক আলেখ্য রচনার প্রয়াস এই নিবন্ধ।

সমগ্র পরিবারটি ঘিরে একটি সংস্কৃত, পরিশীলিত বাতাবরণ সৃষ্টির পশ্চাতে যাঁর মহান ভূমিকাটি বিরাজিত, তিনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বৎসরের অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থেকেও গৃহের নিয়মশৃঙ্খলা, উৎসব অনুষ্ঠান এবং সার্বিক দায়িত্বে যে সুবিন্যস্তভাব তিনি বজায় রেখেছিলেন তাঁর প্রভাব প্রভাবিত করেছিল তাঁর পুত্রকন্যাদের।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পিতার সান্নিধ্য এবং ব্যক্তিত্ব যে তাঁকে উদ্বোধিত ও জাগ্রত করেছিল, সে কথাও তিনি নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। পিতার সঙ্গে পূর্বের দূরত্ব অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মহর্ষির অন্য পুত্রদের সঙ্গে সান্নিধ্যের নিবিড়তার ছবি প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা'য় বলেছেন : 'ছেলেবেলায় আমরা বাবা মহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁষতাম না। তিনি কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজী বাঙলার পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম।'

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কন্যাদের ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টো ছবিটিই আমরা পাই। কন্যাদের প্রতি স্নেহময় সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাই জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি'তে। সৌদামিনী আজীবন ঠাকুরবাড়িতে পিতৃগৃহেই ছিলেন। অন্তঃপুরের দায়দায়িত্ব ও পরিচর্যার ভার স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। সারদা দেবীর মৃত্যুর পর পিতার দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় সৌদামিনী বলেছেন, 'কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোটো বোনেদের চুল বাঁধার ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দমত না হইলে পুনর্বার খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।' পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও বোনেদের বড়দিদি সৌদামিনীর এই আন্তরিক ছবিটুকু আমাদের কাছে এক আশ্চর্য আনন্দের সংবাদ এনে দেয়।

এই স্নেহপরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধযুক্ত পারিবারিক পরিবেশে স্বর্ণকুমারী বর্ধিত হয়েছিলেন। সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা এবং তারই সঙ্গে দায়িত্ববোধের যে দৃঢ়তা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তাকে সকল অন্তর দিয়ে স্বর্ণকুমারী গ্রহণ করেছিলেন। 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে পিতা ও কন্যার মধুর সম্পর্কটি মধুরতর হয়ে উঠেছে স্বর্ণকুমারীর বর্ণনায়। শুধু পিতাই নয়, মায়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটি যে কত নিবিড় এবং গভীর ছিল তার পরিচয়ও আমরা পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বাড়ির ভিতরের যে বাগানের কথা বলেছেন, সেই বাগানেই স্বর্ণকুমারী বাল্যে প্রতিদিন তাঁর কথায়, 'ভোর হইতে না হইতে উঠিয়া বাগানে ফুল

তুলিতে যাইতাম, কেহ আসিবার আগেই আঁচল ভরিয়া বাগানের যত ভাল ভাল ফুলগুলি তুলিতাম। তখন কোন বিলাতী ফুলের চাষ আমাদের বাগানে ছিল না। যত রকম দেশীয় সুগন্ধ পুষ্পে বাগান ভরিয়া থাকিত। ভোরের বেলা মৌমাছির দল তাহার উপর গুণগুণ করিয়া বেড়াইত। সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুন্দর মোহ রচনা করিত। আমি ঘরে আসিয়া আঁচলের ফুলগুলি একখানি থালায় সাজাইয়া লইতাম পরে মাতৃদেবীর কাছে আসিয়া ফুলভরা থালাখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিতাম। কোন ভাল ফুল তাঁহাকে দিতে গেলে তিনি লইতেন না। একবার হাতে লইয়া হাসিয়া আবার তাহা থালায় রাখিয়া দিতেন। তিনি প্রকৃতই সীতা সাবিত্রীর মত আদর্শস্থানীয়া পতিব্রতা সতী ছিলেন। দুজনে দুজনের মনের ভাব বুঝিতাম। আমি আর কিছু না বলিয়া কতকগুলি ফুল স্বতন্ত্র একখানি ছোট থালায় গুছাইয়া তরকারী বানাইবার দালানে তাঁহার আসনের নিকট রাখিয়া দিতাম। ... ৭টার সময় উপাসনার ঘণ্টা পড়িত। তৎপূর্বে উপাসনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইতাম। উপাসনার পর পিতৃদেব তেতলায় যাইতেন, আমিও ফুল লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তিনি সহাস্যে থালাটি গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি আঘ্রাণ করিতেন. আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। জানি না দেবতাকে অর্ঘ্য দান করিয়া কোনো সাধকের মনে এইরূপ আনন্দ হয় কি না!

অতঃপর পুষ্পপাত্র টেবিলে রাখিয়া পিতা আমাকে কাছে টানিয়া লইতেন। দু একটি গোলাপ আমার হাতের কাছে ধরিয়া কবিতার ভাষায় বলিতেন— পয়সা কমলম্ কমলেন পয়ঃ। পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।। ইত্যাদি। আমি তখন সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করি। বোধহয় আমাকে মুখস্থ করাইবার জন্য এইরূপ ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কেবল কবিতা নহে তাঁহার এক একটি সুন্দর আদর বাক্যে আমি আহ্লাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতাম। আমার উপন্যাসের অনেক স্থলে আমি সেই সকল উপমা ব্যবহার করিয়াছি।'

পুত্র কন্যাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি দেবেন্দ্রনাথের সদা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। পুত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে কন্যা ও পুত্রবধূদের সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি পড়াবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু ব্যবস্থা করাই নয় সেই শিক্ষার সঙ্গে যে নিজেকেও যুক্ত রেখেছিলেন সে কথা স্বর্ণকুমারী 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থের দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধে বলেছেন, 'তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রীদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা ছোট নগণ্য ব্যক্তি। সেই জন্য পরীক্ষাতেও সকলের সমান হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। কিন্তু পরীক্ষার নম্বর আমরা কেহ জানিতে পারিতাম না। এইরূপে পিতৃদেব অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন।'

পিতার পরেই স্বর্ণকুমারীর হৃদয়ে যাঁর বিরাট আসনটি পাতা ছিল, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে যে শিক্ষার বীজ দেবেন্দ্রনাথ বপন করেছিলেন তাকে বাইরের আলো হাওয়া দিয়ে পল্লবিত করে তুলেছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী স্ত্রীজাতির উন্নতিতে মেজদাদার অটল সঙ্কল্পের কথা বারবার বলেছেন। বাড়ির মধ্যেই নানা বাধা, নানা মতান্তর ও মনান্তর ঘটলেও কোনও কিছুই তাঁকে সংকল্প থেকে বিরত করতে পারেনি। স্বর্ণকুমারী তাঁর প্রবন্ধটিতে বলেছেন, 'বাড়ির মেয়েরা সকলেই জানিত, মেজদাদার মত সহায় বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই; তাঁহার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল অসীম।'

স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আজীবন একটি অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। কনিষ্ঠা এই ভগিনীটিকে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই ভালবাসতেন। অন্যান্য ভগিনীর মধ্যে ইনিই ছিলেন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অন্তঃপুরের মধ্যে থেকেও স্বাধীনতার আলোককে সকল অন্তর দিয়ে গ্রহণ

করতে পেরেছিলেন বলে স্ত্রীজাতির উন্নতিকামী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভগিনীটির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে বলেছেন, 'বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যেই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণ পিসিমাকে বেশি ভালবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা কিছু চিঠি ইন্দিরা দেবীর 'পুরাতনী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব চিঠির প্রায় প্রত্যেকটিতেই স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ প্রসঙ্গে নানা কথা আছে। স্বর্ণকুমারীর উদ্যান-প্রীতির কথা মনে রেখে ১৮৬৮, ২৭মে-র চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আম পীচ লিচু ফলসা আঙ্গুর কলা Fig প্রভৃতিতে পূর্ণ স্বর্ণের ঠিক মনোমত বাগান।' এই সালেরই ডিসেম্বরে লিখিত একটি পত্রে স্ত্রীকে লিখছেন : 'স্বর্ণের সকল আপদ কাটিয়া গিয়া নির্বিঘ্নে একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। স্বর্ণের মেয়ে সুন্দরী হইবার ত কথাই আছে।'

জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের বোম্বাই প্রবাসের সময় ভগিনীদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই সবচেয়ে বেশি যাতায়াত করতেন। স্বর্ণকুমারী নিজে ১৩০৯ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'প্রদীপ' পত্রিকায় বলেছেন, '১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম।' এই অংশটুকুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি এক অপরিসীম আগ্রহ যে তিনটি মানুষেরই সমান ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভগ্নীর বিবাহ-পরবর্তী জীবনেও সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা পূর্বের মতই ছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর প্রথম উপন্যাস ও মুদ্রিত গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন পূজনীয় মেজদাদাকে। আর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' উৎসর্গ করেন 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী/স্নেহের ভগিনী'কে। উৎসর্গপত্রে লেখক বলেছেন, 'তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি— তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তাছাড়া, আমার বোম্বাই-কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত; তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাস-যন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জানতেই দাওনি;— এই সকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই, এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।'

অতি শৈশবেই যে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল তার পরিচয় পাই 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে। — 'আমি সন্ধ্যাবেলা (মেয়েদের) সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম— তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা। বিবাহের (১৭ নভেম্বর ১৮৬৭) পর তিনি 'দীপনির্বাণ' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হইলে সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা হইয়াছিল।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্যোগেই জন্ম ঘটেছিল 'ভারতী' পত্রিকার। প্রথম প্রকাশ থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বর্ণকুমারী। সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে 'যোগ্য সঙ্গীরূপে' পেয়েছিলেন। তা ছাড়া শুধু সাহিত্যেই নয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরচর্চার সঙ্গেও স্বর্ণকুমারী যুক্ত ছিলেন। পিয়ানো বাজিয়ে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নতুন নতুন সুর রচনা করতেন

তখন সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথায় বেঁধে রাখার দায়িত্বে যে তিনজন ছিলেন, স্বর্ণকুমারী তাঁদের অন্যতমা। জানকীনাথের বিলাত গমনের ফলে স্বর্ণকুমারী চলে এসেছিলেন পিত্রালয়ে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চা এবং সঙ্গীতচর্চা দুয়েরই পূর্ণতা লাভের সুযোগও তাই ঘটেছিল। বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্লময়ী তাঁর 'আমাদের কথা'য় বলেছেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানে ঝোঁক খুব ছিল ও গান বড় পছন্দ করিতেন, একদিন আমার গান তাঁর শুনিবার খুব ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকুমারী— তাঁরও এসব বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর কাছে লইয়া গেলেন।' বাড়ির এই বধূটিকে স্বর্ণকুমারীই মনোনীত করেছিলেন। ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে ননদিনীর সম্পর্কটি কত সুন্দর ছিল এই উল্লেখের মধ্য দিয়েই তা বোঝা যায়।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পর্কটি যে কতখানি স্নেহপরিপূর্ণ ছিল, ছোট বোনটিকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে তা সুন্দর ফুটে উঠেছে।

শান্তিনিকেতন
২৬ কার্তিক ১৩৩০

স্নেহের বোনটি আমার— আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এখানে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা ঠিক আমার সময়োপযোগী, আর সেই জন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর [সত্যেন্দ্রনাথ] বিরচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই :

কেহ নাহি আর আমার— সব তুমি।
লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ। যদি
পাই তোমার ছায়া নাহি ডরি করাল কালে
হায়! বিষ্ণু নাই— কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
বড়দাদা

কিছুদিন পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল। ভাইয়ের প্রতি গভীর ভালবাসা স্নেহের বোনটির কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ উজাড় করে দিয়েছেন। ভাইবোনদের পারস্পরিক সম্পর্কটি কত নিবিড় ছিল তা আমরা এ থেকেই অনুমান করতে পারি।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের ন' দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র পাঁচ বছর। দুজনের মধ্যে সম্পর্কটিও ছিল ভারী মধুর। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'গাথা' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। দিদির আশীর্বাদটুকুও ভারী সুন্দর—

যতনের গাথা-হার কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয় রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই— তাইতে ডরাই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর স্নেহ-ভালবাসার নানা চিত্র ইন্দিরা দেবী ও সরলা দেবীর স্মৃতিচারণায় চিত্রিত হয়েছে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সেই ছবিগুলিতে ব্যক্তিমানুষ দুটিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী প্রতিভা ও দক্ষতার দিক থেকে নানাভাবে তুলনীয়। বিরাট এবং ব্যাপক কর্মক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা স্বর্ণকুমারীর না থাকলেও সেই সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তা অবশ্যই অসাধারণত্বের

দাবি রাখে। সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতায়' বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বিলেত নিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন।...'বসন্ত উৎসব' বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব জিনিস। রবিমামার মত ইউরোপের দেশবিদেশ ঘুরে বহুদর্শিতায় পুষ্ট প্রতিভার ফল এটি নয়। শুধু ঘরের ভিতরে অন্তঃপুরে বসে বসে অন্তঃপুরিকার রচনা। ভারতবর্ষের পূর্বাপর কেবলমাত্র কল্পনা-রাজ্যবাসী কবিদেরই শ্রেষ্ঠতম কাব্যরচনার সঙ্গে তুলনীয়। বন্ধুদের যে আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে দোসর হয়েছিল, সেই আনুকূল্যের অভাবে এটা দেশে ছড়িয়ে পড়েনি।' দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারীর সম্মিলিত প্রয়াসে যে ভূমিটি তৈরি হয়েছিল এবং অনুকূল বায়ুটি প্রবাহিত হয়েছিল তা নতুন নতুন ফসলে ভরিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল অবশ্যই।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫-র পৌষ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গীত রচনায় স্বর্ণকুমারীর দক্ষতার পরিচয়ও সেখানে আছে :

'রিমিঝিম ঘন বরিষে— সখি লো,
বিরহী নয়ন-পারা ঢালিছে শ্রাবণধারা,
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
গুরু গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে।'

রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া'র (১২৮৯) 'ঝম ঝম ঘন ঘন রে বরষে' এবং পরে 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় পাঠান্তরে 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে' গানটিতে পূর্ববর্তিনীর প্রভাব অবশ্যই লক্ষণীয়। প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বালক রবীন্দ্রনাথকে স্বর্ণকুমারী নানা ভাবে উদ্বোধিত করেছেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রকথা'য় বলেছেন, 'বালকদের অভিনয় সাহায্যার্থে 'মুকুট' এবং বিবিধ 'হেঁয়ালিনাট্য' তাঁহার ভগ্নী স্বর্ণকুমারী ও ভ্রাতৃজায়া জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে রচিত।'

১৮৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার দার্জিলিং যাত্রা করেন। প্রথমবার তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। এবার দলটি বেশ বড় এবং তিনিই একমাত্র পুরুষ অভিভাবক। মৃণালিনী দেবী, মাধুরীলতা, বড়দিদি সৌদামিনী দেবী, ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা— হিরণ্ময়ী ও সরলা, তা ছাড়া একটি দাসী – স্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে এঁদের নিয়ে ছোট গাড়িতে উঠতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময়কার যাত্রার ছবিটি ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এবং 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় লেখা স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দারজিলিং পত্র' রচনায় ভারী কৌতুক সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'রাত্রি দশটা— জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো বেলগাড়িতে ওঠা গেল...। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র Ladies Compartment এ তোলা গেল— কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি— তবু ন'দিদি বলেন আমি কিছুই করিনি।' ঠিক এই সময়ের বিবরণ স্বর্ণকুমারীর রচনায় : 'আমরা রেল হইতে নামিয়া দামোদিয়ার ঘাটে জাহাজে যখন উঠিতেছি একজন লোক আমাদের দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল : 'হ্যাঁ গা ওঁরা কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথাকার রাজা বুঝি?' এইখানে বলা আবশ্যক, আমাদের অভিভাবকটিকে সাজে গোজে অনেকটা রাজার মতই দেখাইতেছিল। একে সুশ্রী সুন্দর মুখ। তাতে চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা লম্বা তার উপর হিন্দুস্থানী পাগড়ি— রাজা মনে করা কিছুই আশ্চর্য

ছিল না। কিন্তু দাসীটি যেরূপ উত্তর দিয়াছিল সেইটিই কিছু মজার— সে বলিল, 'ওগো ওঁরা ব্রাহ্মণ গো ব্রাহ্মণ।'

শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে চাপবার পর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '....ক্রমে ঠাণ্ডা তারপর মেঘ, তার পরে ন'দিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভারভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। ...রেক থেকে জিনিসপত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা— এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ ন'দিদিরা ডুলিতে চড়ে বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে সোফায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষমানুষের মত নয়।' ন'দিদির কাছে পুরুষমানুষের মত না হতে পারার কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন। আর ন'দিদি তার রাজার মত ভাইটিকে নিয়ে তাঁর বর্ণনায় আরও একটু কৌতুক করেছেন, 'আমরা যদিও এই নূতন দারজিলিং আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের অভিভাবকটি... আগে আর একবার আসিয়াছিলেন। ঘুম স্টেশনে পৌঁছিবার কিছু আগে হইতে তিনি ভাবিয়া লইয়াছেন এইবার ট্রেন দারজিলিং স্টেশনে আসিবে। তিনি যত বাড়ি ঘর দেখিতেছেন ততই প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহার পূর্ব স্মৃতি ততই নূতন হইয়া উঠিতেছে, গতবার যে বাড়িতে ছিলেন তাহার কাছে যে ঝরণাটি ছিল সেটি পর্যন্ত তিনি আমাদের দেখাইলেন, সবই মিলিয়া গেল, এখন কেবল গাড়ি থামিলে হয়— দারজিলিং-এ নামা মাত্র বাকী। গাড়িও থামিল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন আমাদের কেহ লইতে আসিয়াছে কিনা, দেখিলেন কোথাও কেহ নাই। কাজেই আমরা গাড়িতে বসিয়া রহিলাম, লোকজন ডাকিয়া আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া তিনি নামিলেন। ...আমাদের ভাব দেখিয়া একজন কুলি একটা বাক্সে হাত দিয়া চোখ মুখ নাড়িয়া বলিল— গুম গুম স্টিশন উতরেগা? আমরা তখন বুঝিলাম এটা দারজিলিং নয়— এই সময় আমাদের অভিভাবকটিও ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঘুম শুনিয়া তাঁহার ঘুম ছুটিয়া গেল।'

ছোট ভাইটিকে নিয়ে ন'দিদি স্বর্ণকুমারী যেমন সস্নেহে কৌতুক করেছেন, তেমনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কাব্য-পাঠের গুণের। কঠিন কবিতাও কত সরস ও শ্রুতিসুখকর করে পাঠ করা যায়, তারই উল্লেখ পাই স্বর্ণকুমারী দেবীর বর্ণনায়। দার্জিলিংয়ের Castleton House-এর বিশাল হলঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসত কাব্যপাঠের আসর। সেই পাঠের আসরে শ্রোতারা সবাই মহিলা। স্বর্ণকুমারীর বর্ণনায় : 'সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখান কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধা মত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে, ব্রাউনিং থেকে, খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন, তোমাকে একবার শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মুগ্ধতার এমনি প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে সরলা দেবীর স্মৃতিচারণায়। 'জীবনের ঝরাপাতায়' তিনি লিখেছেন, 'আমার সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন— সে রবিমামা। মনে পড়ে দার্জিলিং এর 'Castleton House' এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম— প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browning এর 'Blot in the Scutcheon' মানে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন।'

সেবারের দার্জিলিংয়েই স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি'র জন্যই সমিতির অন্যতমা সদস্যা শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা বহন করেই।

সেবার দার্জিলিং থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে গিয়েছিলেন একমাস পরেই। সঙ্গিনীদের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হেপাজতে। তিনি চলে আসার পর কবিতার সেই সান্ধ্য আসর আর বসেনি। সেটিরও উল্লেখ রয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্রে। 'পড়াশুনোর মজলিস'টি যিনি জমিয়ে রাখতেন তাঁর অনুপস্থিতি ন'দিদি ঠিকই অনুভব করেছিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা 'জীবনস্মৃতি'তে কোথাও বলেননি। ছোড়দিদি বর্ণকুমারীর কথা কিন্তু বলেছেন। তিনি পণ্ডিতমশায়ের কাছে পড়া করলেও বা না করলেও একইরকম বিধান পেতেন, এটি বালক কবির কাছে বড়ই মনোবেদনার কারণ ছিল। অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণকুমারীকে ঠাকুরবাড়ির সকলেই একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু তবুও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যিকা স্বর্ণকুমারীর আসনটি কেমন ছিল, তা জানার একটু ইচ্ছা থাকে বৈকি!

স্বর্ণকুমারী তাঁর 'গাথাকাব্য'টি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন'দিদি স্বর্ণকুমারীকে কোনও গ্রন্থ উৎসর্গ করলেন না কেন? তাঁর অজস্র রচনার একটিও দিদির করকমলে তিনি অর্পণ করলেন না, এটা সত্যিই বড় বিস্ময়ের। যদিও বড়দিদি সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন পুরো একটি উপন্যাস।

সাহিত্যের সর্বশাখায় স্বর্ণকুমারী লেখনী চালনা করেছিলেন। তিনি গানও রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী এই দু'জনের সাহিত্যের গুণগত সমালোচনা অবশ্যই করা চলে না। কিন্তু সীমিত পরিধির মধ্যে থেকেও স্বর্ণকুমারী সাহিত্যের ডালায় যে ফুলগুলি সাজিয়ে দিতে পেরেছিলেন সেগুলিও অবশ্যই সৌকর্যের দাবি রাখে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করেন ক্রিস্টিনা আলবার্স। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯০৯ সালে 'The Fatal Garland' নামে সেটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে তখন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাছে এই বইটি পাঠান। কিন্তু অনুবাদ-কর্মটি কবির পছন্দ হয়নি। ভাইঝি ইন্দিরাকে এই সময়ে লেখা চিঠিতে কবি মন্তব্য করেছিলেন : 'ন'দিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন, এসব জিনিস এখানে কেন কোন মতেই চলতে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিসটা থাকা চাই।'

এরপর আর কোনও মন্তব্য চলে না। কিন্তু স্বর্ণকুমারী ওইখানেই থেমে যাননি। তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ (১৯১৩) লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'অ্যান আনফিনিসড সং' নামে। ১৯১৪ সালে এটির দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল ওই একই কোম্পানি থেকে। বিদেশি পাঠক মহলে অনুবাদ গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। আর এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বেরিয়েছিল নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ওয়েস্ট মিনস্টার গেজেট, ক্ল্যারিয়ন প্রভৃতি পত্রিকায়।

ভাইঝি ইন্দিরা দেবী স্বর্ণকুমারীর অনুবাদ-কার্যে অনেক সময় সাহায্য করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল বেশি। ইন্দিরা দেবী ও সরলা দেবীর নানা কথায় সেই ছবি আমরা পেয়েছি। লেখাপড়া, গানবাজনা, সাহিত্যচর্চা, সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ— এইরকম সব ব্যাপারেই এই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েরা পরবর্তী প্রজন্মে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরও একটা কথা— স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ ঠাকুরবাড়িতেই জীবন কাটাননি, আর সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীও ঠাকুরবাড়ির বাইরেই নিজের মত করে থাকাটা বেছে নিয়েছিলেন। তবে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সংযোগটি উভয় পরিবারেরই ছিল নিয়মিত এবং প্রায় প্রাত্যহিক। সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য় তো বলেইছেন : 'এমন একটি দিন যেত না যেদিন হয় মা-বাবা জোড়াসাঁকোয় না যেতেন, কিম্বা জোড়াসাঁকোর

লোকেরা আমাদের বাড়ি না আসতেন।' নিঃসন্তান কাদম্বরী স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলাকে নিজের বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তার দেখাশোনা খাওয়া-পরার ভার তিনি নিজের হতে তুলে নিয়েছিলেন। সে থাকতও তাঁরই কাছে, বাড়ির ভিতরে স্বর্ণকুমারীর কাছে নয়। দুর্ঘটনায় তার অকালে মৃত্যু না ঘটলে হয়ত কাদম্বরী দেবীও অকালে নিজেকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে নিতেন না! আর কাদম্বরী দেবীকে মনে রাখার বড় পরিচয় যদি কেউ দিয়ে থাকেন তবে তিনি স্বর্ণকুমারী।

'ভারতী' পত্রিকাকে ঘিরে যে আনন্দময় উত্তেজনা ঠাকুর পরিবারে বিরাজিত ছিল, তার হঠাৎ ছেদ পড়েছিল কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে। 'ভারতী' প্রকাশের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর যোগ ছিল ওতপ্রোত। তাই তাঁর চলে যাওয়ার পর 'ভারতী'র সেবকরা পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঘোষণা করেন : 'ভারতী' বিশেষ কারণে প্রকাশিত হইবে না।' কী হল তারপর? সেই ঘোর সঙ্কটময় দুর্দিনে 'ভারতী'র গুরুভার নিজ হাতে তুলে নিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। শরৎকুমারী চৌধুরানী তাঁর 'ভারতীর ভিটা'য় লিখেছিলেন : 'ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল— 'ভারতী'র সেবকরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, 'ভারতী' ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে 'ভারতী'কে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ 'ভারতী'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।'

ঠাকুর পরিবারের কন্যাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর পরে যিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন, তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী স্বর্ণকুমারীকে ইন্দিরা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'স্মৃতিসম্পুট' গ্রন্থে বাবার বাড়ির অনেকের কথাই বলেছেন। তাঁর পিসিমারা কে কেমন ছিলেন পরপর সাজিয়ে তা তুলে ধরেছেন। 'ন'পিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবী তো স্বনামধন্যা। সুন্দরী, সুলেখিকা, সংগীত-রচয়িতা, সম্পাদিকা ও সমাজসেবিকা বলে সেকালে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন ও উইলে এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, তাঁর লেখার ইংরিজি তর্জমায় আমি অনেক সাহায্য করেছিলুম। অল্প বয়সেই চার ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে বাকি জীবন মনোমত কাজে কাটাবার অবকাশ ও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন; বিশেষ ছেলেপিলেকে নিজে খুব দেখতেন বলে মনে হয় না। ওঁদের পরিবারের এই ছাড়া ছাড়া ভাবটা আমাদের বারবারই চোখে লাগত। যে-যেখানে বসে আছেন, সেইখানেই খাবার এনে দিচ্ছে, সেইখানেই খেয়ে উঠে যে-যার নিজের কাজ করছে।

কিন্তু ঘরসংসার যে একেবারে দেখতেন না তা নয়, কারণ শুনেছি খুব হিসেব করে খরচ করতেন। আর একটি মনস্তত্ত্বের রহস্য এখানে পেশ করছি, সেটি এই যে, 'পিসিমারা বড় লোকের মেয়ে হয়েও হাত-দরাজ ছিলেন না। অথচ তাঁদের ভাইবউরা গরীবের মেয়ে হয়েও মুক্তহস্তে খরচ করতেন— এমনটি কেন হয়? — আমার একটা সমাধান এই মনে হয় যে, মেয়েরা স্বামীভাগ্যেই ভাগ্যবতী নিজেদের মনে করেন ও সেইভাবে চলেন, সেদিকে তো পিসিদের জোর ছিল না, তাই টেনে চলতেন।' — এক্ষেত্রে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহটি ঠাকুর-পরিবারের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। সরলাদেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের কন্যাদের বিবাহের ক্ষেত্রে যে দুটি রীতি প্রচলিত করেছিলেন তার কোনওটিই জানকীনাথ মেনে নেননি। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ এবং পত্নী-সহ শ্বশুরগৃহেই বসবাস—

কোনটিই তিনি করেননি। সরলা দেবীর কথায়, 'দাদামহাশয় তাঁর এই দুই শর্তই মেনে নিলেন। যদিও মা তাঁর পরম আদরের মেয়ে ছিলেন, তবু তাঁকে আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিলেন।'

স্বর্ণকুমারী পিতার আদর, মায়ের স্নেহ, ভাইদের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন নিজগুণে। বাল্যকালেই তাঁর স্বতন্ত্র কিছু গুণ পিতা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রকথা'য় বলেছেন, 'অল্পবয়সেই স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাশক্তির বিকাশ হয়। তাঁহাকে মহর্ষি স্বয়ং এবং তাঁহার দাদারা রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহর্ষি তাঁহার একটি রচনা পড়িয়া তাহার পার্শ্বে লিখিয়া দিয়াছিলেন: 'স্বর্ণ, তোমার লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক।' জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ পিতার কাছ থেকে স্বর্ণকুমারী লাভ করেছিলেন। সেই ঠাকুরবাড়ি নেই, সেই সব মানুষেরাও নেই কিন্তু বেঁচে আছে তাঁদের লেখনী নিঃসৃত সেইসব 'পুষ্পবৃষ্টি' যা কোনওদিনই হারিয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না। সাহিত্যের যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির পুত্রকন্যারা সৃষ্টির কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন, তা আজ সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে বহু দূর বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুরুর ইতিহাসকে সামনে রেখেই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে যে ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন— ঠাকুরবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে তা আজ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অধ্যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা

গৌতম ভট্টাচার্য

আমি, না চাহি অন্য বিভা ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।

'গীতিগুচ্ছ'র এই পঙ্‌ক্তি থেকে কাব্যলক্ষ্মী বা Muse-এর প্রতি স্বর্ণকুমারীর স্বকণ্ঠ আবেদন স্পষ্ট। যে সালে তাঁর জন্ম সে বছরই মহিলা কবির প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত— কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬)। স্বর্ণকুমারীর প্রথম কবিতা প্রকাশকালের মধ্যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মহিলা কবিদের অন্তত সাতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর প্রথম কবিতা 'বাল্যসখী' 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১২৮৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়।

'কলিকাতা বাল্মীকিযন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত' হয়ে স্বর্ণকুমারীর 'গাথা'-শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে: ছোট ভাইটি আমার,/যতনের হার কাহারে পরাব আর? স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,/যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে, দুরন্ত ভাইটি তুই— তাইতে ডরাই। স্বর্ণকুমারীই বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'গাথা' রচনা করেন। শুধ্‌ প্রথম প্রকাশ ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় হতে পারে কিন্তু স্বর্ণকুমারীর বিশেষত্ব শুধু ইতিহাস-মাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন রীতিগত গাথার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর গাথার হয়ত মৌলিক রূপান্তর আছে। যদিও প্রাকরণিক নির্বাচনে সে স্বরূপ সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর একটি বিশিষ্ট মনোভক্তি, জগৎ ও জীবনের প্রতি কুণ্ঠাহীন সম্ভ্রমবোধ এবং সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার বোধ ধরা পড়েছে এই গাথার পাঠক্রমে।

স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থ 'কবিতা ও গান'-এ 'প্রভাতসঙ্গীত', 'মধ্যাহ্নসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'নিশীথসঙ্গীত' আছে। এ-সব নামেব সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে বিহারীলালের কাব্যসূত্রে, রবীন্দ্রনাথও 'প্রভাতসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশ করেন। বিহারীলাল— স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই অগ্রজ কবি। ওই দুজনেরই ঋণ রয়েছে বিহারীলালের কাছে। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত 'কবিতা ও গান' প্রকাশিত হয়েছে কার্তিক ১৩০২ সালে। গ্রন্থের উপসংহারে লেখা আছে:

ভাই,
সামান্য এ উপহার, যোগ্য নয় তব।
শুষ্ক ফুল দু চারিটি, নাহি বাস নব;—
তবু যদি লহ হর্ষে, ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস সুভাবে পুনঃ হাসিবে এ সব!

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল : কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারিটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল 'বসন্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজি ভাব লইয়া রচিত।

অনবধানতাবশত দুই একটি গান একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

রচয়িত্রী

স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থ 'কবিতা ও গান'-এ মোট চুয়াত্তরটি কবিতা সংগৃহীত। সেখানে আছে প্রভাতসঙ্গীত, মধ্যাহ্নসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত ও নিশীথসঙ্গীত। গান আছে নিরানব্বইটি, জাতীয় সঙ্গীত ছ'টি এবং ধর্মসঙ্গীত আছে চোদ্দটি।

প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা 'প্রভাত'— অরুণমুকুট শিরে,/অধরে ঊষার হাসি,/পদতলে প্রস্ফুটিত/শত শত ফুল-রাশি! — প্রকৃতি উদার, প্রভাতের আলো আর বাতাস তাকে করেছে পূর্ণ তনুশ্বেতা। পাখির গান, বাতাসে আন্দোলিত তরুসারি— হরষে উন্মুখ। শ্যাম-শস্য দূর্বাদল' ভক্তিভরে অবনত হয় ধরাতল ছোঁয় প্রভাতবাণীর। যে বালিকা সাজি হাতে ফুল তুলতে এসেছে সেও গেছে ভুলে প্রভাতের আনন্দমগ্ন রূপ দেখে। প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা 'প্রভাত'। তাই প্রকৃতির বর্ণনা সেখানে নিষ্প্রাণ নয়, এক প্রাণস্পর্শী সজীবতা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। 'খুকুরাণী' কবিতায় খুকুরাণীর প্রতি এক একান্ত বাৎসল্য প্রকাশিত হয়েছে। তাকে দেখে হৃদয় ভাসে হরষভরে, তাই তাকে বুকে ধরে রাখতে চান তিনি। 'আমি কি চাহি' কবিতায় আছে রূপ-স্পর্শের আনন্দসঙ্গীত। জগতে সবাই যখন শোক দুঃখের নিয়তি-নির্ধারিত তখন কবি কালাকালহীন আনন্দ-উল্লাসে বাঁধা, 'রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই, আনন্দ সঙ্গীত গাহি।'

স্বর্ণকুমারীর কবিতায় এক সহজ উচ্ছ্বাসের প্রকাশ আছে, কিন্তু তা দীপ্তিমান হয়ে ওঠেনি। সমস্ত বর্ণনাই তাই অনুভবের কোনও আড়াল তৈরি করে না, যা তীব্র বা তীক্ষ্ণ হয়ে হৃদয়ে বিদ্ধ হতে পারে। 'জানি না ত' ভালবাসার সেই দিব্য মনোকথা, যাতে হৃদয় অনুভবের অনন্ত স্বপ্ন রচনা করে, দেহের সীমার মধ্যে অনন্তের ঠাঁইকে অবিষ্কার করে সে আর বলে, 'জন্ম-জন্মান্তরে পূর্ণ ভবিষ্যের আশা'। 'প্রভাত' এবং 'জানি না ত' এই দুইটি কবিতার মিলিত প্রকাশ ঘটেছে 'বিরহ কারে কয়' কবিতায়। প্রভাতের রবি, কাননের ফুল, পাখির গান আর ভোরের বাতাস— সব কিছুরই মধ্যে রয়েছে তারই ছোঁয়া— প্রকৃতি ছুঁয়ে সে হয়েছে সর্বব্যাপী। প্রকৃতির যে কোনও প্রকাশে তারই অস্তিত্বের অনুলিপি, প্রতিচ্ছায়া, গভীর রজনীতে স্বপ্নে স্বপ্নান্তরে তারই কল্পভুবন, তাই 'বিরহ সেথা যত, মিলনে অনুরত,/গাঁথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়।'

আঠারটি কবিতার সংকলন 'মধ্যাহ্নসঙ্গীত'। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় বসন্তের দ্বিপ্রহরের বর্ণনা। কম্পিত বনভূমি, বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ, ঘুঘুর সকরুণ ডাক। কিন্তু সমগ্র মধ্যাহ্নের চিত্র তীব্র হয়েছে এই বর্ণনায় 'চাতক সে ক্ষুদ্র পাখি, সকরুণ কণ্ঠে ডাকি,/মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।' কিন্তু এরই বিপরীতে কবিতার শেষে কলস কোমরে তুলে গৃহমুখী এলোচুল যে মেয়েদের কথা আছে— তা বসন্তের একাকী মধ্যাহ্নকে ছন্দোময় করে তোলে দূর-মাঠে রাখালের বাঁশির শব্দে। কবিতা তাই ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এ-গ্রন্থে 'বঙ্গের বিধবা' তাঁর খ্যাত কবিতা। এ-কবিতার নীতি-নিষ্ঠার এক প্রজ্বল মূর্তিরূপে বঙ্গের বিধবাকে রূপ দিয়েছেন কবি। — 'বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা'। হৃদয়ে গোপন অশ্রু নিয়ে সংসারভ্রষ্ট হয়ে এ-সংসারকে সেবায় যত্নে সে রমণীয় করে তোলে। কবিতার মধ্যে গরিমার মাহাত্ম্য থাকলেও এক ধরনের দীর্ণ মন জেগে ওঠে। সে দুঃখ পেতে জানে কিন্তু সমর্পণই তার ভঙ্গি। 'বলি শোন খুলে' কবিতায় যদিও মধুসূদনের প্রভাব বোঝা যায়, তবুও এ কবিতা অনেক বেশি কাব্যময়। বৈষ্ণব পদাবলীর ঋদ্ধ উত্তরাধিকাব কাবি স্বীকার করে নিয়েছেন, তবু এ কবিতা স্বর্ণকুমারীর উজ্জ্বল কবিতার একটি। হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা/যে মধু মূরতি বাঁকা/প্রাণের পরানে পূর্ণ সে এরূপ রূপ কালো/আহা মরি বড় ফন্দি!/শরীর করিয়ে

বাদী/হরিবে সে জীবন-জীবন্ত প্রেম-আলো/ভাল সই ভাল খুব ভাল! এ কবিতায় প্রেমার্ত রাধিকার ঈপ্সিত ভুবন আর প্রবল বাধার দোলাচলে এক বিস্ময় বিষাদ আর অনিবার্য সমর্পণ— দুই ধরা পড়েছে। এ কবিতায় স্মরণযোগ্য পঙ্ক্তি রয়েছে অনেক। প্রেমের এই বেদনার দিক 'কেমনে ভুলি' কবিতায়ও প্রকাশিত। যার সঙ্গে স্বপ্নে আত্মবিনিময়, যার সঙ্গ-বিসঙ্গে স্বর্গ-নরকের মেরুতুল্য পার্থক্য— তাকে কি কখনও ভোলা যায়। সে স্মৃতিময় আর স্মৃতিস্পৃষ্ট হয়ে জড়িয়ে আছে প্রতিনিয়ত।

'নহে অবিশ্বাস' কবিতায় প্রেমের বেদনার্ত সমীক্ষা আছে। প্রায় ঈশ্বরের সমানুপাতিক নির্ভরতায় প্রেমকে মহিমাসিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রভাতসঙ্গীতে প্রভাত, মধ্যাহ্নসঙ্গীতে 'মধ্যাহ্ন' সন্ধ্যাসঙ্গীতে সন্ধ্যা প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন রয়েছে সঙ্গীতের অন্তর্লীন প্রবাহে।

সুনীরব সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে জ্বলজ্বল করছে দুটি তারা। মৃদুমন্দ বাতাসে মধুর চাঁপার গন্ধ ভেসে আসছে। নুয়ে পড়া বকুল শাখা থেকে ঝরে পড়ছে ফুল। প্রশান্ত সরসীর নিহিত ছায়ায় যেন গভীর প্রাণের কী এক রহস্য। মালতীলতার গাছে ফুলে ফুলে ভরে আছে—। এই সন্ধ্যার পূরবী রাগিণী বাজছে, যেন প্রাণের মধ্যে অনন্তের তানকে জাগিয়ে তুলছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতে 'সন্ধ্যার স্মৃতি' কবিতায় একই সঙ্গে আসক্তি ও নিরাসক্তির পরিচয় আছে।

স্বর্ণকুমারীর কবিতার এই এক বিশেষত্ব— প্রবল আকাঙ্ক্ষার আক্রমণ স্বীকার করেও তিনি নির্লিপ্ত উদাসীনতায় অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটাতে পারেন। স্মৃতির কথা ফিরে ফিরে আসে তাঁর কবিতায়। সারাদিন গেছে বনেতে কাটিয়া/দুজনে বনের বালা/জানিতাম না তো তখন আমরা/কেমন বিষাদ জ্বালা/সে সুখের দিন কোথায় এখন,/স্বজনি গো বল দেখি?/হৃদয়ের ধন তুই বা কোথায়/আমি বা কোথায় সখি! 'বাল্যসখী' কবিতায় ছোটবেলার বন্ধুতার কথা পরিণত বয়সে স্মৃতি থেকে সঞ্চয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকে অবশ্য স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিজীবনের ঘটনা প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় সখ্যের কথা বলেন, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়িয়ে কবিতা বিষয়স্থ হয়েছে— তাই এই অনুষঙ্গ ছাড়াও তাঁর প্রথম কবিতা যথেষ্টই হৃদয়গ্রথিত।

এই সুরম্য নন্দনকাননে কত খেলা করেছি, সময় কোথা দিয়ে চলে যেত, তরুমূলে ফুল তুলে হৃদয়ের লুকানো কথা বলে সুখে দুঃখে সময় কেটেছে দুই সখীর। কুসুম সাজে সাজাতে গলার মালা, কানের দুল গেঁথেছি, সরসীর কূলে বসে মালা গাঁথতাম দুজনে, পাপড়ি ভাসিয়ে খেলা দেখতাম আপন মনে, কিন্তু এই স্মৃতির সঞ্চয়ে আজ শুধু ব্যথাই রয়েছে— সে সুখের দিন এখন নেই,— একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম/আছিস কেমন ফুটি,/কে ছিঁড়িল আহা, একটি গো তার/একটি হৃদয় ছুটি,/ (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ: ৩৮৪)।

'নিশীথ সঙ্গীত' তেইশটি কবিতার সঙ্কলন। এ-গ্রন্থ শুরু হয়েছে 'জীবন-অভিনয়' দিয়ে। এ-কবিতায় প্রথমে ঘনঘোর বর্ষার মেঘ গর্জনের সঙ্গে আশ্রয়হীন এক রমণীর অসহায়তার বর্ণনা আছে। কিন্তু তারই মাঝে জীবনের দার্শনিকতার প্রকাশ আছে। এ কবিতায় নারীর একাকিত্ব আর অসহায়তার মধ্যেও যে বিষাদ-প্রতিমার কথা আছে, তা যেন নিয়তি-নির্বাসিত অথবা স্পর্শময়। 'যবনিকা এ খেলার কভু না পড়িতে চায়'—।

'একা আমি যাত্রী' কবিতায় মহাঅন্ধকারে সঙ্গীহীন একক যাত্রার কথা আছে। কিন্তু সে যাত্রা শুধু অসহায়তাকেই চিহ্নিত করেনি সমস্ত আশ্রয়হীনতাকে মেনে নিয়েও সে স্বনির্বাচিত পথে এগিয়ে গেছে।

'যিনি যতই ভাবুক তিনিই তত কবি। প্রকৃত ভাবুক হইতে গেলে একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থাকা চাই, যাহা দ্বারা তিনি জগৎসংসারের অন্তর্নিহিত ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন' (ভারতী, বালক জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪, পৃঃ ১১৪)— এই দিব্য অনুপ্রেরণায় আস্থা ছিল তাঁর, তাই বুদ্ধির শাসনে কবিতাকে স্থিত, ধীর করতে চাননি তিনি। তাঁর কবিতায় এক ধরনের নিবেদন আছে, আছে

নেপথ্যচারিতা। 'গান গাহে যারা/নাকি তারা;/জানাক ব্যথা/আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা,/শুধু আকুলতা। (নীরব বীণা)।

স্বর্ণকুমারীর কবিতায় প্রধান অভাব মনে হয় প্রতিমাকল্পের। আত্মনিবেদনের সরল ভঙ্গি রয়েছে তাঁর, কিন্তু তার থেকে কোনও স্পর্শমাত্রা তৈরি হয় না তেমন করে। তাই কবিতা অনুভব-অনুষঙ্গ তৈরি করলেও তা ব্যাপ্ত হয় না গভীরে।

'আমি কি চাহি'/সে আমার, আমি তার/আমার কি নাহি/অথবা 'জানি না ত' কবিতায় প্রেমের কথা আছে, আছে তার দিব্যম্লান কিন্তু যে মর্মজ শব্দচিহ্নে সম্ভব হয়ে ওঠে রহস্যময়তা— তা যেন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মত শোনায়— দেহের সীমাতে ও যে অনন্তের বাসা,/জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ভবিষ্যের আশা।

স্বর্ণকুমারীর কবিতায় প্রেম আর প্রকৃতি দুই স্পর্শবিন্দু। 'প্রেম' বিষয়ে এক লেখায় তিনি বলেছেন, 'যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, যেমন বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট সৌরজগৎ এবং তাহা হইতে আবার বাষ্পপ্রবণতা, সেইরূপ আমাদের ভালবাসাও ছায়াময় হইতে মূর্তিমান এবং মূর্তিমান হইতে আবার বিশ্বব্যাপী' (স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী ৫ম, পৃঃ ৭৬)। অন্যত্রও তিনি বলেছেন যে, মিলনের অভাব বিরহ-বিরহে যতখানি প্রেমের ভাব, মিলনে কি তা সম্ভব। তাই কবিতা বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর ভাবনা হল, যে কবিতার হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতা তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। কবিতা বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর ভাবনার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কবিতার সঙ্গতি তত দূর নয়। যখন তিনি বলেন, 'একটি কবিতা পড়িয়া যাহা পড়ি নাই, এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া যায়, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়' অর্থাৎ এক একটি কবিতা যখন ভাবনার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে তখনই তা সার্থক। স্বর্ণকুমারীর সময়ে কবিতার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে প্রতীকবাদের জন্ম হয়েছিল এই ভাবনা-অনুষঙ্গের কথা তাঁরা ভেবেছিলেন। কিন্তু যে স্বনির্বাচিত প্রতিমাকল্প এই অনুষঙ্গ গড়ে তুলতে পারে স্বর্ণকুমারীর কবিতায় তা পাওয়া যায় না। তাই প্রেম ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুভবের মাত্রা যতই বিস্তারিত হোক, তা বর্ণনার আবহ ছাড়িয়ে বোধসিদ্ধির রূপমিতি তৈরি করে না। তাই বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীকে হয়ত স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যাবে না কিন্তু কাব্যশিল্পের রহস্যময়তায় উদ্বোধিত এক লেখিকা কীভাবে নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা জানা আমাদের পক্ষে জরুরি কারণ উপন্যাসকার স্বর্ণকুমারীর গুরুত্ব সর্বজনগ্রাহ্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবন্ধ

শিউলি সিংহ ঘোষ

স্বর্ণকুমারী— উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস-ঋদ্ধ বাংলা সাহিত্যের আসরে এক স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতিভা। দ্বারকানাথের পৌত্রী, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজা, সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সহোদরা স্বর্ণকুমারী ছিলেন সেই প্রথম মহিলা, সাহিত্যের বিবিধ অঙ্গনে ছিল যাঁর অনায়াস অবাধ বিচরণ। তাই কবি-ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী, ছোটগল্প রচয়িতা স্বর্ণকুমারী, নাট্যকার ও গীতিকার স্বর্ণকুমারী এবং সম্পাদক স্বর্ণকুমারীর পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে চাই প্রাবন্ধিক স্বর্ণকুমারীকেও— বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহিলা প্রাবন্ধিক হিসেবে যাঁর ঐতিহাসিক মূল্য সুগভীর।

স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৬ সালে। বাঙালির বৌদ্ধিক জগতের সর্বস্তরে তখন ঘটে গিয়েছে নবজাগরণ। সাহিত্যচিন্তায়, সমাজচিন্তায়, ধর্মচিন্তায় এক নতুন চেতনার ভাবোচ্ছ্বাস তখন আলোড়ন তুলেছে বাঙালির মানসলোকে। স্বর্ণকুমারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে, যেটি ছিল সে যুগের আধুনিকতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। একদিকে পরিবার ও জন্মসূত্রে অর্জিত স্বকীয়তা এবং অন্যদিকে সমসাময়িক প্রভাব— এই দুই দিক থেকে ঋদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রতিভা।

শৈশব থেকেই পড়াশুনোর আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন স্বর্ণকুমারী। কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও রীতিমত বইপড়ার চর্চা ছিল। দেবেন্দ্রনাথও নারীশিক্ষার সপক্ষে সরব ছিলেন যথেষ্ট। দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে (১৮৪৯) ভর্তিও করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্বর্ণকুমারী শিক্ষিত হয়েছিলেন অন্তঃপুরের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়েই। ঠাকুরবাড়িতে অন্তঃপুরিকারা প্রত্যেকেই গভীরভাবে অধ্যয়ননিষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষিত বৈষ্ণবী কর্তৃক শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের প্রথা দ্বারকানাথেরও পূর্ব থেকে ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদা দেবী অথবা গিরীন্দ্রনাথের পত্নী যোগমায়া দেবী এঁরা প্রত্যেকেই বই পড়তে ভালবাসতেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন, 'মার কাছে আমরা বেশিক্ষণ থাকতুম না— আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার (যোগমায়া দেবী) ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রামস্থান। ...তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে বই পড়তুম— হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, লাম্বস টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ এইরূপ কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল।' আবার স্বর্ণকুমারীর কথাতেও একই আভাস : 'আহার বিশ্রাম পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে... স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। ... উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। ...আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী তো কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া

শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা — মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। ...মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসের অনুরাগিণী ছিলেন। ...মনে আছে, বাড়িতে মালিনী বই বিক্রি করিতে আসিলে মেয়েমহল সে দিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। ...ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।' ('আমাদের গৃহে অন্তঃপুর-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' : প্রদীপ/ভাদ্র ১৩০৬)।

এহেন ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে উনিশ শতকীয় নারীজাগরণের হাওয়া যে আছড়ে পড়বেই, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বস্তুত, উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ছিল, শিক্ষিত গণমানসে নারীস্বাধীনতা তথা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধের সঞ্চার। নবজাগরণোত্তর বঙ্গীয় সমাজ যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তাও আমাদের অজানা নয়। আর ঠাকুরপরিবারে এই সক্রিয় প্রচেষ্টা যাঁর দ্বারা বিশেষভাবে সিদ্ধ হয়েছিল, তিনি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন ঠিকই কিন্তু কিছু দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিলই; লক্ষণীয় দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী ব্যতীত অপর কোনও কন্যাকেই তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেননি। যদিও বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব তখন ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথই ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন মাত্রা যোগ করেছিলেন এবং নবজাগরণলব্ধ স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণা তাঁর দ্বারাই ফলিত রূপ পেয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে। স্বর্ণকুমারীর কথায় তারই ইঙ্গিত '—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার (সত্যেন্দ্রনাথের) মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। ...বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম।' ('আমাদের গৃহে অন্তঃপুর-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' : প্রদীপ/ভাদ্র ১৩০৬)। শুধু তাই নয়, যে ঠাকুরবাড়িতে একসময়ে অবরোধপ্রথা বিশেষভাবে মানা হত, মেয়েরা ঘেরাটোপ ঢাকা পালকিতে এ বাড়ি ওবাড়ি করত, এমনকি গঙ্গাস্নান করতে হলে মেয়েদের পালকিসুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনা হত, সেই ঠাকুরবাড়িতেই সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে গঙ্গাদর্শন করিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর রচনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই স্মৃতি।

বিবাহের পরেও স্বর্ণকুমারী এই মেজদাদার সান্নিধ্যেই বোম্বাইয়ে কিছুদিন ছিলেন। বস্তুত, এই কনিষ্ঠ ভগিনীর মানসভূমিতে উনিশ শতকীয় নবজাগরণলব্ধ আধুনিকতার যে বারি তিনি সিঞ্চন করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়নি, বরং বহুমুখী সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতায় ভবিষ্যতকালে তা হয়ে উঠেছিল বহুধা ফলপ্রসূ— বাংলা সাহিত্য লাভ করেছিল সেই প্রথম মহিলা সাহিত্যিককে, যিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও দক্ষ সম্পাদক।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণ মানুষকে নানাদিক থেকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। মানুষের মধ্যে গড়ে দিয়েছিল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবোধ এবং 'ব্যক্তি-ত্ব' সচেতনতা। যুক্তির নিরিখে বিষয়বস্তুর বিচার করার চেষ্টা এবং গোষ্ঠীচেতনার পরিবর্তে ব্যক্তিচেতনাকে মূল্য দেওয়া ছিল নবজাগরণোত্তর দৃষ্টিভঙ্গির মৌল লক্ষণ। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, এই ব্যক্তিসচেতনতাবোধ থেকে উনিশ শতকীয় নারীবাদের জন্ম। নারীও একজন ব্যক্তি; অতএব সেই 'ব্যক্তি'রূপ নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া যে প্রয়োজন, এ কথা সেদিন নব্যশিক্ষিত জনমানসে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল— স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে তারই দৃপ্ত

প্রকাশ। একজন নারী হিসেবে সমাজে নারীর অধিকার ঘোষণায় তিনি প্রথমাবধি সোচ্চার।

২.

ভারতী এবং ভারতী ও বালক পত্রিকার পাতায় পাতায় স্বর্ণকুমারীর বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যাপ্ত প্রবন্ধের বিপুল আত্মপ্রকাশ যথার্থই আমাদের বিস্মিত করে। একদিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সাধ্যমত প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ, সামাজিক বিষয়ভিত্তিক সিরিয়াস রচনা, সাহিত্যতত্ত্বমূলক বিশ্লেষণী আলোচনা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক নিবন্ধ আবার কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের মত ব্যঙ্গধর্মী আপাত সরস টুকরো রচনা (যেমন, গিলটির বাজার/ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪)— সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি সফল ও সিদ্ধ। তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিসমর্থিত বক্তব্যকে যথাসাধ্য নিরাবেগভঙ্গিতে সংহত ও পরিচ্ছন্ন বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বলি, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে মডেল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কি না অথবা কার দ্বারা তিনি কোথায় কীভাবে কতটা প্রভাবিত, সে সকল বিচারে আমরা যেতে চাই না। কারণ তৎকালীন যুগের প্রখ্যাত লেখকের রচনা তাঁকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করবেই সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, সেই প্রশ্ন না তুলে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে স্বকীয় সৃষ্টি হিসেবে বিচার করাই সঙ্গত বলে মনে হয়।

স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধ সাহিত্যের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে একটি সুস্পষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল, সেই ধারায় স্বর্ণকুমারীই ছিলেন প্রথম ও একমাত্র মহিলা লেখক। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়। এমনকি 'পৃথিবী' নামক তাঁর প্রণীত একটি স্বতন্ত্র, বিজ্ঞানগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল; প্রকাশকাল ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে আধুনিক পাঠক হিসেবে যা আমাদের যথার্থই বিস্মিত ও মুগ্ধ করে তা বৈজ্ঞানিক তথ্যের চমৎকারিত্ব নয় বরং লেখিকার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ও গভীর অধ্যয়নশীলতা। সেই যুগে যখন স্ত্রীশিক্ষার ধারণা কিছুকাল হল রূপ পেয়েছে মাত্র, তখন একজন অন্তঃপুর শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গললনার পক্ষে এই নিখুঁত ও অনুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান এবং বিস্তৃত পড়াশুনা সত্যিই এক অ-পূর্ব ঘটনা বৈকি!

৩.

বর্তমান আলোচনায় আমরা স্বর্ণকুমারীর কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব, দেখতে চাইব স্বর্ণকুমারীর আধুনিক চিন্তাভাবনার সেই গতিপথটি যা ছিল স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও স্বকীয়। 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল' স্বর্ণকুমারীর একটি বিখ্যাত রচনা। এই প্রবন্ধটি ভারতী ও বালক-এ প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১২৯৪ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে লেখিকার প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত, কালোপযোগী ও সুনির্দিষ্ট (Specific) - 'দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে...কিন্তু শিক্ষার এই ছড়াছড়িতে শিক্ষা কতটুকু হইতেছে, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়াছে, তেমন গভীরতা কই? ...আমি জিজ্ঞাসা করি, বি. এ., এম. এ পাশ করে সে কয়জন? আর যে কয়জনই করুক সাধারণ হিন্দু সমাজের সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক?' এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী পরিসংখ্যানভিত্তিক (databased) আধুনিক আলোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। একটি সুস্পষ্ট ছকের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, বেথুন স্কুলে ক্রমান্বয়ে ৯ম থেকে ১ম শ্রেণী পর্যন্ত (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে যুগে ১ম শ্রেণী ছিল বিদ্যালয়ে উচ্চতম শ্রেণী এবং ৯ম শ্রেণী ছিল নিম্নতম শ্রেণী) প্রতিটি শ্রেণীতে যথাক্রমে ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ছাত্রীসংখ্যা কত। স্বর্ণকুমারী প্রদর্শিত ছকে প্রমাণিত ৯ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীগুলিতে হিন্দু ছাত্রী কিছু থাকলেও ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণীতে অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীগুলিতে একটিও হিন্দু ছাত্রী নেই। তুলনায় ওই তিনটি শ্রেণীতে ব্রাহ্মছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১২, ৫, ৪। বস্তুত, এইজন্যই স্বর্ণকুমারী বলেন, 'যাঁহারা আপন কন্যা ভগিনীদিগকে

ইয়ুনিবার্সিটির পরীক্ষার জন্য পড়ান, তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় সাধারণ হিন্দুসমাজভুক্তই নহেন, হিন্দুসমাজের সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র।' অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উদ্যোগ যতই ঘটুক না কেন, সাধারণভাবে হিন্দুসমাজভুক্ত 'বঙ্গমহিলা'-রা তার সুফলভোগী হতে পারছিলেন না।

এর কারণস্বরূপ স্বর্ণকুমারী এই প্রবন্ধে যে যুক্তিটি দেখিয়েছেন তা যথার্থই অকাট্য এবং তাঁর গভীর সমাজচিন্তার ফল— 'সাধারণ বঙ্গ সমাজে বড় জোর ১০/১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত থাকে, পিতামাতা ইচ্ছা করিলেও সমাজভয়ে আর বেশিদিন কন্যাগণকে অবিবাহিত রাখিতে পারেন না।' মেয়েদের বাল্যবিবাহ ছিল তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের একটি জঘন্য কুপ্রথা এবং 'সমাজের এই সামাজিক নিয়ম'-এর বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছেন স্বর্ণকুমারী এই প্রবন্ধে। স্বর্ণকুমারী অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজের প্রতিটি মানুষ এই প্রথার বিরোধী অথচ স্পষ্টত বিরোধিতা করার সৎসাহস তাঁদের নেই এবং সেখানেই স্বর্ণকুমারীর নির্ভীক লেখনীমুখে ঝলসে ওঠে সেই কঠিন সত্য, যা আজকের যুগের প্রেক্ষাপটেও সমান প্রাসঙ্গিক '...সমাজভয়ে কেহই প্রায় ইহার বিরুদ্ধকার্য করিতে সাহস করেন না; তাঁহারা বুঝেন না, সমাজ বলিয়া স্বতন্ত্র একটা ভয়ঙ্কর জিনিস কিছুই নাই. তাঁহাদের প্রতিজনের সমষ্টিতেই সমাজ।' 'সমাজ' কথাটির এই আধুনিক ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন করি, আজ বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও আমরা কি 'সমাজভয়' থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পেরেছি? পারিনি এবং সেখানেই স্বর্ণকুমারীর সমাজবীক্ষা ছাপিয়ে গেছে তাঁর যুগকে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্বর্ণকুমারী বলেছেন যা আজও তার সত্যতা হারায়নি— 'বিবাহ হইয়া গেলে এখন বাঙ্গালী ঘরে রীতিমত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব।' বর্তমানে 'একেবারে অসম্ভব' না হলেও খুব সহজে যে সম্ভবও নয়, অন্তত স্বামীর সংসারে উপস্থিত থেকে নয়, একথা আজও কন্যা ও কন্যার পিতামাতা মাত্রেই জানেন ও বোঝেন।

এই প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী তৎকালীন নারীশিক্ষার একটি স্পষ্ট ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বেথুন স্কুলে যে কটি শ্রেণীতে হিন্দুবালিকা ছাত্রী পাওয়া গেল, সেই শ্রেণীগুলিতে কী কী ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হত তারও একটি তালিকা স্বর্ণকুমারী প্রবন্ধে সংযোজিত করেছেন এবং তারই প্রেক্ষিতে তাঁর সখেদ মন্তব্য, 'শিক্ষাপুস্তকের তালিকায় দেখা যাইতেছে ৮ম ক্লাশ হইতেই ইংরাজি আরম্ভ— আর ৪র্থ ক্লাশের মত উচ্চক্লাশেও উচ্চ বাঙলা শিক্ষার অভাব। এমন কি, এ ক্লাশে বাঙ্গলাতে সহজ বিজ্ঞান পুস্তকও একখানা পড়া হয় না।' বিজ্ঞানপাঠ মানুষের মনকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলতে সাহায্য করে; তাই পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞানপুস্তকের অনুপস্থিতি স্বর্ণকুমারীকে দুঃখিত করেছে। তা ছাড়া পাঠ্যতালিকায় বাংলা অপেক্ষা ইংরেজির উপর অধিক গুরুত্বারোপের ব্যাপারটিও স্বর্ণকুমারী সুনজরে দেখেননি। বিদ্যালয়ের মাত্র কয়েক বৎসরের সীমিত শিক্ষায় ইংরেজি পড়ার যে বাস্তবিক কোনও মূল্য নেই— 'ইহাতে একূল ওকূল দুকূল যায়'— সে কথা লেখিকা বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ— তাহার উদ্দেশ্য গর্ব করিয়া বলিতে পারা না যে, আমার মেয়ে দুখানা ইংরাজিও পড়িয়াছে।' ইংরেজির প্রতি অন্ধ মোহ ত্যাগ ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে স্বচ্ছ ও সাবলীল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন স্বর্ণকুমারী আলোচ্য প্রবন্ধে। বাংলা ভাষাকে যথেষ্ট শক্তিমান ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি এবং শুধু সাহিত্যেই নয়, বাংলা ভাষা যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানালোচনার পক্ষেও যথেষ্ট উপযোগী সে মতও তিনি ব্যক্ত করেছেন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে। আরও একটি কথা স্বর্ণকুমারী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'বাঙ্গলা আমাদের দেশের ভাষা, ইহাই আমাদের সর্বাগ্রে ভাল করিয়া শেখা উচিত। বাঙ্গলাটা ভাল করিয়া শিখিবার পর— যদি কেহ ইংরাজি শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহাও তখন তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে।' অর্থাৎ মানুষের

ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই হল ভিত। পাকা ভিতের উপর যেমন যে কোনও শৈলীর স্থাপত্যই সহজে গড়ে উঠতে পারে, তেমনি মাতৃভাষায় কারোর অধিকার যদি গভীর হয় তাহলে যে কোনও প্রকার ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌলিক ধারণাটি খুবই তাৎপর্যবহ।

প্রবন্ধের পরিশেষে স্বর্ণকুমারী রামায়ণ-মহাভারতকে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বেথুন স্কুল কমিটিকে। সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করে তিনি বলেছেন, 'আমাদের জাতীয় গর্ব, জাতীয় প্রবাদ, জাতীয় গৌরব যাহা কিছু আছে তাহা রামায়ণ-মহাভারতেই আছে— তাহা যদি আমাদের ভুলিয়া যাইতে হয় তবে আর আমাদের রহিবে কি?'

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে স্বর্ণকুমারী একটি মন্তব্য করেছিলেন, সেটি আজকের দিনে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিকায় গভীর বিশ্লেষণ ও তর্কের অপেক্ষা রাখে। স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন, '(স্ত্রীশিক্ষার) আড়ম্বর যতটা দেখিতেছি, অন্তঃসারতা ততটা কই? কেহ বলিবেন, স্ত্রীলোকে বি এ, এম এ পাশ করিতেছে তবু বলব শিক্ষার গভীরতা কই? ...বি এ, এম এ পাশ করা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত শিক্ষা কি না এবং ইহার গভীরতাই বা কতদূর ইহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে...এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব কথা থাক।' অর্থাৎ তৎকালীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত উচ্চশিক্ষাপ্রণালী স্বর্ণকুমারীকে তুষ্ট করতে পারেনি, অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হয়েছিল তাঁর। আমাদের প্রশ্ন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিকাতেও বি এ, এম এ ডিগ্রির গভীরতা কি যথার্থই অবিসংবাদিত? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাপাশের যন্ত্র হয়ে উঠছে দিন দিন, তাতে যথাযথ উচ্চমানের শিক্ষা কি সত্যিই সম্ভব হচ্ছে? যাই হোক, নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পে স্বর্ণকুমারী তৃণমূলস্তরে গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল' প্রবন্ধটি তারই স্মারক।

স্বর্ণকুমারীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'। ভারতী ও বালক পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়; প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৯৫। 'আজকাল ইয়োরোপে এক সমস্যা উঠিয়াছে, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ জাতি কি না?' — এই প্রশ্নের উপরই এই প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠা। 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে কয়েক বৎসর হইল ডিলনে নামক একজন ফরাসী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন'- - সেই পুস্তিকায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ ডিলনে কী কী ধরনের স্থূল হাস্যকর যুক্তি দেখিয়েছেন, স্বর্ণকুমারী কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধের সূত্রপাতেই শ্রেষ্ঠত্বলোভী পুরুষজাতির প্রতি তাঁর শাণিত আক্রমণ লক্ষণীয়, 'এতদিন এ সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন দ্বিধা ছিল না; বাইবেল কহিয়াছেন, 'ইব আদমের অংশ হইতে সৃষ্ট', সুতরাং স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতা এতদিন একটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। কিন্তু চিরকালই কালের বিচিত্র গতি। হঠাৎ আজকাল সেই ধ্রুব বিশ্বাসের উপর কালস্রোতের আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোক এখন পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্রয়াসী, স্কুল কলেজে তাহারা পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান উপাধি লইতেছে, তাহাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিনো, মিশেস ব্রাউনিং প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে পুরুষের সর্ববাদী সম্মত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আর বজায় থাকে না।'

এই প্রবন্ধে নারী ও পুরুষ যে সমক্ষমতাসম্পন্ন, এ কথা প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন স্বর্ণকুমারী। তিনি দেখিয়েছেন যে, 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় লেখক জে. রোমানিস উদ্ভাবনী শক্তিতে পুরুষকে যে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাও আসলে ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী একটি অভিনব যুক্তি উদ্ধার করেছেন। তাঁর মতে,

'যুগযুগান্তরব্যাপী পুরুষে, শিক্ষার ফল গুপ্তভাবে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান, আর স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত, অল্পস্বল্প স্ত্রীলোক....অর্ধশিক্ষা পাইলেও কাল পরম্পরায় অশিক্ষায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক হীনস্ফূর্ত। এরূপস্থলে উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না।' বস্তুত এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী প্রদর্শিত যুক্তিটির মূলে আছে বৈজ্ঞানিক সমর্থন যা মানতে সকলে বাধ্য। প্রবন্ধের উপসংহারে এই যুক্তির সূত্র ধরেই লেখিকাকে বলতে শুনি, 'পুরুষেরা আপাততঃ যে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, এমন কথা আমরা বলি না। যুগযুগান্তর ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ সম্বন্ধে নীচের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদিগকে সমান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে— সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহারা যে পুরুষ অপেক্ষা হীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিছুকাল ধরিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানলাভে সমান অধিকার দাও, বিদ্যাবুদ্ধির সমান চর্চা করিতে দাও, তখনো যদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অভাব দেখা যায়— তখন বুঝা যাইবে— তাহারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধি হিসাবে জাতিগত নিকৃষ্ট।' সেদিন স্বর্ণকুমারীর এই দাবি তাঁর একার ছিল না, ছিল সমগ্র নারী সমাজের পক্ষ থেকে সকল নারীর। শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার— উনিশ শতকীয় নারীর পক্ষ থেকে সেই অধিকারের এমন দৃপ্ত ঘোষণা বোধহয় সম্পাদক স্বর্ণকুমারীর কলমেই প্রথম।

এই প্রসঙ্গেই স্বর্ণকুমারীর আর একটি রচনার উল্লেখ করতে চাই। সেটি হল 'রমাবাই'। বোম্বাইয়ের শারদা-সদন মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা পণ্ডিতা রমাবাই জ্যৈষ্ঠ ১৯২৬-এ পুনায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আষাঢ় ১২৯৬ সংখ্যার ভারতী ও বালক-এ 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র' শিরোনামে একটি অস্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রে লেখক স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রমাবাইয়ের মতের সমালোচনা সূত্রে লিখেছিলেন, 'স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনও হয় নি। মনে করে দেখ, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সঙ্গীতবিদ্যা শিখচে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরচে কিন্তু তাদের মধ্যে কটা Mozart কিম্বা Beethoven জন্মাল? অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই Musician। ...আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (energy)। তাতে অনেক বল আবশ্যক। তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি আছে— কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই।' পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ ১২৯৬-এর ভারতী ও বালক-এ স্বর্ণকুমারী 'রমাবাই' শিরোনামে কিছু বক্তব্য পেশ করেন। স্বর্ণকুমারী উক্ত পত্রলেখকের উক্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, 'স্ত্রীলোকের একরকম গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তি নাই, এ কথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। ইয়োরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ কত অল্প দিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী-নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন? ...কাব্যেও যে রমণী তাঁহার সৃজনবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, তাহাও নহে। মিশেস হেমান্স, মিশেস ব্রাউনিং কোনও অংশেই বার্ণস অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি নহেন, তবে রমণীদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন সেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করে নাই, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তেমনি উপন্যাস-রাজ্যে কোন পুরুষ জর্জ এলিয়টকে এখনো অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং, ভবিষ্যতের কথা নহে— স্ত্রীলোক যে বুদ্ধিতে পুরুষের অসমকক্ষ, এখন আর এমনটা নিতান্ত জোর করিয়া বলা যায় না।' এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী স্বয়ং রমাবাইকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করেছেন এবং নারী যে যথার্থই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে সক্ষম তার প্রমাণ উপস্থিত করেছেন এইভাবে, 'স্ত্রীলোকে যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ..। এখানে রমণীহৃদয় ও পুরুষের কার্যক্ষমতা একত্র মিলিত হইয়াছে।'

স্বর্ণকুমারীর আরও একটি সামাজিক প্রবন্ধ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ বলব। সেটি হল 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা।' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের প্রকাশকাল ভাদ্র

১৩১৬। *যে বিশেষ সামাজিক ঘটনার পটভূমিকায় এই প্রবন্ধ লিখিত তা স্বর্ণকুমারীর কথা থেকেই উদ্ধার করা যেতে পারে,* 'বিধবার বিবাহ লইয়া আমাদের কায়স্থ সমাজে সম্প্রতি মহা আন্দোলন উপস্থিত। ...দুই তিন বৎসর পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গৃহে একটি বালবিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন কায়স্থ সমাজ এ-সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, — সমাজের মান্যগণ্য অনেকেই বরঞ্চ বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজ সেই ঘরেরই একটি কুমারী কন্যার বিবাহের সময় তাঁহাদের কর্তব্যজ্ঞান সহসা এমন সর্বনাশতৎপর উন্মত্তভাবে কেন যে জাগরিত হইয়া উঠিল— তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।' অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবাবিবাহ আইন পাশের (১৮৫৬) পরে অর্ধশতককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গোঁড়া হিন্দুসমাজের অপবুদ্ধি যে তখনও পুরোপুরি অপসৃত হয়নি, স্বর্ণকুমারীর কথা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। তাই বিংশ শতকে প্রবেশ করেও 'আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ বিধানে তাহার স্বার্থ-খড়্গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত।' এই প্রবন্ধে লেখিকা 'শিক্ষিতাভিমানী হিন্দুসমাজ'-কে তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তিবাণে জর্জরিত করেছেন এবং এমত পরিস্থিতিতে 'হিন্দু পত্রিকার বিধবাবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধটি' তাঁকে আশার আলো দেখিয়েছে— তাঁর ভাষায়, যেন ক্ষতস্থানে প্রলেপ সিঞ্চন। তাই 'এমন যুক্তিপূর্ণ অথচ নিরপেক্ষ প্রবন্ধ' থেকে দীর্ঘ অংশ স্বীয় প্রবন্ধ মধ্যে উদ্ধার করে স্বীয় বক্তব্যকে আরও বলিষ্ঠ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিপক্ষীয়গণের দ্বিতীয় অস্ত্র— 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে'—এহেন অযৌক্তিক মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী বলেছেন, 'কোন সমাজের সাময়িক অবস্থা ও সভ্যতা অনুসারে তদানীন্তন সমাজরক্ষার যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাহাই সমাজের সময়োচিত বিধি বা শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিতে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় কোনও সমাজ-বিধি বুঝায় না।' স্বর্ণকুমারী প্রদত্ত শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাটি আশ্চর্যরকম নতুন ও আধুনিক। আজও আমরা যখন তথাকথিত শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে কোনও সংস্কারের পক্ষে কথা বলি, তখন ভাবলে অবাক হতে হয় যে, আজ থেকে ঠিক নব্বই বছর আগে একজন মহিলা শাস্ত্রের এহেন যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে, শাস্ত্র অর্থে কোনও বিধিনিষেধের অনড় অচলায়তন নয় বরং সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত সামাজিক শৃঙ্খলারীতিই হল শাস্ত্র— অতএব শাস্ত্র পরিবর্তনশীল। নিজেদেরই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েও আমরা কজন শাস্ত্রের এই আধুনিকতম ব্যাখ্যা বুঝি ও মানি?

৪.

পরিশেষে স্বর্ণকুমারী রচিত দু'একটি ভ্রমণ বিষয়ক রচনার প্রসঙ্গ আলোচনাভুক্ত করতে চাই। ব্যক্তিগত জীবনে দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল ব্যাপক এবং যখনই যে স্থানে গেছেন তখনই নিছক নৈসর্গিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগই নয়, সেই স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক চরিত্রটিকেও বোঝার চেষ্টা করেছেন সাধ্যমত। সর্বক্ষেত্রে এই ঔৎসুক্যবোধ, কৌতূহল প্রকাশ ও সজীব মনই হল রেনেসাঁসের অবদান— স্বর্ণকুমারী হতে পেরেছিলেন তার প্রকৃষ্ট ধারক। এই প্রসঙ্গে 'গাজিপুর পত্র' (ভারতী ও বালক/জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৯৬), 'নীলগিরি' (ভারতী/পৌষ ১৩০২) ও 'কানহোজি আঙ্গ্রে' (ভারতী/বৈশাখ/১৩০৭) ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। এই রচনাগুলিতে লেখিকা দ্রষ্টব্য স্থানের প্রাকৃতিক বর্ণনা, ঐতিহাসিক পরিচয় যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনি রচনার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয়েছে কখনও নির্মল কৌতুক, কখনও মরমী কবিত্ব। গাজিপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর সখেদ মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'এই ত গাজিপুরের ইতিহাস! ইতিহাসের যাহা প্রধান বিষয় অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোক এবং তাহাদের অবস্থা, — তাহার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসেরই নাই। রাজা-

রাজড়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহারা উলুখড়ের দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইবারি কথা, সুতরাং, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা ইতিহাস-লেখকগণ বাহুল্য বিবেচনা করিয়াছেন।' ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা লিখিত এদেশের ইতিহাসগ্রন্থের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মতই স্বর্ণকুমারীও কিছুমাত্র শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, তা বোঝা যায়। প্রকৃত ইতিহাস বলতে তিনি কেবল রাজ-রাজড়াদের যুদ্ধ আর রাজ্যজয়ের বৃত্তান্ত বুঝতেন না, বুঝতেন কালপরম্পরায় দেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারার পরিবর্তনের আনুপুঙ্খিক বিবরণ। বস্তুত, ইতিহাসের এই ধারণাটিও নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে স্বর্ণকুমারী কখনও হয়ে উঠেছেন কবি আবার কখনও দার্শনিক। যেমন, 'এক একদিন সূর্যের আলো ডুবিতে না ডুবিতে চাঁদ উঠিত, সে জ্যোৎস্নালোকে, কোকিল পাপিয়া গীতকুহরিত, বাবলার স্নিগ্ধ গন্ধপূর্ণ বিজন ভ্রমণে হৃদয় যে সুখের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন অনুভব করিতাম সে সুখ স্মৃতি মর্মে মর্মে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। তখন মনে হইত না এ সময় যখন চলিয়া যাইবে, এ দৃশ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, এ সুখও তখন ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এমনি সুখের মোহ! এ মোহ যখন থাকে তখন প্রেমের ছলনাও সমস্ত বিশ্বসংসার অপেক্ষা নিত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন ছুটে তখন ইহার মত মিথ্যা আর নাই। তবে মানুষের জীবনই মোহময়, তাহার এক মোহ ভাঙ্গে কেবল অন্য মোহে পড়িবার জন্য।' (গাজিপুর পত্র) অথবা 'লোহিত আভাময় শ্যামল গাছপালার মধ্যে দিয়া হঠাৎ এক একবার যখন পশ্চিমের বিচিত্র বর্ণঘন লোহিত আকাশখণ্ড চোখে পড়িতে লাগিল, গঙ্গার উপর আকাশের লাল ছায়া যখন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া চলিতে লাগিল, আকাশের বর্ণ-সৌন্দর্য-স্নাত পিককুল কুহরিত শ্যামল দিগন্ত হইতে যখন প্রতিহত কিরণকণা আনন্দ হিল্লোলরূপে বিকিরিত হইতে লাগিল— তখন মনে হইতে লাগিল জ্যোৎস্নাদৃশ্যও এত মনোহর নহে। মানুষের জীবন এমনি বর্তমান মুহূর্তের উপর স্থিত।' (ঐ) কিংবা 'নূতনতার সংসারে, এত ব্যাখ্যা, কিন্তু নূতনে যতক্ষণ পুরাতন না মেলে, তাহার সহিত যতক্ষণ পরিচিত না হই, ততক্ষণ কি তাহার মধ্যে প্রকৃত সুখ মেলে?' (নীলগিরি) আবার কখনও বিশ্বজাগতিক গতিতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হয়ে ওঠেন তিনি, 'বস্তুত... মায়া আর কিছুই নহে, গতিই সংসারে মায়া। এই জন্যই এক মুহূর্তে যাহা আছে, অন্য মুহূর্তে তাহা নাই। ...আজ তোমার যা আছে, আজ তুমি যা আছ, কাল তাহা ঠিক থাকিবে কি না সন্দেহ... কেননা তোমার অস্তিত্বেও গতি বহিতেছে... এই গতিই সংসারে মায়া অথচ এই গতিতেই ইহার স্থিতি, অতএব, এই মায়াতেই সংসার সত্য... সুতরাং যাঁহারা মায়া ত্যাগ করিতে বলেন, তাঁহারাই নিতান্ত মায়াকথা বলেন।' (ঐ) এইভাবেই স্বর্ণকুমারী রচিত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি কেবল ভ্রমণকথাই নয়, হয়ে উঠেছে আরও অনেক বেশি কিছু। স্বর্ণকুমারীর ভ্রমণবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'নীলগিরির টোডা জাতি' (ভারতী, মাঘ/১৩০২)। এই প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী কিছুটা নৃতাত্ত্বিক, গবেষণাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে টোডা জাতির দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

স্বর্ণকুমারী রচিত প্রবন্ধসংখ্যা কম নয়। তারই মধ্য থেকে কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধের ভিত্তিতে এই আলোচনা। স্বর্ণকুমারীর চিন্তাজগতের পরিধি যেমন ছিল ব্যাপ্ত তেমনই তা ছিল বহুমুখী ভাবনায় সমৃদ্ধ। স্বাধীন চিন্তাশক্তি, বিবিধ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা, সমকালকে ছাপিয়ে যাওয়া যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষার উপর সহজ সাবলীল অধিকার স্বর্ণকুমারীর রচনাকে দান করেছে এক অভূতপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য, সপ্রতিভতা ও স্বাতন্ত্র্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস

সুদক্ষিণা ঘোষ

'নিউটন, গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেই বা জন্মাইবেন, কে জানে।'

—'মনের নিউটন'কে এভাবে খুঁজেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। 'কীসে যে হৃদয়ের কী হয় আর কী প্রাকৃতিক নিয়মে যে হৃদয় চলে, তা নির্ণয় করা খুব সহজ নয়'— এইরকমই লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী ১৮৮০ সালে, তাঁর 'মালতী' নামের বড় গল্পটিতে। আর সেইজন্যই তো 'মনের নিউটনে'র জন্য এত অন্বেষণ, এত অপেক্ষা। এই নতুন নিউটনকে স্বর্ণকুমারী খুঁজেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের, আজকের পাঠকদের কি মনে হয় না যে স্বর্ণকুমারী নিজেই ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন সেই মনের নিউটন? তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখি না কি সেই নতুন নিউটনেরই নিত্য যাওয়া-আসা? এ কথাও তো ভুলে যাওয়া চলে না যে, ১৮৭৬ সালে স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস রচনার মাত্র এগারো বছর আগে সূত্রপাত হয়েছে বাংলা ভাষায় সার্থক উপন্যাস রচনার— ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় পুরুষ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তখনও বাঙালি পাঠকের বহুদূরের স্বপ্ন।

সামাজিক নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে সাহিত্যিক-জীবন শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী আর প্রথম উপন্যাসে চমকেই দিয়েছিলেন বাংলার পাঠকসমাজকে, অনুরাগী আত্মীয়-বন্ধুদেরও। 'দীপনির্বাণ' নামের সে উপন্যাসটি পড়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভেবেছিলেন, এ রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের না হয়েই যায় না (প্রথম প্রকাশের সময় 'দীপনির্বাণে'র লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি), তাই অন্তঃপুরচারিণী বোনের বদলে সত্যেন্দ্রনাথ অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?'

'দীপনির্বাণ' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসটির এই জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের পর স্বর্ণকুমারী রচনা করলেন 'বসন্ত উৎসব' নামে এক গীতিনাটিকা, আর তারপরে, ১৮৭৯ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস— আর ঐতিহাসিক নয়, এবার সামাজিক উপন্যাস— 'ছিন্নমুকুল'।

সাহিত্যিক উন্মেষের এই প্রথম পর্বে বিষয়ের এই বিচিত্রতা দেখে মনে হয়, স্বর্ণকুমারীর মনের মধ্যেও যেন ঘটে গেছে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ— সাহিত্যের যে-কোনও আধারকে কেন্দ্র করে শুধু আত্মপ্রকাশের উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনী।

১৮৭৯ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ— দীর্ঘ এই সময়সীমায় স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসের সংখ্যা ছয়— 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯)-এর পরবর্তী উপন্যাসগুলি ছিল 'স্নেহলতা বা পালিতা'— প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২ এবং ১৮৯৩), 'কাহাকে' (১৮৯৮) এবং ত্রয়ী-উপন্যাস— 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)। আর এর পাশাপাশি ঐতিহাসিক উপন্যাস-নাটক-কবিতা-গান-প্রবন্ধ তো জীবনভরই লিখেছেন স্বর্ণকুমারী।

'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসটি নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে উৎসর্গ-কবিতায় স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন : 'একবিন্দু অশ্রুবারি/মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।'

কনক এ উপন্যাসের নায়িকা— ছোট্টবেলা থেকে প্রাণভরে সে দাদাকে ভালোবেসে এসেছে; শৈশবে যেমন দুরন্ত দাদার অজস্র উৎপীড়ন সহ্য করেছে, তেমনি দাদার অপরাধে নিজে দোষী সাব্যস্ত হলেও নীরবে সমস্ত অপবাদ মেনে নিয়েছে সে— কোনওদিন আঁচড় লাগতে দেয়নি দাদার গায়ে। আর তার এত ভালবাসার দাদা প্রমোদ আজীবনই রয়ে গেছে এক আদুরে দুরন্ত শিশু, যৌবনেও তাঁর এ স্বভাবের যেন কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। এ উপন্যাসের আর দুই পুরুষ-চরিত্র— কনকের প্রেমিক হিরণকুমার আর প্রমোদের বন্ধু যামিনীনাথ— সাদা-কালোয় আঁকা চরিত্র। প্রমোদ ভুল বুঝে হিরণকুমারের শুভ্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে, সে কলঙ্ক মুছেও গেছে কিন্তু ততদিনে কনক হারিয়ে গেছে তাদের দুজনেরই জীবন থেকে আর ভণ্ড যামিনীনাথ বিষয়ে প্রমোদ চিরদিনই মোহান্ধ থেকে গেলেও, যামিনীনাথ শেষ অবধি তার কৃতকর্মের ফল পেয়েছে।

এই আখ্যানের বর্ণনায় বা পুরুষ চরিত্র চিত্রণে এমন কিছুই অসাধারণত্বের উপাদান নেই, এই উপন্যাসের যা কিছু সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্য— তা আছে এর নারীচরিত্রেই। নায়িকা কনক সর্বংসহা হলেও ব্যক্তিত্বহীনা নয়— ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার কর্তব্যে সে আত্মসুখ ত্যাগ করেছে, কিন্তু আত্মবলি দেয়নি। প্রমোদের তীব্র অনিচ্ছার মূল্য দিতে সে হিরণকুমারকে বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেছে কিন্তু প্রমোদের তীব্র ইচ্ছার কাছে হার মেনে যামিনীনাথকে বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। কনক বাঁচতে পারেনি— এতটুকু জীবনে এত অবিচারের, এত দুঃখের বোঝা বইতে বইতে ফুরিয়ে গেছে তার জীবনের সম্বল, ফুল না ফুটতেই ঝরে গেছে 'দলিত কলি'। স্বর্ণকুমারীর মনের অতলে কোথাও ছিল এমন একটি কোমল, লাবণ্যময়ী, সর্বংসহা, শান্তশ্রী প্রতিমা— স্বর্ণকুমারীর গল্পে-উপন্যাসে বহুবারই তার দেখা মেলে। এই সহিষ্ণু মেয়েরা কখনও মুখ ফুটে নিজেদের কথা বলে না, নীরবে সহ্য করে সমস্ত অবিচার— প্রতিকূল ভাগ্যের বা বিরূপ প্রিয়জনের অসন্তোষের আঘাত বহন করাই যেন তাদের নিয়তি।

কনকের অপরিমেয় ভ্রাতৃপ্রেমের তুলনাও তো ছড়িয়ে আছে স্বর্ণকুমারীর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসে। ভাই-বোনের এই স্নেহসম্পর্ক যেমন উজ্জ্বল 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে, তেমনি গভীর পরের গল্প 'মালতী'-তে রমেশ আর মালতীর সুসম্পর্কের মধ্যে বা 'মিবাররাজ'-এর গুহা ও সত্যবতীর ভালবাসার মধ্যে, কিংবা আরও অনেকদিন পরের 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসের মহম্মদ মসীন আর মুন্নার ভালবাসাতেও সে সম্পর্ক সমান অমলিন। মনে না পড়ে পারে না, ১৯২১ সালে ছোট বোন পঁয়ষট্টি বছরের স্বর্ণকুমারী কী ব্যাকুল মমতায় তাঁর দুই অশীতিবর্ষীয় দাদা সত্যেন্দ্রনাথ আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন মোরাবাদিতে, পাঠিয়েছিলেন উপহার, আর জানিয়েছিলেন : 'বড় যেতে ইচ্ছে করে তোমাদের কাছে'... দাদা-বোনের পারস্পরিক ভালবাসায় স্নাত সম্পর্কের ছবিগুলি বোধহয় নিজের জীবন থেকেই উপন্যাসের পাতায় তুলে এনেছিলেন স্বর্ণকুমারী।

'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে কনকের বিপরীতে আছে দ্বিতীয় প্রধান নারীচরিত্র নীরজা। এই চরিত্রটি ঘিরে একটি প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে— স্বর্ণকুমারী কি ইচ্ছে করেই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার বিপরীতে একটি নারীপ্রতিমা নির্মাণ করলেন এ উপন্যাসে? নীরজাও সন্ন্যাসী পিতার কাছে আজন্ম পালিত, বনই তার বাসভূমি, বনেই সে স্বচ্ছন্দচারিণী। পরবর্তীকালে— প্রমোদের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে মাঝে মাঝে বনে যাবাব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে নীরজা কিন্তু আমরা দেখি, প্রমোদের প্রেমে সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে দিয়েছে আর সেই নিমগ্নতাতেই সুখী হয়েছে সে। নীরজার মনে কপালকুণ্ডলার মত এ প্রশ্ন জাগে না যে, ফুলের সৌন্দর্য যে মানুষকে মুগ্ধ করে, সেই মুগ্ধতায় দর্শকের তৃপ্তি, ফুলের নিজের তৃপ্তি কীসে?

প্রমোদের বুকে ফুল হয়ে ফুটে উঠে, প্রমোদের প্রেমে লীন হয়ে গিয়ে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে নীরজা— কুলবধূর জীবনে কোনও অতৃপ্তি জাগায়নি স্বাধীন অরণ্যজীবনের স্মৃতি।

এইবার পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে কোন্‌টা স্বাভাবিক? বারো বছর আগে লেখা কপালকুণ্ডলার চরিত্র? নাকি, নীরজার চরিত্র? নবকুমারের প্রেমেও তো শৈথিল্য ছিল না, তবু পদ্মাবতীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কপালকুণ্ডলা হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে কোথাও খুঁজে পায়নি নবকুমারকে— দীর্ঘ, নিবিড়, সপ্রেম সান্নিধ্যেও প্রেমের মুকুল উন্মীলিত হয়নি মৃন্ময়ীতে রূপান্তরিতা কপালকুণ্ডলার। আর, এ উপাখ্যানে অল্প দু'চারটি কথায় স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন নীরজা চরিত্রের বিবর্তন— সে কুলবধূ হবার শিক্ষা নিয়েছে, সাজতে শিখেছে, বাঁধন মেনেছে, পূর্বসংস্কার ভুলেছে। এ কথাই কি তবে বলতে চান স্বর্ণকুমারী যে সংসারের তৃষ্ণা, স্বামীপ্রেমের তৃষ্ণাই নারীমনের স্বাভাবিক তৃষ্ণা? এবার পাঠক বিচার করুন, কোন্ নিউটনের বিচারকে অভ্রান্ত বলব আমরা— বঙ্কিমচন্দ্রের, না, স্বর্ণকুমারীর?

১৮৯২ আর ৯৩ সালে দু'ভাগে প্রকাশিত হল স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস 'স্নেহলতা বা পালিতা।' পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'স্নেহলতা' 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘদিন— ১২৯৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৯৮-এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। সে সময়ে ভারতী ও বালক পত্রিকার সম্পাদিকার দায়িত্বও ছিল স্বর্ণকুমারীর। উপন্যাসটির যুগ্মনাম গ্রহণের কারণ সম্ভবত ১৮৯০ সালে প্রকাশিত কুসুমকুমারী দেবী রচিত 'স্নেহলতা' উপন্যাস— নামসাদৃশ্যের বিভ্রান্তি এড়াতেই বোধহয় স্বর্ণকুমারী স্নেহলতার নামকরণে পালিতা-কেও যুক্ত করেছিলেন।

জগৎবাবুর সংসারে পালিতাই ছিল স্নেহলতা। প্রবলা গৃহিণী, ছেলে চারু ও মেয়ে টগরকে নিয়ে ছিল ভালমানুষ জগৎবাবুর সংসার। মূলত জগৎবাবুর সংসারকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের ঘটনাস্রোত আবর্তিত হয়েছে, তবে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে সমকালীন গোটা সমাজের ছবি। উপন্যাস-রচনার আঠার বছর পরে উপন্যাসের উপসংহারে স্বর্ণকুমারী নিজেই এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন : 'অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্যকলাপ শত স্রোতে প্রবাহিত— তাহারই পূর্বতন চিত্র, তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে।'

বাংলার সমাজজীবনে এই তো এক সময় – যখন পুরনো সংস্কার, পুরনো প্রথা, পুরনো রীতি-নীতি-আচার-নিয়মকে নতুনভাবে যাচাই করে নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে বাংলার শিক্ষিত মন। আর, জেগে উঠেছে স্বদেশ ভাবনার এক নতুন আবেগ, পরের শতাব্দীতে যে স্বদেশমন্ত্রে উত্তাল হয়ে উঠবে হাজার হাজার বাঙালি তরুণ, এই শতাব্দীর শেষ প্রহরে শুরু হয়েছে তারই জাগরণী।

'স্নেহলতা' উপন্যাসের দুই ভাগে ধরা আছে এই দুই সচেতনতার স্বাক্ষর। স্নেহলতার প্রথম ভাগে তরুণ ছাত্রের দল যেমন আলাপ-আলোচনা করেছে বাল্যবিবাহের সুফল-কুফল নিয়ে, তেমনি পরিচয় মিলেছে স্বদেশীদের এক গুপ্তসভার। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও ধরা আছে স্বর্ণকুমারীর গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় কিন্তু 'স্নেহলতা'-র প্রথম ভাগে বর্ণিত স্বদেশী কার্যকলাপের একটি বিশিষ্টতা আছে— স্বদেশী আলোড়নের সেই প্রথম প্রহরে ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব উদ্যোগের একটা ছবি আঁকা হয়েছে এ উপন্যাসে। প্রথম ভাগের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে একটি গুপ্তসভার পরিচয় আছে, যেখানে গুপ্ত বিপ্লবীরা গায় স্বদেশী গান : 'একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন/জীবনে মরণে রবে শপথ বন্ধন।' এ সভার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচুপামুহাফ'-এর সাদৃশ্য সহজেই খুঁজে নেওয়া যায়, স্বদেশী গানটি থেকে চিনে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানটিও।

'স্নেহলতা'র দ্বিতীয় ভাগে সমাজ সচেতনতার চিহ্ন স্পষ্টতর হয়েছে। সামাজিক নানা সমস্যার মধ্যে এ পর্বে গুরুত্ব পেয়েছে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ। কৈশোরেই বৈধব্য এসেছিল স্নেহলতার জীবনে, তরুণ বয়সেই চারুও হারিয়েছিল তার প্রথম পত্নী বালিকা অমরাবতীকে। বিপত্নীক চারু আর বিধবা স্নেহলতাকে কেন্দ্র করে সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল বিধবাবিবাহের সম্ভাবনা। উন্মাদ আবেগে চারু একসময় মনে করেছিল স্নেহলতাকেই সে চায়, আর তার এই প্রমত্ত চাওয়ার সামনে অসহায় স্নেহলতা হারিয়েছিল একের পর এক তার আশ্রয়। বিপত্নীক পুরুষের জন্য তো সামাজিক সুখের কোনও পথই রুদ্ধ নয়, তাই চপলচিত্ত চারু আবার একদিন স্নেহলতাকে ভুলে সহজেই দ্বিতীয় বিবাহে দ্বিতীয় বালিকাবধূকে ঘিরে তার নতুন স্বপ্নলোক রচনা করে নিয়েছে আর আশৈশব 'পালিতা' স্নেহলতা চারুর মায়ের রোষে আজন্মের আশ্রয় ছেড়ে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিরূপ শ্বশুরবাড়িতে, সেখান থেকে নিরাশ্রয় হয়ে আবারও এসেছে টগরের বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যায় সমাপ্ত হয়েছে তার ছোট্ট জীবন।

'বিবাহ'— এই ছোট্ট শব্দটা মেয়েদের কাছে তো শুধু একটা সুঠাম জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিই নয়, এই ছোট্ট শব্দটার ওপরেই নির্ভর করে তাদের জীবনের শুভাশুভ, এমনকী তাদের বাঁচা-মরা— স্নেহলতার অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত জীবন তারই প্রমাণ। জীবন বা জগৎবাবুও সমানধর্মা স্ত্রী পাননি, অল্প বয়সেই বিপত্নীক হয়েছিল চারুও— এসব ঘটনায় সাময়িকভাবে বিড়ম্বিত হয়েছে তাদের জীবন কিন্তু বিপর্যস্ত হয়নি জীবনের ছন্দ, বিনষ্ট হয়ে যায়নি স্নেহলতার মত। অকালবৈধব্য বা চারুর সাময়িক উন্মাদনায়— কোনও ভূমিকা ছিল না স্নেহলতার কিন্তু নিরাপত্তা, সম্মান, শেষ পর্যন্ত জীবনের বিনিময়ে দাম দিতে হল একমাত্র তাকেই। এই স্নেহলতার জীবনই অন্যভাবে লেখা হতে পারত, তার ধীময়ী শ্রীময়ী স্বভাবের সব কটি অঙ্কুর একদিন মুকুলিত হয়ে উঠতে পারত— যদি তার স্বামী মোহন দীর্ঘজীবী হত, বা যদি বিবাহ বিষয়ে সাময়িক অনাসক্তি ভুলে প্রথমে জীবনই তাকে বিবাহ করত, কিংবা যদি চারু দৃঢ়মনা প্রেমিক পুরুষ হত...এই এতগুলি 'যদি'-র ভিড়ে কিন্তু একটা কারণও নেই, যা স্নেহলতা নিজের শক্তিতে অর্জন করে নিতে পারত; স্নেহলতার বাঁচা বাধ্যতামূলকভাবে নির্ভর করেছে কোনও না কোনও পুরুষের অনুকূলতার ওপরেই।

স্নেহলতা তার বঞ্চিত জীবনে কেবল জগৎবাবু আর তার দেবর জীবনের কাছ থেকেই ভালবাসা আর মর্যাদা পেয়েছিল। প্রগতিবাদী এই দুটি মানুষের আলাপেই সামাজিক নানা সমস্যার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। নারী-সমস্যা বিষয়ক আলোচনাগুলিতে বারেবারেই উঁকি দিয়ে গেছে স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজের মতামত। উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে জগৎবাবুর সঙ্গে কথোপকথনে ইংল্যান্ডের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেশের অসহায় মেয়েদের ভাগ্যের তুলনা করে নারীদরদী জীবন যেমন বলছে, 'সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত নিতান্তই কৃপার পাত্র হইয়া জন্মায় না; বাপের ধনে ছেলেদের মত তাদেরও অধিকার আছে।...আর যারা নেহাত সঙ্গতিহীন তারাও শিক্ষার গুণে নিজ জীবিকা উপার্জনে সক্ষম।' [পৃঃ ৫২, স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, ৪]

জীবন আর জগৎবাবুর এই কথোপকথনে স্বর্ণকুমারী দেবী সবাসরিই উল্লেখ করেছিলেন সখিসমিতি-র নাম, জানিয়েছিলেন এ বিষয়ে সমাজ সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের কথা। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় আর বিধবাদের স্বনির্ভর জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'সখিসমিতি' গড়েছিলেন স্বর্ণকুমারী— ঠাকুরবাড়ির মত মর্যাদাবান পরিবারের কন্যা হয়েও নিশ্চয়ই বাধা এবং বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন তাঁকেও হতে হয়েছিল, তাই তাঁর মনের ক্ষোভই প্রকাশ পেয়েছে জীবনের কথায় : 'সত্যিই ত। মেয়েরা ঘরে বসে ঝগড়া করবে, পরনিন্দা করবে, তবেই তাদের কোমল হৃদয়ের মাধুর্য রক্ষা হবে, তা না তারা কি না

'সখিসমিতি' করে পরের জন্য, অনাথার জন্য, বিধবার জন্য কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়ে নারী-স্বভাববিরুদ্ধ পৌরুষিক কঠোরতায় সহৃদয়ের হৃদয় ভগ্ন করে।' [পৃঃ ৫৩-৫৪, গ্রন্থাবলী, ৪]

মহারাষ্ট্রীয় বিদুষী পণ্ডিতা রমাবাইয়ের বিধবাশ্রমের আদর্শে একটি বিধবাশ্রম গড়ার স্বপ্নও ছিল সখিসমিতি-র, দেশবাসীর কাছে উপযুক্ত সহায়তার অভাবে ক্ষুব্ধ স্বর্ণকুমারী জীবনের জবানিতেই বলেছেন, 'জানেন মশাই, পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম খুলেছেন, তাঁকে সাহায্য করছে আমেরিকাবাসীরা। তবু আমরা বলি, আমাদের দেশের মত সহৃদয়তা অন্য দেশে নেই!' [পৃঃ ৫৪, গ্রন্থাবলী, ৪]

বিধবাবিবাহ করার আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কুমারী কন্যাকে বিবাহ করেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল চারু, সুবিধাবাদী এই পুরুষসমাজকে ব্যঙ্গ করে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন : 'সে (চারু) এখন ঘোরতর আর্য। ... হিন্দুয়ানির পক্ষে লিখিয়া দেশের হিতসাধনে তাহার বিরাম নাই। তাহার সমস্ত প্রবন্ধেরই প্রধান মর্ম এই, বিধবাবিবাহের মত অনার্য গর্হিত কার্য আর নাই, ইহার পক্ষে যাহার মুখ হইতে একটি বাক্য নির্গত হয় তাহাকে সমাজচ্যুত করা উচিত।' [পৃঃ ৫৫, গ্রন্থাবলী, ৪] তবে, তার এই জ্বালাময়ী প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই যে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে ফেরত আসে— এ খবরও দিতে ভোলেননি স্বর্ণকুমারী!

চারু ও স্নেহলতার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং দ্বিধাদীর্ণতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যেমন ঔপন্যাসিক কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী এ উপন্যাসে, তেমনই দক্ষতার চিহ্ন আছে তাঁর অন্তঃপুরচিত্র বর্ণনায়। অলস সুখী গৃহবধূদের দ্বিপ্রাহরিক আলাপ ও তাসখেলা, ঘটকীর আগমনে তাদের তৎপরতা কিংবা টগর, স্নেহলতার বিবাহে স্ত্রী-আচারের বর্ণনায় ধরা আছে স্বর্ণকুমারীর এই নিপুণতা।

স্বর্ণকুমারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেই চিহ্নিত এই 'স্নেহলতা' স্বর্ণকুমারী উৎসর্গ করেছিলেন প্রিয়বান্ধবী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে।

স্বর্ণকুমারীর রচনা-সামর্থ্য নতুন আধার খুঁজে নিয়েছিল 'স্নেহলতা'-র কয়েক বছর পরে লেখা 'কাহাকে?' উপন্যাসে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর এই উপন্যাস। নায়িকার ভালবাসার সঙ্কটই মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত সমাজের এই রোমান্সের একমাত্র উপজীব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'-র মত এ উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী বা মণিও উত্তমপুরুষে শুনিয়েছে তার ভালবাসার কাহিনী। দ্বিধায় জড়িত ভালবাসা মণির— উপন্যাস জুড়ে সে কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছে সে 'কাহাকে' ভালবাসে। ছোটবেলায় প্রাণভরে সে ভালবাসত বাবাকে, রোজ সকালে বাবার হাতে ফুল না দিলে মন ভরত না তার। মনে পড়ে যায় বালিকা স্বর্ণকুমারীকে, ভোর না হতেই বাগানে গিয়ে যে সমস্ত ভাল ফুলে ভরে তুলত আঁচল আর প্রাত্যহিক উপাসনা শেষ হলেই সেই ফুল নিয়ে ছুটে যেত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তেতলার ঘরে। উপন্যাসে দেখি, ঐ শৈশবেই মণি ভালবাসত তার শৈশবসঙ্গী ছোটুকেও, তার ভালবাসায় সুর সংযোজন করেছিল ছোটুর মুখে শোনা একটি গান : 'হায় মিলন হলো/যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।' এই গানের টানে সম্মোহিত হয়ে যেত মণি, গানেরই টানে সে বিলেতফেরত রমানাথের বাগ্‌দত্তা হয়েছিল, অবশ্য বাগ্‌দত্ত প্রণয়ীর অন্য নারী-আসক্তির পরিচয় পেয়ে ভেঙেও দিয়েছিল বাগ্‌দানের সম্বন্ধ। মণির জীবনে সঙ্কট এল পিতার নির্বাচিত পাত্র ডাক্তার বিনয়কুমারের সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাবে, মণির মনে যে তখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ছোটুর শৈশবস্মৃতি— সেই গান, সেই সুর। অবশেষে গানের সুরেই কাটল মণির জীবনের সঙ্কট, ডাক্তার বিনয়কুমারের গানেই চেনা গেল— দূর অতীতে সে-ই ছিল মণির বাল্যবন্ধু ছোটু। ছোটুতে আর বিনয়কুমারে মিশে গিয়ে সমাপ্ত হল মণির অন্বেষণ— উত্তর মিলল 'কাহাকে' ভালবাসে— জীবনজোড়া এ জিজ্ঞাসার।

মণির এতদিনের পথ খোঁজা সারা হলে সে বলেছিল, 'কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি? পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি?' [পৃঃ ৪৫, স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, ৫] পূর্বরাগের এক নিটোল কাহিনী রূপ নিয়েছে এ উপন্যাসে— প্রেম শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণতা পেয়েছে পরিণয়ে।

'কাহাকে?' উপন্যাস রচনাকালে শুরু হয়নি বিংশ শতাব্দী, কিন্তু ভালবাসায়, দাম্পত্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি অস্ফুটে যেন শোনা যায় বাংলার নারী-ঔপন্যাসিকদের এই প্রথমার কলমেই। মণি তার বাগ্‌দানের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে জানিয়েছিল তার প্রণয়ী হওয়ার যোগ্যতা, তার স্বামী হওয়ার শর্ত— 'যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী, স্বামী হইবার যোগ্য নহে; ...সংসার যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমায় স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব।' [পৃঃ ১৫, গ্রন্থাবলী, ৫] হ্যাঁ, স্বামীকে দেবতা ভাবতেই চাইছে বটে মণি, কিন্তু তবু কি সমাজ খুব নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারবে এই মেয়েকে নিয়ে? নির্বিচারে আত্মসমর্পণের দীক্ষা তো হয়নি তার, শাণিত বুদ্ধির আলোয় সে তো বিচার করে নিতে চাইছে ভাবী স্বামীর চরিত্র!

আরও একটা দাবি করেছে মণি, এই প্রসঙ্গেই বলেছে, 'এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমন. আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।' [পৃঃ ১৫, গ্রন্থাবলী, ৫] সেদিনের মেয়েদের জীবনে এ-চাওয়া খুব সহজ ছিল না নিশ্চয়ই, তাই প্রথমেই মণিকে ঘোষণা করতে হয়েছে : 'এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়'। কিন্তু পুরুষের অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা বা অনাদি অনন্ত নিষ্ঠা নিয়ে কবেই বা বিচলিত হয়েছে সমাজ? মণি কিন্তু বিনম্র অধিকার ভিক্ষা করেনি, সচেতন মনে দাবি জানিয়েছে। আর সেজন্যই, ইচ্ছাপূরণের মেজাজে সমাপ্ত হলেও আধুনিকতার রং লেগেছে এ উপন্যাসে।

দেশি ও বিদেশি সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর বহুপঠনের ছাপ ছড়িয়ে আছে এ উপন্যাসের সর্বাঙ্গে। বিভিন্ন সামাজিক মেলামেশায় শিক্ষিত নারী ও পুরুষেরা সাহিত্যিক নানা প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্কে-আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠেছে বহুবার। জর্জ এলিয়ট স্বর্ণকুমারীর অন্যতম প্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাও স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসের পাতায়, পুরুষেরই উক্তিতে। নায়ক বিনয়কুমারকে দিয়েই জর্জ এলিয়ট প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী বলিয়েছেন :

'Does not your man's nature take delight in glorifying such genius in a woman? What a grand intellect she had combined with the sympathetic heart and subject instinct of true woman?' [পৃঃ ২৮, গ্রন্থাবলী, ৫]

মনে পড়ে যায়, রমাবাই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর তর্ক— 'স্ত্রীলোকের একরকম গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তি নাই, এ কথা লেখক কীরূপে স্থির করিলেন তাহা তো বুঝিতে পারি না। ইয়োরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ কত অল্পদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ, উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনীনির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন?' [শ্রাবণ, ১২৯৬, ভারতী ও বালক] — স্বর্ণকুমারীর নিজের লেখাই তো তাঁর এ বক্তব্যের যৌক্তিকতার প্রমাণ; এদেশেও তো স্ত্রীশিক্ষার সূচনা বেশিদিন হয়নি, তবু স্বর্ণকুমারীর লেখনী থেকে আমরা পেয়েছি 'কত উৎকৃষ্ট উপন্যাস'!

'কাহাকে?' প্রকাশের দীর্ঘ বাইশ বছর পরে আবার উপন্যাস রচনায় মনোযোগী হলেন স্বর্ণকুমারী। 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), আর 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)— পরপর প্রকাশিত এই তিনটি উপন্যাস আসলে একই ভাবাদর্শে গ্রথিত ত্রয়ী উপন্যাস, একই চরিত্রদের জীবনযাপনের পরিণতি যেখানে তিনটি উপন্যাস জুড়ে রূপায়িত হয়েছে। এই ত্রয়ী উপন্যাসের উৎসর্গপত্রটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক :

'তোমারেই দিতে হবে? তাই লও বেশ!
দেখো যেন না পড়েই করিও না শেষ!
অত কেন হাসি রাণি? বলো দেখি মনোবাণী
কার ছবিখানি এত দেখিছ সরেশ?'

বাইশ বছর পরে কার আদলে ছবি আঁকতে ইচ্ছা হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর? উৎসর্গপত্রে কোনও ইঙ্গিত নেই, কিন্তু ত্রয়ী-উপন্যাসের সর্বত্রই কি ছড়িয়ে নেই অজস্র ইঙ্গিত?

ত্রয়ী-উপন্যাস রচনার সময়ে পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন স্বর্ণকুমারী, প্রথমটি রচনার সময় তাঁর বয়স চৌষট্টি। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে এই ত্রয়ী-উপন্যাসে তিনি বেছে নিলেন সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাংলার রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ জমেছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে (১৯০৫), পুঞ্জীভূত সেই বিক্ষোভ ক্রমে ক্রমে বয়কট আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনের নানা ভঙ্গিতে রূপ নিচ্ছিল, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলের হিংসাত্মক রাজনীতিও অগ্রসর হচ্ছিল সমান্তরাল রেখায়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে ভাঙন ধরেছিল কংগ্রেসের সংগঠনে— স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মতাদর্শগত বিরোধ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে ভারতী পত্রিকায়— ১৩১৫ সাল (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে দ্বিতীয়বার ভারতী-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। লর্ড কার্জনের নানা দুর্নীতি-সম্বলিত একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকার ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়— লেখকের নাম না থাকলেও 'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা ১৮৯৯—১৯০৮' শীর্ষক নিবন্ধটিতে সম্পাদিকার মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল। তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ, দিল্লি দরবার, ইউনিভার্সিটি আইনে উচ্চশিক্ষার মূল্যবৃদ্ধি, সর্বোপরি বঙ্গবাসীর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও বঙ্গবিভাগ— কার্জনের শাসনকালে প্রতিটি অবিচার ও দুর্নীতি নিয়ে মুখর ছিল লেখাটি, লেখা হয়েছিল বন্দে মাতরম্ নামে মহামন্ত্রের উচ্চারণের শক্তির কথা— 'লর্ড কার্জন তাঁহার দুর্নীতিতে ভারতে একতামন্ত্র জাগাইয়া দিলেন।'

কিন্তু সমবেত রাজনৈতিক উন্মাদনা থেকে এক জায়গায় স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। স্বদেশী আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটিতে যেমন আলোকপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'ঘরে বাইরে'-র সন্দীপের রাজনীতিতে যার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল, কিংবা, তারও আগে ১৩১৫ সালে স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় 'পথ ও পাথেয়' এবং 'সদুপায়' নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি রাজনৈতিক প্রবন্ধে যেমন ধরা পড়েছিল তাঁর মতামত— রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্বদেশবাসীর আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার ওপর, দেশের মানুষকে সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন বয়কট আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে। স্বর্ণকুমারী দেবীও মেনে নিতে পারেননি যে, অল্পবিত্ত দোকানদারদের বিদেশি পণ্য নষ্ট করার মধ্যে আমাদের জাতীয় উন্নতি নিহিত থাকতে পারে। ১৩১৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতী-তে 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন— এ আন্দোলনে সফলতার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, ধ্বংসের উন্মাদনার চেয়ে কঠিন কাজ গড়ে তোলার সাধনা— সেই কাজই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ স্বর্ণকুমারীর সমর্থন পায়নি, তাঁর মতে 'হত্যাকার্যই অমঙ্গলজনক', আর এই অমঙ্গলময় গুপ্তহত্যা দেশের মঙ্গল বহন করে আনবে— এ কথা বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি।

স্বর্ণকুমারীর দীর্ঘসঞ্চিত রাজনৈতিক বিশ্বাসগুলি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই রাজনীতি-সচেতন ত্রয়ী-উপন্যাসে। একটি অগ্নিসম্ভবা চরিত্র তো গড়ে উঠেছিল তাঁরই ঘরের কোণে। তাঁরই কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী যেমন ভারতের মেয়েদের জন্য গড়েছিলেন 'ভারত স্ত্রী-

মহামণ্ডল', তেমনি বীরত্বের ব্রতে মাতিয়ে তুলেছিলেন দেশের যৌবনকে। প্রতাপাদিত্য-উৎসবের প্রবর্তনে বাংলার জাতীয় বীর খুঁজেছিলেন সরলা, বীরাষ্টমী ব্রত উদ্বোধনে— ব্যায়াম চর্চায়, লাঠি খেলায়, মুষ্টিযুদ্ধ বা তরোয়াল খেলায় মননসর্বস্ব বাঙালি যুবককে শারীরশক্তির স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন তিনি আর সত্যিই সাড়া জাগিয়েছিলেন বাংলার যুবক সমাজে।

বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি জুড়েও রয়েছে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশভাবনারই জ্যোতির্ময় প্রকাশ। সেই সঙ্গে আছেন জ্যোতির্ময়ীর পিতা রাজা অতুলেশ্বর— গভীর তাঁর স্বাজাত্যাভিমান, প্রখর তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞান। জ্যোতির্ময়ীর প্রণয়ী ডাক্তার শরৎকুমার বা তার বান্ধবী হাসি, হাসির পিতা কৃষ্ণলাল— এ চরিত্রগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে উপন্যাসের উপাখ্যানে। স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকগুলি চরিত্রের আদল মিশে আছে এরকম অনেক চরিত্রে— ব্যায়ামচর্চায়, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনে নিবেদিতপ্রাণ, স্বদেশব্রতী রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে কি খুঁজে পাওয়া যায় না অক্লান্তকর্মী কন্যা সরলাকে? কিংবা হাসির পিতা অন্যমনস্ক, পাঠমগ্ন কৃষ্ণলালের চরিত্রে স্বর্ণকুমারীর বড়দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে?

'বিচিত্রা' উপন্যাসে দেখি, বালিকা জ্যোতির্ময়ী ছোটবেলা থেকেই দেশের সত্যিকার অবস্থা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে, গৃহশিক্ষক পণ্ডিত দেবব্রত ভট্টাচার্যের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত সে শোনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা খবর, শোনে, 'কোন্ ইংরাজের পদাঘাতে কোন্ কুলির প্লীহা ফাটিয়াছে, ট্রেনের গাড়িতে ইংরাজ ফিরিঙ্গি কর্তৃক কোন্ দিন কোন্ ভারতবাসী লাঞ্ছিত-অপমানিত হইয়াছে, কোর্টে ইংরাজ ভারতবাসীর মকদ্দমায় কখন কিরূপ অবিচার হইতেছে'... [পৃঃ ১২৩, গ্রন্থাবলী, ৬] শুনতে শুনতে বেদনায়, ক্রোধে জ্বলে ওঠে জ্যোতির্ময়ী, আর হাসতে-খেলতেও ভালো লাগে না তার,— কিন্তু ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলের ভূমিকায় আবদ্ধ থাকতে পারে না জ্যোতির্ময়ী, অক্ষমের ক্ষোভের পথ যে তার নয়, বালিকা বয়সেই সতেজ দৃঢ়তায় শিক্ষককে সে শোনায় প্রতিকারের পথ— 'শহরে, নগরে, গ্রামে, পল্লীতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়ামশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।' [পৃঃ ১২৪, গ্রন্থাবলী, ৬] শুধু ভাবনা-চিন্তাতেই থেমে থাকেনি জ্যোতির্ময়ী, বাবা রাজা অতুলেশ্বরকে প্রণোদিত করে অচিরেই সম্ভব করে তুলেছে তার ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড।

বালিকা জ্যোতির্ময়ীর জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠেন রাজা অতুলেশ্বরের প্রমাতামহী রানি বিচিত্রা— যিনি অশ্বারূঢ়া হয়ে স্বয়ং গিয়েছিলেন বর্গিদমন করতে— জ্যোতির্ময়ীও তার প্রথম কৈশোরেই রানি বিচিত্রার মতই স্বদেশরক্ষার স্বপ্ন দেখে।

জ্যোতির্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতির নিয়মাবলীতে স্থান পায় : 'দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিবে', বা 'নারী-সম্মান রক্ষা করিবে, এবং দুর্বলের সহায় হইবে।' এমনকী, এমন কথাও : 'স্বদেশী-বিদেশী নির্বিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে' কিংবা, 'অযথা বল প্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না, কিন্তু অপমানিত হইলে নতমুখে তাহা সহ্য করিবে না।' [পৃঃ ৬৪৩, অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ভারতী]

বয়কট আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটি যেমন স্বর্ণকুমারী দেবীর সমর্থন পায়নি, ঠিক তেমন কথাই শোনা যায় 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর মুখে : 'বিলিতি জিনিস একেবারে বর্জন করার সময় এখনও আসেনি। সেজন্য কিছুদিন ধরে এখনও আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ....কলকারখানারও বিস্তৃত আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সস্তা জিনিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।' [পৃঃ ১৬২, গ্রন্থাবলী, ৬]

'মাতৃমন্দির' নামে এক গুপ্তদলের পরিচালনায় সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিচয় আছে 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি' উপন্যাসে, জ্যোতির্ময়ীর প্রণয়ী ডাক্তার শরৎকুমারের মুখেও

শুনি স্বর্ণকুমারীর সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি— 'তাহারাই যথার্থ দেশভক্ত সাধক— যাহাদের মূলমন্ত্র রক্তপাত নহে— আত্মপাত। শোণিতার্ঘ্যা মাতৃভূমি সুখে গ্রহণ করেন না, তাহাতে তাঁহাকে কলঙ্কিত করা হয়।' [পৃঃ ১৬৭, গ্রন্থাবলী, ৬]

স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনার পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উল্লেখও স্থান পেয়েছে এই উপন্যাস-ত্রয়ে। বঙ্গবিভাগ আর তার প্রতিক্রিয়া যেমন 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে অহিংস শোভাযাত্রার বিশ্বস্ত বিবরণী ধরা আছে 'মিলনরাত্রি' উপন্যাসে। স্বদেশকে আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছ থেকে কতদূর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি, কতখানি খণ্ডিত করে রেখেছি, 'মিলনরাত্রি' উপন্যাসে রাজা অতুলেশ্বরের মুখে শুনি সে কথা : '...অনেকে আইরিশদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করেন; কিন্তু তাদের অধীনতা পরিপূর্ণভাবে বাইরের— বহিঃশত্রুর দমনেই তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমাদের মনঃপ্রাণ আত্মা পর্যন্ত যে অধীনতার ডোরে কষে বাঁধা! স্ত্রীজাতির উচ্চ অধিকার আমরা মানতে চাইনে,— বর্ণবিভেদ আমরা ভুলতে পারিনে। হিন্দু মুসলমানের মিলন আমরা অসম্ভব জ্ঞান করি, বিলাতে গেলে আমাদের অধঃপতন হয়, নীচ জাত মন্দিরে ঢুকলে দেবতাও তাকে নির্যাতন করেন, ... হায় রে! মনের এই সব জঙ্গল সাফ্ না করে দিলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্থানই বা কোথায়, তাই বল তো?' [পৃঃ ৭৩-৭৪, 'মিলনরাত্রি'] রাজার এ ক্ষোভের উচ্চারণে তো শোনা যায় স্বর্ণকুমারীর নিজেরই মনের কথার প্রতিধ্বনি।

আধুনিক পাঠককে মুগ্ধ করার মত আঙ্গিকের অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য হয়ত আমরা খুঁজে পাই না স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে; তাঁর উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিতেও তো শুনি (প্রথম পর্যায়েই বিশেষত) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরণন। নাটকের মতই, সামাজিক উপন্যাসগুলিতে গানের ব্যবহারে স্বর্ণকুমারী দেবী অকৃপণ, তবে বিচ্ছিন্নভাবে শ্রবণসুন্দর হলেও, সব সময় ঔপন্যাসিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকেনি তাঁর গানগুলির। গানের ব্যবহারে যেমন, কথোপকথনের প্রবাহে, তর্কবিতর্কের ঝড়েও তেমনি অনেক সময় শিথিল হয়ে গেছে উপন্যাসের ঘটনাধারার গতিবেগ।

তবু, সামাজিক উপন্যাস রচনায় ক্রমশ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখনী। 'ছিন্নমুকুল'-এ ধ্বনিত একটি করুণ সুরের রাগিণী শক্তি ও গভীরতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে 'স্নেহলতা' আর 'কাহাকে' উপন্যাসে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য পেয়েছে ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি'তে।

সাল তারিখের বিচারে আরও দু'একজন নারী-ঔপন্যাসিক হয়ত স্বর্ণকুমারী দেবীর আগেই কলম ধরেছিলেন, কিন্তু ধারাবাহিকতার বিচারে স্বর্ণকুমারীই প্রথমা, বিষয়ের ব্যাপ্তিতেও প্রথমার গৌরব তাঁরই। সমকালীন সমাজকে কতদিক থেকে বিচার করেছেন, প্রকাশ করেছেন তিনি। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না— এই তো সে সমাজের আদর্শ মেয়ের অভিধা— সেই আদর্শেরই প্রতিমা তাঁর কনক, (ছিন্নমুকুল) তাঁর স্নেহলতা (স্নেহলতা)— সমাজের, প্রিয়জনের নিষ্ঠুর পীড়নে আত্মহননে ফুরিয়ে যায় যাদের অচরিতার্থ ছোট্ট জীবন। বাঞ্ছিত-সম্মিলনে পূর্ণতাকে ছুঁয়েছে মৃণালিনী বা মণি-র অন্বেষণ, (কাহাকে) শিক্ষা তাকে দিয়েছে তার স্বয়ম্ভরতার শক্তি। শক্তিময়ী নারীর ব্যক্তিত্ব কেমন করে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে স্বদেশমন্ত্রে— শেষ ত্রয়ী-উপন্যাসে (বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি) ধরা আছে তারই পরিচয়। স্বর্ণকুমারীও তো সেই যুগের মেয়ে যাদের 'শক্তিতে আর ইচ্ছায়' মিল হয় না, মিল হয় না 'ব্যথায় আর বুদ্ধিতে'। স্বর্ণকুমারীর সারাজীবনের সাহিত্যচর্চায় আছে সেই যুগের বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা— মধুর থেকে প্রখরে পৌঁছেছে তাঁর উপন্যাসের মেয়েদের শক্তি— ঘরের কোণের মৃদু প্রদীপশিখা শেষ পর্যন্ত অবগাহন করেছে জ্যোতিসমুদ্রে।

উনিশ শতকে নারী-আলোচনা এবং স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'

সুতপা ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় নারী প্রসঙ্গ একটু বেশিমাত্রাতেই গুরুত্ব পাচ্ছিল, কেননা সমাজ আলোচনার কেন্দ্রে তখন ছিল নারী। সতীদাহ, বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন, বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহ, অবরোধের কঠোরতা— এই সব সামাজিক প্রথার বলি ছিল নারীই। এ সব প্রথার সংস্কার-প্রচেষ্টার পক্ষে ছিলেন কেউ কেউ, বিপক্ষে ছিলেন অনেকেই। দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ চলতেই থাকত পত্র-পত্রিকায়। নারী শিক্ষা ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। নারীর শিক্ষালাভ আদৌ উচিত না অনুচিত, শিক্ষা যদি বা দেওয়া হয় তবে কোথায় দেওয়া হবে, অবরোধের বাইরে গৃহললনাদের চলা-ফেরা উচিত না অনুচিত, নারীশিক্ষার সীমা থাকবে কোন্‌খানে— এই সবকিছুই আলোচ্য বিষয় ছিল পত্র-পত্রিকায়।

কিন্তু 'ভারতী'তে নারী আলোচনার সূত্রপাত হল একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ তরুণ রবীন্দ্রনাথের। ইউরোপের সমাজে মেয়েদের সর্বত্র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে তিনি অনুভব করেছিলেন মেয়েদের অনুপস্থিতি আমাদের সমাজ এবং পরিবার জীবনে কতটা ক্ষতিকর। তরুণ ভ্রাতার মতামতের উপর সম্পাদকের কাঁচি চালাননি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যে সে সব মতামতের উপর বিরোধিতা করতেও ছাড়েননি। দুই ভাইয়ের মত-বিরোধিতা থেকে আরেক জাতের নারী আলোচনার সূত্রপাত হল, যার ভর নারী বিষয়ে নিছক সামাজিক প্রথা নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু এই আলোচনার আর কোনও অগ্রগতি দেখা যায়নি 'ভারতী'র পাতায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের আমলে। তরুণ রবীন্দ্রনাথও যুবক হলেন, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকপদে বৃত হলেন, সংসারী হলেন, জমিদারির দায়িত্ব নিলেন। নারী বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি ততদিনে কতই না অন্যজাতের হয়ে উঠল— 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-র তুলনায়। তাঁর সেইসব মতামত প্রকাশ পেতে পেতে পালটে গেছে 'ভারতী'র সম্পাদক পদ, দ্বিজেন্দ্রনাথের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বর্ণকুমারী, ১২৯১ সাল থেকে।

২.

স্বর্ণকুমারী যখন 'ভারতী'-সম্পাদনা শুরু করলেন, তখন তাঁর সম্পাদনার লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি নারী আলোচনা বিষয়ে কোনও কথাই তোলেননি, তিনি নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও। কিংবা হয়ত তিনি নিজে নারী বলেই। মননের জগৎ একান্তভাবে পুরুষেরই জগৎ আর মেয়েদের জগৎ হল আবেগের জগৎ— নারী পুরুষের এলাকার এই স্পষ্ট বিভাজন পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আরম্ভ করে সভ্য জগতের সর্বত্রই ঘোষিত ছিল সে সময়। হয়ত সেই কারণেই, এই বিভাজন যে পুরুষতন্ত্রের মনগড়া— এইটেই হয়ত দাখিল করতে চাইছিলেন স্বর্ণকুমারী। আট পৃষ্ঠা দীর্ঘ তাঁর সেই সম্পাদকীয়তে মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য যে 'মানসিক সৌষ্ঠব বিধান', এইটুকুমাত্র নির্দেশ করে তার সূত্র ধরে স্বর্ণকুমারী একে একে মনের বিবিধ বিভাগ এবং তাদের অন্যতম যে জ্ঞান— তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে নারীকে পুরুষতন্ত্র জ্ঞান-রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছেন, সেই নারীরই সামর্থ্য রয়েছে জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার—

১২৯১ সালেই স্বর্ণকুমারী তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। আর এই ভাবে, নারী আলোচনা সম্পাদকীয়তে না তুলেও, স্বর্ণকুমারী উনিশ শতকের নারী আলোচনায় বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন, স্থাপন করেছিলেন নারী-সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত।

জ্ঞানের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী জ্ঞানের তিনটি সোপান উল্লেখ করেছেন— প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কাল্পনিক জ্ঞান আর সামান্য জ্ঞান। সেইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছিলেন, 'তিনটির একসঙ্গে উন্নতি হয় বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে।' বিজ্ঞানচর্চার কথা বলছে কোনও মেয়ে! উনিশ শতকের পটভূমিতে এ কি একান্তই আশ্চর্য ঘটনা নয়? জ্ঞানচর্চায় তবু প্রাচীন ভারতের গার্গী-মৈত্রেয়ীর নাম শোনা আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় আবার কবে কোন্ মেয়ে নিয়োজিত হয়েছে! মেয়েরা যে প্রকৃতি স্বরূপিণী আর বিজ্ঞান যে প্রকৃতি বিরোধী! স্বর্ণকুমারী যখন তাঁর সম্পাদকীয়তে লেখেন : 'আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি', তখন, তার পিছনে, নারীর সাংস্কৃতিক লিঙ্গ-প্রতিমাকে আঘাত করার সচেতন প্রয়াস তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। একথা অবশ্যই ঠিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কোনও মৌলিক ভাবনা স্থাপন করার সামর্থ্য স্বর্ণকুমারীর ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রণালীকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন, সাহিত্যের প্রণালীর সঙ্গে তার যেভাবে তুলনা করছেন, সাহিত্যের কল্পনার থেকে বিজ্ঞানের কল্পনা যে উচ্চতর— যেভাবে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার স্পষ্টতা তাঁর বিজ্ঞানে গভীর প্রবেশ এবং অভিনিবেশেরই সাক্ষ্য দেয়। এই সম্পাদকীয়তে স্বর্ণকুমারী এও জানিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের মাত্রা যে তিনি বাড়াতে চান পত্রিকায়, তা বিশেষভাবে 'ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ'-এর কথা ভেবে, যাঁরা বিদেশি ভাষা জানেন না বলে 'বর্তমান কালের বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে অপারগ'। উনিশ শতকের নারী শিক্ষা আলোচনায় এইভাবে স্বর্ণকুমারী আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার কথাও নিয়ে এলেন, যার প্রয়োজনীয়তা দূরে থাক, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও পুরুষেরা অনাবশ্যক বোধ করতেন।

৩.

নারী শিক্ষা আলোচনা স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত 'ভারতী'তে শুরুতেই স্থানও পেয়েছিল। লেখক নামহীন 'বর্তমান শিক্ষা' নামে প্রবন্ধটিতে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষাই ছিল আলোচ্য বিষয়। আর সেই কারণেই, হয়ত অনুমান করা যায়, স্বয়ং সম্পাদিকাই লিখেছিলেন প্রবন্ধটি। শুধু নারী শিক্ষাই নয় স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত প্রথম বছরের 'ভারতী'তে বাল্যবিবাহের মত সমাজপ্রথা নিয়ে বিতর্কও স্থান পেয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি বসিকলাল সেনের, যিনি মূলত বাল্যবিবাহের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তাঁর মতামতের বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লিখেছেন হরকালী সেন। বাল্যবিবাহ বিষয়ে এসব বাদ-প্রতিবাদে উনিশ শতকের গণমানসেরই প্রতিফলন দেখি আমরা, যা চলে আসছিল 'ভারতী'র জন্মের অনেক আগে থেকেই। যুগ-প্রচলিত নারী আলোচনাকে যে সম্পাদিকা 'ভারতী'তে স্থান দিলেন, মনে হয় তাঁর কাছে নারী আলোচনার গুরুত্ব ছিল বলেই।

এই আলোচনা সূত্রে আমরা পাল্টে যাওয়া রবীন্দ্রনাথকেও পেয়ে যাই। 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি বলতে চাইলেন : বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা— এসব প্রথা নিরোধ বা প্রচলন সকলের জন্য একই নিয়মে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কার পক্ষে ভাল, কার পক্ষে ভাল নয়— সেই বিচারটার জায়গা থাকা উচিত: 'সকল অবস্থাতেই আইন-পূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থা নির্বিচারে বিবাহার্থিনী বিধবামাত্রেরই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয় সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের এই পুরুষতান্ত্রিক মতামতের সঙ্গে সম্পাদিকার কোনও টিপ্পনী নেই দেখে বেশ অবাক লাগে। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপের চিঠির

সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ তো তার সমালোচনা করতে ভোলেননি। স্বর্ণকুমারীর মত প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল না এই প্রশ্ন তোলা— হঠাৎ মেয়েদের বেলাতেই এমনতর সব বিবেচনার কথা তোলা হয় কেন? 'অবস্থা নির্বিচারে' বিবাহার্থী পুরুষ (বিপত্নীক শুধু নয়, সপত্নীকও বটে!) যে বিবাহ করতে পারছে, তাতে কি কিছু কম 'অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত' হয়েছে সমাজে? 'স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই' যদি 'বঙ্গীয় সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়', তাহলে পুরুষ মাত্রেরই স্বাধীনতা হরণ করা হয় না কেন, আলালের ঘরের দুলালরা তো 'বঙ্গীয় সমাজ'কে অপদস্থ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বোধ করেন না! বাল্যবিবাহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সবচেয়ে বিস্ময়কর, বাল্যবিবাহে-র কুফল বিষয়ে তো তাঁর অন্তত ওয়াকিবহাল না থাকার কথা নয়। বাল্যবিবাহেরই ফল বিপুল সংখ্যক বালিকা বিধবা, 'সমাজ দুর্নীতি'র তো সেটা যথেষ্ট বড় কারণ! রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের বাল্য বয়সেই বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বর্ণকুমারী তা করেননি। তাই মনে হয় না রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্পাদিকারও মতামত। এমন হতে পারে, তিনি আলোচনাটিকে চালিয়ে যেতে চেয়েছেন, নিজেকে নিরপেক্ষ নীরবতায় রেখে।

১২৯১-৯২ সালের ভারতীতে নারী আলোচনায় ঠাকুরবাড়ির যে পুরুষটির রবীন্দ্রনাথের খুব বিপরীতে অবস্থান ছিল, তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরাসরি এসব সামাজিক প্রথা নিয়ে তিনি অবশ্য কোনও প্রবন্ধ লেখেননি, তিনি লিখছিলেন 'প্রবাস পত্র' নাম দিয়ে মহারাষ্ট্রের নারীসমাজের রীতি-নীতির কথা, আর তুলনায় থাকছিল বাঙালি সমাজ প্রসঙ্গ। যেমন, বোম্বাইতে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' দেখে তাঁর নতুন লেগেছে, ভাল লেগেছে আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে বঙ্গীয় সমাজের 'অন্তঃপুর-প্রথা', 'বলিতে কি অন্তঃপুর প্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে সমাজ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল হইবে বল। ... অবলাকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ নিতান্ত 'অবলা' করিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয় ভীরুতা দূর হইবে না।' যে লেখা থেকে এই উদ্ধৃতি, সেটি প্রকাশিত হয়েছে ১২৯১ সালের চৈত্রমাসে। সে লেখায় জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, চিরবৈধব্য প্রথা— ইত্যাদি নানারকম সামাজিক প্রথার সমালোচনা আছে। কিন্তু ১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত 'প্রবাস-পত্র'তে তিনি বাল্যবিবাহ বিষয়ে তর্কেই যোগ দিচ্ছেন সরাসরি। বিবাহ বিষয়ে দুটি শর্ত দিচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ। ১. 'দম্পতি যোগ্য বয়সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিবে।' ২. 'স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণের সামর্থ্য বুঝিয়া পুরুষ দার পরিগ্রহ করিবে।' এ শর্ত দুটির বিরোধিতা কেউ আর করেননি বলে ধরে নেওয়া যায় বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় এই শর্ত দুটি মেনেই নেওয়া হয়। এই মাসেই রসিকলাল সেন 'বিধবাবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর 'বাল্যবিবাহ' বিষয়ে আলোচনার থেকে এ লেখার সুর অনেকটাই আলাদা, এখানে তিনি বিবাহ বিষয়ে 'বিধবাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য' বলে বিবেচনা করেছেন। 'ভারতী'র নারী আলোচনার প্রভাবই এই সুর বদলের কারণ— এমন অনুমান হয়ত অসঙ্গত মনে হবে না।

১২৯৪ সাল পর্যন্ত 'বিবাহ'-সংক্রান্ত নানারকম আলোচনা 'ভারতী'র পাতায় দেখা যায়, সম্পাদিকা যাদের বলতে চান 'সামাজিক প্রবন্ধ', যে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য: 'জনসাধারণের ক্ষণস্থায়ী মতে স্রোতে না ভাসিয়া যুক্তি দ্বারা সামাজিক গতিবিধি নির্ণয় করা।' ১২৯২-এর সম্পাদকীয়তে একথা বলেছিলেন স্বর্ণকুমারী, বলেছিলেন যে কোনও একটি 'প্রস্তাবিত বিষয়' নিয়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে নানারূপে দেখার আবশ্যকতার কথা। সেই 'আবশ্যকতা' বোধেরই ফল বিবাহ-সংক্রান্ত আলোচনাগুলি। 'পঠদ্দশায় বিবাহ', 'বিবাহ', 'নিকট সম্পর্কে বিবাহ', 'বিবাহের জন্য পূর্ব অনুরাগ আবশ্যক কি না', 'হিন্দু বিবাহ'— ইত্যাদি শিরোনামে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতিকে। এর মধ্যে 'হিন্দু বিবাহ' নামে প্রবন্ধটির লেখক

রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে এটি লেখা। চন্দ্রনাথ বসু দুটি প্রবন্ধে হিন্দু পত্নীর আদর্শ, হিন্দু বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স, তার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বোঝা যায়, 'ভারতী'তে যে বিবাহ বিষয়ে এতরকম আলোচনা করা হচ্ছিল, তখনকার সমাজে নানাভাবে সেসব আলোচনা চালু ছিল বলেই।

কিন্তু নারী শিক্ষা আলোচনায় স্বর্ণকুমারী এমন কিছু প্রসঙ্গ আনলেন, যা সে সময়ের চালু আলোচনাগুলির অন্তর্গত হল। ১২৯২ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল 'একটি প্রস্তাব' নামে তাঁর একটি লেখা, যে লেখা মূলত 'সখিসমিতির'ই ইস্তাহার, আর 'সখিসমিতি' ব্যাপারটাই তো বাঙালি সমাজে তখন একেবারেই নতুন। এই লেখাতে স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন পুরুষের জীবনে ঘরের শিক্ষার গুরুত্বের দিক থেকে। মেয়েলি গুণ বলে চিহ্নিত গুণগুলি যে আসলে মানুষেরই গুণ, পুরুষেরও সে সবের দরকার আছে, মেয়েদের নিন্দা-প্রশংসা যে পুরুষের কাজকে নির্ধারিত করে— স্বর্ণকুমারীর এসব অভিমত নারী শিক্ষা আলোচনায় নিতান্তই নতুন। শিক্ষা বলতে তিনি নিছক লেখাপড়া শেখার কথা ভাবেননি, মেয়েদের জীবন-যাপনের পুরো ছাঁদটি যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা দাবি করে, স্বর্ণকুমারী সেই শিক্ষার কথা বলেছিলেন: 'বর্তমান সমাজের যেরূপ বিপ্লবের অবস্থা, কালের স্রোতে যেরূপ সকল দিকে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছেন তাহাতে দেশের উপযোগী করিয়া, দেশীয় ভাবের সহিত সাম্য রাখিয়া সমাজের পুরাতন আচার-ব্যবহার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া পিটিয়া না লইলে চলিতে পারে না।' 'পুরাতন আচার-ব্যবহার' বলতে সম্ভবত স্বর্ণকুমারী অবরোধ-প্রথার কথা বলতে চেয়েছেন এখানে, যে প্রথা পালটানো দরকার। মেয়েদের বাইরে বেরোতে হবে, কিন্তু সেজন্য যথাযথ পোশাক প্রয়োজন। সেইসঙ্গে শিখতে হবে পাঁচজনে সঙ্গে মেলামেশা করতে। প্রথমে মেয়েদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে শেখা দরকার পরিবার-গণ্ডির বাইরে, তারই জন্য সখিসমিতি। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও যে শিক্ষার ব্যাপার, সেখানেও শোভনতার প্রয়োজন— নারী শিক্ষা আলোচনায় এসব প্রথম বলা হল। ১২৯৩ সালে স্বর্ণকুমারী লিখলেন 'আর একটি প্রস্তাব'। এ লেখাটিও সখিসমিতির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এখানে নারী শিক্ষা আলোচনায় আরেকটি মাত্রা যোজিত হল— দেশানুরাগের মাত্রা; বলা হল: 'যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকদের মনে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারে, সেই শিক্ষাই এখন সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। স্ত্রীলোকের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হইলে তাহা অতি দ্রুত দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে। ... হিন্দু বিধবারা... যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মূর্তিমতী দেশানুরাগের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করুন। ... ইহাতে তাঁহাদের বৈধব্যোচিত ধর্মপালন হইবে।' — এ কথাগুলি নিছক স্বর্ণকুমারীর একলার কথা নয়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি মানসিকতায় নারী আলোচনার সঙ্গে যেভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জড়ানো হয়েছিল, বিধবার ব্রহ্মচর্যের কঠোরতাকে যেভাবে হিন্দুত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করা হয়েছিল— এ কথাগুলি অনেকটাই তো তারই প্রতিধ্বনি! তবু 'স্ত্রীলোকের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্বলিত' হলে যে তা অতি দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে— স্বর্ণকুমারীর এই বিশ্বাস, মেয়েদের ক্ষমতার ওপর এই বিশ্বাস, তাঁর নিজেরই।

৪.

কিন্তু ১২৯৫ সালের শুরুতেই 'ভারতী'তে এমন একটি লেখা প্রকাশ পেল, যা উনিশ শতকের নারী আলোচনায় যুগান্তর সূচনা করে। আর নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা কিংবা নারী সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতির আলোচনা নয়, এ লেখায় প্রশ্ন তোলা হল নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে। অধিকারের সমতা নিয়ে প্রশ্ন আগেও উঠেছে, এবারে সামর্থ্যের সমতা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। লেখাটির শিরোনাম : 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'। লেখিকা স্বয়ং স্বর্ণকুমারী। আজকের দিনে পুরুষ যে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ— এ কথা মেনে নিয়ে

স্বর্ণকুমারী বলতে চেয়েছেন এ শ্রেষ্ঠতার মূলে রয়েছে নারীর সুদীর্ঘকালের সামাজিক অবদমন। সে অবদমন যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, যদি কিছুকাল মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি চর্চার সুযোগ পায়, তার পরেই না ঠিক ঠিক শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেওয়া সঙ্গত হবে। আসলে এই সমতার প্রশ্ন তখন পশ্চিমের নারী আন্দোলন সূত্রে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে, বাদানুবাদ চলছে। তার কিছু কিছু স্বর্ণকুমারী এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে নাইন্‌টিনথ সেঞ্চুরি পত্রিকাতে প্রকাশিত জে. রোমানিক-এর 'স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক পার্থক্য' নামে একটি লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও রেখেছেন স্বর্ণকুমারী। যে উদ্ধৃতিতে 'so called women's movement'-এর কথা আছে, বলা আছে— এ যুগে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হবে। এ আন্দোলনের প্রভাব যে পুরুষদের উপরেও পড়বে, এ কথাও লেখাটিতে বলা আছে, বলা আছে এর প্রভাব পড়বে— 'not only in the nursery and the drawing-room, but also in the study, the academy, the forum, and the senate.' এইভাবে স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'তেই, সম্পাদিকা স্বয়ংই প্রথম বাংলা আলোচনা-জগতে পশ্চিমী নারীবাদ এবং নারী আন্দোলনের কথা হাজির করলেন।

এই প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারী রোমানিস-এর মত এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকটাই আলোচনা করেছেন। সে সূত্রে তিনি রোমানিস-এর একটি পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন পুরুষের তুলনায় ৫ আউন্স কম। পুরুষের বুদ্ধি-বৃত্তি এই কারণেই তাঁর মতে মেয়েদের তুলনায় প্রখরতর। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী নিজের কোনও মতামত দেননি এ প্রবন্ধে। কিন্তু পরের মাসেই 'ভারতী' পত্রিকায় 'মস্তিষ্কভার' নাম দিয়ে গোটা একটা প্রবন্ধই প্রকাশিত হল, যার বিষয়বস্তু অধ্যাপক রোমানিস-এর এই মতকে খণ্ডন করা। অবশ্য লেখিকা নিজে তা করতে পারেননি, মিস ফ্রান্সেস কর নামে ইংল্যান্ডের কোনও বিদুষী মহিলা তা করেছেন, আর স্বর্ণকুমারী তাকে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করা জরুরি মনে করেছেন। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা যে বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করে না, মিস কর তা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁর একটি যুক্তি হল : অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্না মিসেস সমারভিলের মাথাটি ছিল নিতান্তই ছোট। এই লেখার সঙ্গে সম্পাদিকা মিসেস সমারভিলের পরিচয়ও দিতে ভোলেননি। ইনি উনিশ শতকের একজন 'বিজ্ঞানবিদ রমণী'। সূর্য কিরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইনি বিজ্ঞান জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এমন একজন নারীর পরিচয় জ্ঞাপন করতে পেরে স্বর্ণকুমারী যেন আরেকভাবে প্রকৃতি-বিরোধী বিজ্ঞান আর প্রকৃতিময়ী নারীর সমাজ-প্রতিষ্ঠিত বিপরীত-মুখিতাকে অস্বীকার করতে চাইলেন।

৫.

'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' এবং তার পরিপূরক লেখা 'মস্তিষ্কভার'-এর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ লেখক রোমানিস-এর মত ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা কিংবা প্রতিবাদ আসলে পুরুষতন্ত্রের লিঙ্গরাজনীতিরই প্রতিবাদ। কিন্তু একই বছরে, 'ভারতী'র পাতায় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভাবান ভাইদের কোনও কোনও লেখায় লিঙ্গরাজনীতি বেশ খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল। 'সে কালের ইংরাজ স্ত্রী' নামে একটি লেখায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছিলেন, নারীর প্রতি অত্যাচার শুধু যে এ দেশে আছে এমন নয়, ইংরেজরাও সেকালে নারীনিগ্রহে দড় ছিল। সেই সঙ্গে নারীচরিত্র হননেও তাদের আগ্রহ কম ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজ মেয়েদেরও স্বভাবে ছিল ক্রোধান্ধতা। এই সম্বন্ধে কোনও প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিতের মতামত জ্ঞাপন করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলছেন, 'এইরূপ মেজাজ বিগড়াইবার কারণও বোধহয় কতকটা পুরুষের অত্যাচার। আমরা দেখিতে পাই ছেলেদিগকে পিতামাতারা যখন এক এক সময়ে অনিয়মিত আস্কারা দেন ও অকারণ প্রহার করেন তখন সেই সকল ছেলে বিগড়াইয়া যায়— মানবপ্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। অর্থাৎ আপনার খেয়াল অনুসারে প্রভু যদি দাসের প্রতি যথেচ্ছা

ব্যবহার করেন (অকারণে রুষ্ট ও অকারণে তুষ্ট হন), তাহা হইলে সেই দাসবৎ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে কখনই তাহার চরিত্র প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। স্ত্রী যতদিন স্বামীর কষাঘাতের শাসনে থাকে ততদিন কখনই সে স্বামীর সখী ও সঙ্গিনীর পদবাচ্য হইতে পারে না।' — এই কথাগুলিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যাচারিতা নারীর প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করতে চাইছেন, অথচ পিতামাতা-ছেলেমেয়ে কিংবা প্রভু-দাসের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের সমান্তরাল টেনে তিনি এ সম্পর্কের রাজনৈতিক চরিত্রই উদঘাটন করে দিয়েছেন। প্রভু ক্ষমতাবান আর দাস ক্ষমতাহীন, কিন্তু তাই বলে দাসের প্রতি অত্যাচার করা প্রভুর শোভা পায় না। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। একেই 'sexual Politics' বইতে, কেট মিলেট বলেছেন 'শিভালরাশ' মনোভঙ্গি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথেরও ছিল মেয়েদের বিষয়ে এই 'শিভালরাশ' মনোভঙ্গিই। 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র'-তে তিনি তাই যে মারাঠী বীরপুঙ্গবেরা রমাবাই-এর বক্তৃতাসভা পণ্ড করে দিতে চেয়েছিল তাদের নিন্দা করলেও সেইসঙ্গে রমাবাই-এর বক্তব্যের তীব্র, কঠোর সমালোচনা করেন। মেয়েরা সব বিষয়েই পুরুষের সমান, কেবল মদ্যপানে নয়— রমাবাই-এর এই মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের উষ্মার কারণ। বোঝা যায়, 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' কিংবা 'মস্তিষ্কভার'-এর আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনও মানই পায়নি। রবীন্দ্রনাথের এই লেখার প্রতিবাদ করে স্বর্ণকুমারী লিখলেন 'রমাবাই' নামের প্রবন্ধটি, যেখানে স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করা হল পুরুষ-স্ত্রীর প্রভু-দাস সম্পর্কের, বলা হল : 'কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের (স্ত্রীলোকের) জীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য আছে— নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিতে তাহারও অধিকার আছে।'

বস্তুত, 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'তে নারী আলোচনা শুরু হয়েছিল, তারই জের চলছিল রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারীর রমাবাইয়ের বক্তৃতাসূত্রের লেখা দুটিতে। নারী-পুরুষের যে সমতার কথা বলতে চেয়েছিলেন 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী, রমাবাই-ও তাঁর বক্তৃতায় সেই সমতার কথাই বলেছিলেন, আর তাতে বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মেয়েদের ধারণাশক্তি থাকতে পারে কিন্তু সৃজনীশক্তি নেই পুরুষের মত। তার প্রতিবাদ করলেন স্বর্ণকুমারী ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকদের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে। স্বর্ণকুমারী রমাবাইকেও স্ত্রী-পুরুষ সমতার নজির হিসেবে উপস্থিত করলেন, কিংবা আরেকটু এগিয়ে পুরুষের তুলনায় রমাবাইয়ের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করতে চাইলেন : 'রমাবাইয়ের মুখে একথা অশোভন নহে, বিশেষ স্ত্রীলোক যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের কোন পুরুষ তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হইয়া সাতসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পারে গিয়া স্বকার্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন?'

'রমাবাই' নামে স্বর্ণকুমারীর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে, আর ওই বছরই ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হল কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামে প্রবন্ধ, যাকে নারী আলোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুদীর্ঘ এই প্রবন্ধে নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস ছিল। পুরুষের গুণ এবং নারীর গুণ যে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নির্মিতি, লেখিকা সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন আলোচনায়। মনে রাখা দরকার, আজকের দিনে আমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলিঙ্গ-নির্মাণ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে, তার সূত্রপাত 'ভারতী'র পাতায় একশো বছর আগেই ঘটেছে। স্বর্ণকুমারীর সম্পাদক-পদ ছাড়া কি এ লেখা প্রকাশ পেতে পারত, যে লেখায় বলা হয়েছে : 'স্ত্রী-জাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসত্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্যজ্ঞান ও সম-অধিকার লাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ও সাংঘাতিক বাধা।'

কৃষ্ণভাবিনীর এই লেখা যে পুরুষ-প্রতাপে আঘাতে দেবে, প্রতিবাদ উঠবে— এ তো অনুমান করাই যায়। ১২৯৭-এর বৈশাখের ভারতীতে প্রকাশিত হল স্ত্রী ও পুরুষ বিষয়ে দুটি লেখা। একটি 'শ্রী যোঃ' স্বাক্ষরিত, অন্যটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। বলেন্দ্রনাথের লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' লেখাটির এতটাই মিল যে মনে হয় বলেন্দ্রনাথের বকলমে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সেটি, অন্তত পুরোটা না হোক, সে-লেখার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের কলম চালানো। দুটি লেখাতেই কৃষ্ণভাবিনীর নাম না করে তাঁর মতামতের বিরোধিতা করা হয়েছে, নারী-পুরুষের পৃথক গুণ, পৃথক ক্ষেত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নটিকে এঁরা নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।

'ভারতী' পত্রিকায় নারী-আলোচনাকে এর পর যিনি প্রসারণ দিলেন, তিনি কিন্তু কোনও নারী নন, পুরুষ। ১২৯৭ সালেই পৌষ মাসে প্রকাশিত সীতানাথ নন্দীর 'রমণীর শিক্ষা ও কার্য' লেখাটিতে এমন সব কথা রয়েছে, যা সে যুগের কোনও পুরুষের কাছ থেকে শুনতে পাব— এ যেন ভাবনারও অতীত। ইনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা তখন পুরুষদের মুখে বড় একটা শোনা যেত না। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, ইনি মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন : 'যতদিন রমণী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না লাভ করবেন, ভাতের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন, ততদিন তাঁদের স্বাধীন বলার চেয়ে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি আর কি হইতে পারে?' মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার থাকার আবশ্যকতার কথাও এই লেখায় রয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্যের উপর যাঁরা জোর দেন, তাঁরা মেয়েদের মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের বহু লেখাতে এর নজির আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য কি এটাই নয়, যে শুধু স্তন্যদান ছাড়া আর সব কাজই বাবা-মা দুজনেই করতে পারেন? সীতানাথ নন্দী তাঁর লেখায় এই সত্যের কথাই বললেন। মেয়েদের জীবিকা-অর্জনের প্রশ্নে যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁদের বক্তব্য— বাইরে বেরোলে মেয়েলি গুণগুলি— যেমন কোমলতা দয়ামায়া ইত্যাদি কমে যাবে মেয়েদের মন থেকে। সীতারাম নন্দী একেও ভ্রান্ত জানালেন। সমাজের এক দ্বিমুখী রীতি নির্দেশ করলেন এই লেখক— মেয়েলি এসব গুণকে সমাজ একদিকে অবজ্ঞা করে, অন্যদিকে চায় মেয়েদের জন্যে থাকুক এ গুণগুলি।

সীতানাথ নন্দীর এই লেখাটি প্রমাণ দিচ্ছে পুরুষ মাত্রেই স্বাধীনচেতা আধুনিক মেয়েদের শত্রু বলে মনে করে না। এ কথাটা বলতে হল এইজন্যে যে কৃষ্ণভাবিনী 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধে এই শত্রুভাবের কথাই বলেছেন : 'আজকাল স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি পুরুষদের ঘৃণা বা উপহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে এক ভয়ঙ্কর শত্রুভাবের উদয় হইয়াছে।' 'ভারতী' পত্রিকায় তথা বাঙালি সমাজের নারী-আলোচনায় মেয়েদের তরফ থেকে কিন্তু কখনই কোনও পুরুষ-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। যদিও পুরুষের আচরণের সমালোচনা যথেষ্টই করছেন তাঁরা। এই সূত্রে ১২৯৮ সালের একটি লেখা উল্লেখ করব, যার শিরোনাম 'প্রেম', লেখকের নাম নেই। অনুমান করতে পারি স্বর্ণকুমারীরই লেখা এটি, কেননা তাঁর অনেক লেখায় যেমন দীর্ঘ ইংরেজি উদ্ধৃতি দেখি, এ লেখাটিতেও তেমনি আছে। উনিশ শতকের নারী-আলোচনায় এ লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে, যে 'চিত্রাঙ্গদা'-র যে-পঙ্‌ক্তিগুলি আজকে নারীবাদ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, সে-পঙ্‌ক্তিগুলি উক্ত লেখাটিরই প্রতিধ্বনি। শুধু নারীবাদ-গবেষণার জন্য নয়, রবীন্দ্র-গবেষণার কথাও মনে রেখে লেখাটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে চাই : 'জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণও মস্তকোত্তলন করিতেছেন, তাহারা আর পুরুষের সবল হস্তের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সেবাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা পুরুষের শীর্ষস্থা দেবী হইয়া পূজা গ্রহণ অপেক্ষা নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংসার সমরাঙ্গনে অগ্রসর হওয়া অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন। ... এই নারীপূজা কি প্রকৃত

পূজা? না ভ্রান্তি? না উৎকোচ? পুরুষ কি প্রকৃতপক্ষেই রমণীদের আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া মনে করেন? ... যদি তাহাই হইবে, তবে যখন জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে রমণী পুরুষের সমকক্ষভাবে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তখন আপত্তির হস্ত উত্তোলিত হয় কেন? যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকে আমরা সমান হইতে দিতে অনিচ্ছুক কেন? ইহার সদর্থ সহজেই অনুমেয়। ... যাঁহারা রমণীকে এই বিগত যুগের আদর্শক্ষেত্রে দণ্ডায়মানা রাখিয়া মৌখিক পূজা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আজও রমণীর মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; আর যে রমণী এরূপ পূজাতে সন্তুষ্ট, তিনিও আপনার প্রকৃত অধিকার, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পান নাই। রমণী পুরুষের পদপ্রান্তস্থিতা দাসীও নহেন, শীর্ষস্থা দেবীও নহেন, — তিনি পুরুষের পার্শ্বস্থা সখি। তাঁহারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের সর্বপ্রধান বন্ধু, সর্বপ্রধান সহায়। তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অথচ প্রেমের সুমধুর বন্ধনে উভয়ে মিলিয়া এক, কেহ ছোট, কেহ বড় নাই, উভয়ই সমান।' 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি যে এই লেখা থেকেই নেওয়া-- এ ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তবু, প্রেমের যে আদর্শ এখানে ব্যক্ত হয়েছে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় তা নেই, সেখানে 'চিত্রাঙ্গদা' অর্জুনের সমান বলে নিজেকে ভাবতে পারেনি, নিজেকে 'দাসী' বা 'সেবিকা' বলেছে সে। 'ভারতী'র নারী-আলোচনা যে সমতার স্বপ্ন দেখেছে, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

এই সমতা যে স্বর্ণকুমারীর স্বপ্ন, এই সমতার ভিত্তিতে স্থাপিত নারী-পুরুষ সম্বন্ধ যে স্বর্ণকুমারীর কাম্য— তা বুঝতে পারি কিছু কিছু বই-আলোচনা পড়েও। বিনয়কুমারী বসু নামে এক বালিকার লেখা কাব্যগ্রন্থ আলোচনা সূত্রে মেয়েদের কবিতা বিষয়ে উচ্ছ্বাস তো সেই স্বপ্নেরই পরিচায়ক, লেখকের নাম না থাকলেও তাই স্বর্ণকুমারীর কলম চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না : 'বিজ্ঞান জগতে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ সহসা এক অপূর্বালোকে উদ্ভাসিত। পূর্বে কবিত্ব জগতে পুরুষদিগেরি একাধিপত্য দেখা গিয়াছে, এমন কি আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাষাতেও কবি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ পর্যন্ত নাই, তা বঙ্গভাষার কি কথা? সহসা ভাষার অর্থবিপর্যয় ঘটাইয়া তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি রমণী কবি অভ্যুদিত হইয়াছেন।' তখনকার রমণীকবিদের এত সম্মান আর কে দিয়েছে? 'যুগলচিত্র' নামে একটি উপন্যাসে আদর্শহীন এবং আদর্শ বধূর চিত্র রচনা করা হয়েছে। তার আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রচিত আদর্শ বধূ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নামহীন এই লেখাটিও স্বর্ণকুমারীর বলে অনুমান করি, কেননা এই আলোচক আদর্শ বধূর স্বামী-প্রেমকে 'কুক্কুরবৃত্তিপরায়ণতা' আখ্যা দিয়েছেন, এবং তাকে কাম্য বলেও মনে করেননি. 'স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীর জঘন্য অন্যায়াচরণের প্রতিও কি শ্রদ্ধাবতী হওয়া ভাল? তাহাতে কার মঙ্গল? স্বামীর-স্ত্রীর না সমাজের? প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের এরূপ হীনাবস্থা হইত না, যদি রমণীগণ তাঁহাদের সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতি, অমনুষ্যোচিত আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধাবতী, ন্যায়ানুরাগী, ওজস্বিনী হইয়া পুরুষদিগের হীনকর্মের বাধা দিতে সক্ষম হইতেন। সেই রমণীই আদর্শ রমণী, যিনি পুরুষকে মনুষ্যত্বে হাত ধরিয়া উঠাইতে সর্বদা সচেষ্ট, সক্ষম।' — এ সব কথা 'যুগলচিত্র'কে উপলক্ষ করে বলা হলেও আসলে নারী-পুরুষের সম্বন্ধের আদর্শকেই ব্যক্ত করতে চাওয়া।

নারীবাদের একটা প্রধান দিক— নারী-পুরুষ সমতার ভাবনা, যা স্বর্ণকুমারীর লেখায় এবং তাঁর সম্পাদিত কাগজে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে উনিশ শতকে তা অদ্বিতীয়ই। কিন্তু নারীবাদের একটি অন্য দিকও আছে, সে হল নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি— তার মঙ্গল-ইচ্ছা। নারী সমাজের জন্য যে বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর, তার জন্যও বাংলার নারী আলোচনার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সমাজমনস্কতা ও নারী-চিন্তা

তপতী মুখোপাধ্যায়

'Taking all matters into consideration, the poor woman of this country should be an object of compassion rather than of our contempt. The stimulas given to India by British example and capital employed for the education of Indian females, is not among the least of her benificial operations. The time will come when their worth shall be duly appreciated by the daughters of India, and then they will sigh at the follies of their ancestors, smile at their own good fortune '[১]

— *Captain N. Augustus Willard*

১৮৩৪-এ ক্যাপটেন উইলার্ড যখন সাধারণভাবে ভারতীয় রমণীর দুর্গতিতে দীর্ঘশ্বাসবিধুর ভঙ্গীতে লিখছেন যে আগামী প্রজন্মের ভারতীয় নারী তার পূর্ববর্তিনীদের দুর্ভাগ্যে কাতর এবং নিজেদের সৌভাগ্যে উল্লসিত হবে, তার ঠিক একুশ বছর পরে ১৮৫৫-য় স্বর্ণকুমারী পৃথিবীর আলো দেখলেন। সন্দেহ নেই, এই একুশ বছরে বাংলাদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক মন্থনে বাঙালি মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য ছিনিয়ে নেওয়া মনু-যাজ্ঞবল্ক্যীয় অনুশাসনের রক্তচক্ষুর প্রভাব খুব সামান্য হলেও স্তিমিত। ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রতীচ্যশিক্ষিত সমাজের আগ্রহ বাড়ছে, 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মেয়েদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, শিক্ষিত বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের একমুখিনতার জন্য স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, অর্থাৎ সামগ্রিক বাতাবরণটি ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল হয়ে উঠছে। স্বর্ণকুমারীর আবির্ভাব ঘটেছে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে, যা নারী স্বাধীনতার প্রত্যূষপর্বরূপেও চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের প্রতীচ্য-শিক্ষা-প্রভাবিত আলোকিত মানসিকতা বাংলায় সর্বাধিক ছাপ ফেলেছিল যে ঠাকুরপরিবারে, সৌভাগ্যবশত স্বর্ণকুমারী সেই পরিবারেরই কন্যা এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়, তাঁর মানসলোক গঠনে সামাজিক, পারিবারিক প্রেক্ষাপট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে সময় স্ত্রীশিক্ষার অনিবার্য পরিণতি বৈধব্য বলে মনে করা হত, সেই অন্ধকার পরিস্থিতিতেও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে যে বিদ্যাশিক্ষার চল ছিল, তা স্বর্ণকুমারী নিজে লক্ষ করেছেন। এমনকি পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেও যে ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা অবহেলিত না হয়ে ছিল গৌরবের, তার উল্লেখ করেছেন তিনি :

'পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়িতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি, এই বড় পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।'[২] সংস্কৃতে পারদর্শিনী

স্নানবিশুদ্ধা, শুক্লবসনা 'গৌরী' এক বৈষ্ণবঠাকুরানী যে স্বর্ণকুমারীর জন্মের পূর্বেও ঠাকুরবাড়িতে কথকতার মাধ্যমে মেয়েদের ধর্মশিক্ষা দিতেন ও 'শিশুবোধ' নামক একখানি বই থেকে মেয়েদের বর্ণপরিচয় করাতেন, সে তথ্যও স্বর্ণকুমারী সযত্নে তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। বাড়িতে মালিনী বই বিক্রি করতে এলে মেয়েমহল যে সরগরম হয়ে উঠত, স্বর্ণকুমারীর মায়ের হাতেও যে দিনান্তিক কাজকর্মের অবসরে একখানি গল্পের বই থাকত— এই সব কিছুরই সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধে। নিছক ধর্মশিক্ষা নয়, পণ্ডিতের কাছ থেকে সংস্কৃত শিক্ষা এবং অন্তঃপুরে আগত মেমের কাছ থেকে ইংরেজি শিক্ষার যে ব্যবস্থা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য চালু করেন, তার প্রমাণ পাই স্বর্ণকুমারীর লেখা 'সেকেলে কথা'য়। বাড়ির ছেলেরা যখন মহর্ষির একান্ত সান্নিধ্যে খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করত না, স্বর্ণকুমারী তখন স্নেহময় পিতার কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মের পাঠ গ্রহণ করতেন বলে জানিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল পারিবারিক বাতাবরণে স্বর্ণকুমারীর মধ্যে সে যুগের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় শিক্ষানুরাগ ও সাহিত্যবোধ অনুস্যূত হয়ে যায়, যার পরিণতি পরবর্তীকালের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যচর্চায়। স্বর্ণকুমারীর জীবনে অনুপ্রেরণার যিনি উৎস ছিলেন সেই মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁর সাহিত্যচর্চায় আরও একজন মনীষীর নাম উল্লেখের দাবি রাখে, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রসসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনিই যে স্বর্ণকুমারীর দীক্ষাগুরু, তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায়।

'আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।'[৩] সাহিত্যচর্চার এই অভ্যাসটি স্বর্ণকুমারীর বিবাহ-পরবর্তী জীবনেও অব্যাহত থাকে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর বিবিধ ও বিচিত্র সৃজনমুখী কার্যকলাপ। নারীকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণা স্বর্ণকুমারী অনাথ, অসহায় বিধবাদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য স্থাপন করেন সখিসমিতি, বিধবা শিল্পাশ্রম ইত্যাদি। এ দুটি কাজ যদি তাঁর সমাজসেবার প্রমাণরূপে গণ্য হয়, তবে তাঁর স্বদেশানুরাগ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ মেলে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে তাঁর যোগদানে। সাহিত্যসংসারে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত ১৮৮৪-তে 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে উপন্যাস, গল্প কবিতা ও প্রবন্ধে 'ভারতীর' ডালি সাজানো। মনে রাখতে হবে, স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনায় 'ভারতী' হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা এবং এমন দীর্ঘস্থায়ী, বৃহদাকার এবং বহুলপ্রচারিত মহিলা-সম্পাদিত মাসিকপত্র। 'ভারতী'র পাতায় যে প্রবন্ধগুলি তিনি লেখেন তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ তাঁর সমাজমনস্কতা তথা নারী-অবস্থান প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

যদিও বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য স্বর্ণকুমারীর সমাজ বিষয়ক কয়েকটি রচনা, তবু প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে, বিজ্ঞান বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াও পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার সাহস দেখিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে স্মরণীয়, আজকের যুগে তাঁর সরবরাহ করা বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূল্য হয়ত ততটা নয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সীমিত পরিসরের মধ্যে এক অভিজাত মহিলা একক প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে ওই সময়ে নারীর একমাত্র পঠিত স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পারিবারিক বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে প্রতীচ্য-প্রভাবিত জটিল বিজ্ঞানচর্চায় তন্নিষ্ঠ মনোযোগে অগ্রসর হয়েছেন, উনিশ শতকের নারীজাগৃতির ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রসরণ। প্রায় বিপ্রতীপভাবে স্বর্ণকুমারীর সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে আমরা দেখব, স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা, বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা, নারী-পুরুষের সমান স্থান— ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করলেও

পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে একমাত্র মেয়েদের নিজস্ব প্রয়োজনেই তাদের শিক্ষা জরুরি— এমন কথা একটিমাত্র ক্ষেত্রে ছাড়া স্বর্ণকুমারী অন্য কোথাও বলতে পারেননি, বরং শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত মা হওয়ার মধ্যেই যে স্ত্রীশিক্ষার সার্থকতা— এটি তাঁর রচনায় বার বার এসেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকে নারীমুক্তির ব্যাপারে চিন্তার যে স্ববিরোধ— স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু সে শিক্ষা হবে সংসারের উপযোগী শিক্ষা, নারীর স্বাধীন চিত্তাবৃত্তির উদ্বোধক পুরুষের সমান শিক্ষা নয়,— বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের বৈশিষ্ট্য, স্বর্ণকুমারী সাধারণভাবে মোটামুটি এই ধারণারই শরিক, যদিও দুটি একটি ব্যতিক্রমী রচনাও চোখে পড়ে। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পুরুষের সমাংশভাগিতা, সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর রচনায় অনালোচিত থেকে গেছে। ফলে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বললেও তাঁর রচনাগুলি নারীর অধিকার ঘোষণার জয়পত্র হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে শুভ্রবসনা, সংস্কৃতপটীয়সী শিক্ষাদানকারিণী বৈষ্ণবীর কথা স্বর্ণকুমারীর শৈশবস্মৃতিতে উল্লিখিত, সে আসলে প্রতিনিধিত্ব করত তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তঃপুরের আবেষ্টনীর বাইরে শ্রমজীবী এবং পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রবৃত্তিধারিণী উনিশ শতকের ভদ্রলোক-উপেক্ষিত অথচ লোকযাত্রায় গরিষ্ঠ এক স্ত্রী-শ্রেণীর। যে সময় ভদ্রসমাজ তাঁদের অন্তঃপুরিকাদের ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে সীমায়িত রাখাই উচিত বিবেচনা করতেন, সে সময়েও এই স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবী বা অশিক্ষিত নাপতিনীরা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছিল এবং ভদ্রপরিবারের অন্তঃপুরিকারা এদের কাছ থেকে কাহিনী, কথকতা ইত্যাদি শুনে মুক্তির স্বাদ পেত। স্বভাবতই ভদ্রশ্রেণী এই শ্রেণীর লোকসংস্কৃতিকে গ্রাম্য এবং এর প্রবক্তা মহিলাদের ব্রাত্য বলে মনে করতেন এবং তাঁদের অন্তঃপুরিকাদের এই প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। অভিজাত সমাজের মধ্যমণি স্বর্ণকুমারী বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান সম্পর্কে উল্লেখ করলেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের স্বাধীনবৃত্তিতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন— এমন কোনও প্রমাণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। অভিজাতবর্গীয়া নারীদের মুক্তি তাঁর অন্বিষ্ট ছিল বলে সমাজের পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে থাকা মহিলারা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। স্বর্ণকুমারীর নারী বিষয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তাঁর নারী-প্রসঙ্গে অবস্থানটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল' প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা যে বাংলাদেশে ক্রম-প্রসারিত হচ্ছে তাতে স্বর্ণকুমারী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যে শেষ বিচারে উপযুক্ত সঙ্গিনী প্রাপ্তির মাধ্যমে পুরুষেরই লাভ— এটিও স্বর্ণকুমারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'মহিলাগণ সুশিক্ষিত হইলে পুরুষদিগেরই যে সুখ সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রীলোকের মার্জিত রুচি, মার্জিত বুদ্ধি, মার্জিত জ্ঞান হইলে নিজের কর্তব্য যে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবেন, উপযুক্ত গৃহিণী, উপযুক্ত সঙ্গিনী, উপযুক্ত মাতা হইতে পারিবেন, পুরুষেরা ইহা যে কতকটা বুঝিয়াছেন, চারিদিক দেখিয়া তাহা মনে হয়।'[৪] অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে বুদ্ধিজৈবিক সমতা আনার প্রয়োজনেই স্ত্রীশিক্ষার চরিতার্থতা, মেয়েদের নিজস্ব বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব বা চিন্তাধারার স্ফুরণ লেখিকার কাছে ততটা গুরুত্ব পায়নি। সেই সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে মাতৃত্বের প্রশ্নটি, উপযুক্ত মা-ই কেবল সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারেন। স্বর্ণকুমারীর লেখায় আমরা ১৮৪৯-এ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 'স্ত্রীবিদ্যা' নামে একটি প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি শুনি:

'আমরা যাঁহারদিগের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংসায় প্রমত্তা। বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমাদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন, যখন তাঁহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভাল হইব? সুতরাং বিদ্যা দ্বারা তাহারদিগের ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে কুশল হওনের সম্ভাবনা।'[৫] দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষা বা নারীমুক্তি সম্পর্কে

সে যুগের সাধারণভাবে প্রগতিশীল চিন্তাধারারই শরিক ছিলেন, তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসরতা বা ব্যতিক্রমী কোনও চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। সামাজিক অনুশাসনের ভীতি কাটিয়ে উঠতে গেলে যে সাহসের প্রয়োজন বাঙালি সমাজে তার অভাব বলেও স্বর্ণকুমারী আক্ষেপ করেছেন। সামাজিক দুর্নামের ভয়ে বাঙালি অভিভাবক মেয়েদের ১০/১১ বছরের বেশি অবিবাহিতা রাখতে সাহস করেন না, যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের অভিযোগের অন্ত নেই। অথচ তাঁদের মিলিত সমবায়েই যে সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজ ভাঙাগড়া যে তাঁদের উপর নির্ভরশীল এই সহজ সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করেন না বলেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভয়ে সদাপীড়িত থাকেন। সাধারণ বাঙালি চরিত্রের মূল ত্রুটি লেখিকার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

বিবাহ-পরবর্তী সময়ে সংসারের কাজকর্ম ও অবসর-হীনতায় ক্লিষ্ট বাঙালি মেয়ের লেখাপড়া যে একেবারেই অসম্ভব, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত স্বর্ণকুমারী স্বামীর উপরও বিশেষ ভরসা রাখতে পারেননি, কারণ 'স্বামী হয় নিজের পড়া কিম্বা অফিসের কাজ লইয়া ব্যস্ত, ঘরে আসিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না স্ত্রীর মাস্টারি করিতে বসিবেন?'[৬] স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলাও যে স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব, স্বর্ণকুমারী এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত ছিলেন না, তবে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বর্ণকুমারী স্বীকার করে নিয়েছেন যে মেয়েরা প্রাক্‌বিবাহ সময়ে ১০/১১ বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যা শেখে, সেটাই তাদের বিদ্যাশিক্ষার একরূপ সীমা, বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে অসম্ভব। স্বর্ণকুমারী বাস্তব মেনে নিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন অবশ্যই, তবে সেই সঙ্গে বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার ওপরও যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, এটির উল্লেখ তাঁর রচনায় আমরা আশা করেছিলাম।

সেই সময়কার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি বিশ্লেষণ করে স্বর্ণকুমারী দেখিয়েছেন যে, সেখানে ইংরেজির অগ্রাধিকার, চতুর্থ ক্লাসের মত উচ্চ ক্লাসেও উচ্চ বাংলা শিক্ষার অভাব। এমনকি এ ক্লাসে বাংলাতে সহজ বিজ্ঞান-পুস্তকও একখানা পড়া হয় না। স্বর্ণকুমারী পাঠ্যসূচিতে বাংলার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন কিন্তু তিনি যখন লেখেন, 'ইংরাজি ভাষা বিদেশীয় ভাষা, পুরুষগণ কত পরিশ্রমে তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন না, আর বালিকাগণ ছেলেবেলায় একবার দু একখানা বই পড়িয়া যে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া যাইবেন— পাগলেই এরূপ মনে করিতে পারে।'[৭] তখন খুব সচেতনভাবে না হলেও অবচেতনে বা অচেতনে পুরুষের তুলনামুলক শ্রেষ্ঠত্ব যেন লেখিকার অভিমত বলেই মনে হয়। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দিলেই স্ত্রীশিক্ষার মূল যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হবে, স্বর্ণকুমারীর এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

প্রবন্ধের উপসংহারে জাতীয়তাবাদী স্বর্ণকুমারী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন যখন তিনি পাঠ্যসূচিতে রামায়ণ, মহাভারত অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেন। স্বদেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যে গৌরবদীপ্ত মানসিকতা উনিশ শতকের প্রতীচ্য শিক্ষিত বাঙালির ভাবজীবনের অঙ্গ ছিল, স্বর্ণকুমারীকে তার শরিক হিসেবে সহজেই এখানে চিহ্নিত করা যায়।

আসলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা সে যুগের সমাজ বাস্তবেরই প্রতিফলন। তবু এর মধ্যেও তিনি চেষ্টা করেছেন প্রচলিত গণ্ডীর বাইরে এসে নারীর আত্মমর্যাদার প্রশ্নে জোরালো যুক্তিবিন্যাস করতে। 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক একটি প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর নারীবাদী অবস্থান সে যুগের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক ডিলনৈর প্রচারিত পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক যুক্তিগুলিকে যে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় স্বর্ণকুমারী আক্রমণ করেছেন তা নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হাতিয়াররূপে গণ্য হতে পারে। আবার জে. রোমানিস যখন উদ্ভাবনী শক্তিতে পুরুষকে নারীর তুলনায় অনেক

বেশি শক্তিমান বলে মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে সহমত হয়েও স্বর্ণকুমারী অক্লেশে ঘোষণা করেন যে, যুগ যুগ ধরে শিক্ষার অধিকারে বঞ্চিত, পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত স্ত্রীজাতির উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটেনি। পুরুষের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার সমান অধিকার পেলে অবশ্যই স্ত্রীজাতি উদ্ভাবনী শক্তিতেও পুরুষের সমকক্ষ হবে।

'সখিসমিতি' প্রবন্ধে সমিতির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী যখন লেখেন, 'সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও স্থলবিশেষে অর্থ সাহায্য কবা— এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে অর্থাৎ অর্থের সুবিধা হইলে সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা'[৮] তখন লেখিকার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও নারীকল্যাণে তাঁর ঐকান্তিক সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলেও অব্যবহিত পরে যখন বিধবার ধর্মানুমোদিত বৈধব্যবিধি ও স্ত্রীশিক্ষা— দুটিকেই তুল্যমূল্য গুরুত্ব দিয়ে সখিসমিতির মাধ্যমে এই দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হওয়া সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন 'অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্যে জীবননির্বাহের সুবিধা পাইলে পুনর্বিবাহ না করিয়াও তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন। এইরূপে হিন্দু ধর্মানুমোদিত বৈধব্যাচরণের প্রতিও তাহাদের আস্থা জন্মিবে আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইবে।'[৯] তখন তাঁর রক্ষণশীল এবং শাস্ত্রানুগ অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈধব্যাচরণ শ্রেয়, তবে সেই সঙ্গে বিধবাদের স্বতন্ত্র জীবিকার প্রয়োজনে স্ত্রীশিক্ষা কাম্য— শাস্ত্রীয় নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নবীন মানসিকতার মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে মেয়েদের উপার্জনশীল ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিলেও তাদের পূর্ণাঙ্গ বন্ধনমুক্তির ধারণা তখনও পর্যন্ত স্বর্ণকুমারীর অনায়ত্তই থেকে গেছে।

'সখিসমিতি' প্রবন্ধে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গে ততটা সোচ্চার না হলেও পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ যে স্বর্ণকুমারী মনে-প্রাণে সমর্থন করতেন তার প্রমাণ মেলে 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা' প্রবন্ধে। নারীর ন্যূনতম সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ও মানবীয় অধিকার দানে আমাদের সমাজ যে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ, প্রবন্ধের শুরুতেই স্বর্ণকুমারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন: 'আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ, শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ বিধানে তাহার স্বার্থখড়্গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত। পশুদিগের দুঃখকষ্টে লোকের যে বেদনাটুকু আছে, স্ত্রীলোকের দুঃখে ইহাদের প্রাণ ততটুকু কাতর নহে।'[১০] বিধবাবিবাহের সমর্থনে হিন্দু পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে স্বর্ণকুমারী বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। প্রথমত, বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজের ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেবে বলে বিপক্ষীয়রা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, স্বর্ণকুমারী তা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যখন বিধবাবিবাহের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কোনও অনিষ্টপাত ঘটেনি, তখন বিধবাবিবাহ একমাত্র বাঙালি সমাজেরই দুর্বিপাকের কারণ হবে— এই যুক্তি হাস্যকর। বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়-বিপক্ষীয়দের এই দ্বিতীয় যুক্তিকে স্বর্ণকুমারী শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। শাস্ত্র কোনও অপরিবর্তনীয় বিধান নয়, মানুষের প্রয়োজনেই শাস্ত্র রচিত হয় ও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষে স্বর্ণকুমারী ঝলসে ওঠেন : 'বস্তুত নিজেদের নিত্যজীবনে যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাময়িক আত্মসুখের জন্য সনাতন শাস্ত্রবেচারার দৈনিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না, অনাথিনী বালবিধবার বিবাহ প্রস্তাব শুনিলেই যখন তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রক্তচক্ষু হইয়া চীৎকার করিতে থাকেন, তখন আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।'[১১] তবে সব বিধবা পুনর্বিবাহে আগ্রহী নয়, ইচ্ছুক বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় নারীর গৌরবময় ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ১৯৩০

সালের ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রীর যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, তাতে সন্তান পালনকেই নারীর সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্তব্যরূপে বিবেচনা করে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনে তাঁদের জননীদের তাৎপর্যময় ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন : 'নারীজাতির একটি প্রধান কার্য সন্তান গঠন করা অর্থাৎ তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা।... অধিকাংশ বড় লোকের জীবনে আমরা তাঁহার মাতার প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই।' দেখা যাচ্ছে, প্রতীচ্য ভাব-ভাবিত যথেষ্ট প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও মেয়েদের চিরাভ্যস্ত ভূমিকার বাইরে নতুন কোনও রূপে বা কর্মক্ষেত্রে দেখতে স্বর্ণকুমারী কিছুটা কুণ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রীপুরুষের কাজের ক্ষেত্রগত বিভিন্নতা বিষয়েও সতর্কতা লক্ষণীয়। যে মানসিকতা থেকে ১২৮০ বঙ্গাব্দের 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় লেখা হয় 'শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীরা, কন্যা, ভগিনী, ভার্যা ও মাতার পদের উপযুক্ত হইয়া সকল সম্বন্ধে কর্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং জনসমাজে তাহাদের নির্দিষ্ট ব্রতপালন করিবেন। ...সাধারণ স্ত্রী-জাতির পক্ষে অল্প উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃতির নিয়ম।'[১২] সেই একই মানসিকতার শরিক ছিলেন 'ভারতী'র মত প্রগতিশীল পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীও— এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। ১২৯৬-এর ভারতীতে 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র' নামে একটি অস্বাক্ষরিত চিঠি প্রকাশিত হয়। লেখাটির রচনাভঙ্গী থেকে অনেকে অনুমান করেন, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। মেয়েরা সব বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ— রমাবাইয়ের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে পত্রলেখক মত প্রকাশ করেন যে, সৃজনশীলতায় মেয়েরা কোনও মতেই পুরুষের সমকক্ষ নয়। দ্বিতীয়ত, পুরুষের অধীনতা স্বীকারকে মেয়েরা যদি ধর্ম বলে মেনে নেয়, তবে তাদের হীনম্মন্যতার শিকার হতে হয় না। যদিও পত্রলেখক নিজেকে স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী নন বলে জানিয়েছেন, তবু 'পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম'[১৩]-এটিও অনস্বীকার্য। এই চিঠির উত্তরে ১২৯৬-এর শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' স্বর্ণকুমারী 'রমাবাই' নামে যে প্রবন্ধ লিখলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে— এখানে একই সঙ্গে তাঁর রক্ষণশীল অথচ স্ত্রীপ্রগতিকামী মানসিকতা স্ফুট হয়েছে। লেখাটির সূচনাতেই পতিভক্তি অকর্তব্য নয় বা বিবাহবন্ধনের অর্থই পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি মত প্রকাশের মাধ্যমে রক্ষণশীল অবস্থান থেকে শুরু করেও রমাবাই-বর্ণিত নারীপুরুষের সমকক্ষতা প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী যখন বলেন '....এই সমকক্ষের অর্থ আমরা এই বুঝিয়াছিলাম, স্ত্রীলোক পুরুষের মত জ্ঞানধর্মে সমান অধিকারী, কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের জীবনে গুরুতর উদ্দেশ্য আছে— নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিতে তাহারও অধিকার আছে'[১৪]— তখন অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার যে তিনি স্বীকার করেন, এটি স্পষ্ট হয়ে যায়। উনিশ শতকে স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সংসারধর্মের উন্নতি সাধনের উপযোগী যে বিশেষ শিক্ষার কথা বলা হচ্ছিল, তা স্বর্ণকুমারীর প্রথম দিকের রচনায় সমর্থন পেলেও (স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল) তিনি যে ক্রমশ সেই অবস্থান থেকে সরে আসছেন তার প্রমাণ মেলে যখন রমাবাই-প্রবর্তিত শারদাসদনের শিক্ষাসূচির বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সেখানে সেলাই— বুনন ইত্যাদির পাশাপাশি কঠিন শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে- 'ব্যাকরণ, ভূগোলবিদ্যা, খপোলবিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়নশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, প্রাণিশাস্ত্র, ভূগর্ভশাস্ত্র, আরোগ্যশাস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকানুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।'[১৫] অর্থাৎ সমাজের পক্ষে ক্ষেমঙ্করী বলে যে বিশেষ স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা সেকালে নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার সীমাবদ্ধতা স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টি এড়ায়নি এবং সেই কারণেই ভারতী-র সম্পাদিকারূপে মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকে পত্রিকায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আসলে সামগ্রিকভাবে নারী-প্রশ্নে স্বর্ণকুমারীর অবস্থান একটু বিচিত্র। প্রগতিশীল

পারিবারিক বাতাবরণ, প্রতীচ্যশিক্ষা, অভিজাত মানসিকতা-জাতীয়তাবোধদীপ্ত রাজনৈতিক চেতনা এই মনস্বিনীকে একদিকে যেমন প্রাণিত করেছে 'ভারতী'র মত একটি সমাজমনস্ক পত্রিকা সম্পাদনা এবং বিজ্ঞাননির্ভর প্রবন্ধ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা পর্যন্ত নানা বিষয়ে অজস্র চিন্তাশীল রচনায়, তেমনি মেয়েদের ব্যাপারে যুগজীর্ণ সংস্কারধর্মী চিন্তার বশ্যতা থেকেও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। পুরুষতান্ত্রিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষিত পুরুষের মানসিক সঙ্গিনীরূপে নারীকে গড়ে তোলার জন্য যে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচলন উনিশ শতকে হয়েছিল, সেই ধারণার প্রতি সার্বিক সমর্থন না জানালেও এবং নারীর আধুনিক শিক্ষার উপযোগিতা ঘোষণা করলেও তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা তথা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কোনও বিশ্লেষণ বা প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যও স্বর্ণকুমারীর রচনায় অনুপস্থিত। আসলে চিরাভ্যস্ত অবরোধ প্রথার নিগড় ভেঙে বাইরের পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে শ্বাসগ্রহণ আর সেই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে সীমিত হলেও জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার একদা-দুর্লভ সুযোগ লাভকেই নারীর পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যের সূচনারূপে দেখেছেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর অভিজাত শ্রেণী অবস্থানের জন্য তথাকথিত ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করেছেন তিনি। সমাজের নিচুতলার মেয়েরা যারা অবরোধ প্রথার যুগেও জীবিকার স্বাধীনতা ভোগ করত, তারা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এইসব টানাপোড়েন, দোলাচলবৃত্তিতার মধ্য দিয়েই স্বর্ণকুমারীর যাত্রাপথের বিস্তৃতি। আধুনিক অর্থে নারীবাদী রূপে তাঁকে হয়ত চিহ্নিত করা যাবে না, তবু উনিশ শতকের নারীর স্বাধীন চেতনা উন্মেষের ঋত্বিকরূপে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন অবিসংবাদিতভাবেই।

টীকা

১. N Augustus Willard A Treating of the Music of India (1834)
২. উদ্ধৃত : পশুপতি শাশমল 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' (বিশ্বভারতী : শান্তিনিকেতন, ১৩৭৮), পৃ ৩৬
৩. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'গৃহ-সংস্কার, হিন্দুমেলা', 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (প্রজ্ঞাভারতী : কলিকাতা, ১৩২৬), পৃ ৪৫
৪. স্বর্ণকুমারী দেবী 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল' 'ভারতী ও বালক' শ্রাবণ, ১২৯৪
৫. 'স্ত্রীবিদ্যা', 'সংবাদ প্রভাকর', ৭.৫.১৮৪৯ পৃ ২
৬. প্রাগুক্ত, 'ভারতী ও বালক'
৭. তদেব
৮. স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখিসমিতি', 'ভারতী ও বালক' পৌষ ১২৯৮
৯. তদেব
১০. স্বর্ণকুমারী দেবী 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা', 'ভারতী', ভাদ্র ১৩১৬
১১. তদেব
১২. বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১২৮০, পৃ ৭৮-৭৯
১৩. অনামী ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬
১৪. স্বর্ণকুমারী দেবী 'রমাবাই' 'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৬
১৫. তদেব।

কৌতুকনাট্যে-প্রহসনে স্বর্ণকুমারী দেবী

সুমিতা ভট্টাচার্য

স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখনীর স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সমুদ্রের সকল শাখাই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর রচিত দুটি প্রহসন ও কৌতুকনাট্য গ্রন্থটি এই বহুমুখী প্রতিভারই উজ্জ্বল প্রকাশ-স্বরূপ। যদিও স্বর্ণকুমারীর পূর্বে সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারী-সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। স্বর্ণকুমারীর প্রতি অনুরূপা দেবীর শ্রদ্ধাঞ্জলির অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'তিনিই প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে নারীর শক্তিকে জাগিয়ে তুললেন, নারীর রচনাকে পুরুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধার করে শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের বস্তু করে নিলেন। তাঁর পূর্বে কোনও মহিলা লেখিকা একাধারে গদ্যে পদ্যে সমানভাবে তাঁর মত কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।'

কৌতুকনাট্য বা প্রহসন-রচনায়ও স্বর্ণকুমারী দেবী বহু কৃতী-লেখকের পরে আবির্ভূত হয়ে স্বমহিমায় বিশিষ্টতা অর্জন করলেন। প্রহসন-ব্যঙ্গজাতীয় সৃষ্টি-ভাণ্ডার রামনারায়ণ তর্করত্ন-খনিত ভিত্তিতে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নির্মাণ-কর্মকে একাধিক প্রহসনকার সাফল্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধিত করেছেন। ঠাকুরবাড়ির লেখকদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম প্রহসন রচনা করেন, তাছাড়া তিনি, গুণেন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে সম্মিলিতভাবে মজার সুরারোপে 'অদ্ভুত নাট্য' লিখেছেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। প্রহসন ও কৌতুকনাট্য সৃষ্টির প্রসারে 'বালক' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' কৌতুকনাট্য রচনার প্রথম বিশিষ্ট নিদর্শন। ইংরেজি শারাডের (charade) অনুসরণে একশ্রেণীর হেঁয়ালিনাট্যের আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছিল এই কৌতুকনাট্যগুলি।

কৌতুকনাট্য-প্রহসন জাতীয় সৃষ্টিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তুলনায় অনাবিল কৌতুক-বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস আর মার্জিত রুচির প্রকাশে স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় তো বটেই, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গতিময় রচনারীতিতে স্বকীয় হয়ে উঠেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী-রচিত হেঁয়ালিনাট্যগুলি 'ভারতী' এবং 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী'তে মুদ্রিত এই শারাড জাতীয় রচনার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নক্সা'। ১২৯৪ এবং ১২৯৫-তে প্রকাশিত রচনাগুলির নামকরণ হয় 'হেঁয়ালিনাট্য'; আবার ১২৯৮ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় এই জাতীয় রচনা মুদ্রিত হয় 'রহস্যনাট্য' শিরোনামে। পরিশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালে 'কৌতুকনাট্য' নামটি ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকুমারীর এই শারাডজাতীয় রচনাগুলি তাঁর 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা' (১৯০১) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়; গ্রন্থাবলীতে 'কৌতুকনাট্য' নামে এগুলি মুদ্রিত হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়ায় শারাড সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'charade is an amusement which consists in dividing a word into its component syllables or letters, predicating something of each and of the whole, and asking the reader or listener to guess the word.'

এই ধরনের নাট্যখেলা অনেকটা ধাঁধার মত এবং কখনও কখনও এগুলি অভিনয় করাও

সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত প্রথম হেঁয়ালিনাট্য প্রকাশের সময় যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, তাতে বলেছিলেন, 'ইংরেজদের 'শারাড' নামক একপ্রকার খেলা আছে, আমরা বাঙ্গালায় তাহাকে হেঁয়ালিনাট্য বলিলাম।'

'ভারতী ও বালক'-এর প্রথম সংখ্যায় হেঁয়ালিনাট্য বা শারাড বিষয়ে সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীর প্রস্তাবনা ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুসারী। হেঁয়ালিনাট্য সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী ও বালক'-এ মুদ্রিত একটি পত্র-প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়, 'অভিনয়ের মধ্য হইতে দর্শকদিগের হেঁয়ালিটি বাহির করিতে হয়। যেমন ধর, কথাটি পাহাড়; একজন সাজিলেন রোগী— তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙিয়াছে; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া টুপিয়া দেখিতে লাগিলেন, দর্শকেরা বুঝিলেন পাহাড়।'

স্বর্ণকুমারীর 'কৌতুকনাট্য' গ্রন্থে চৌদ্দোটি রচনা সঙ্কলিত হয়— লজ্জাশীলা, বৈজ্ঞানিক বর, লোহার সিন্ধুক, ষষ্ঠীর বাছা, চাক্ষুষ প্রমাণ, সৌন্দর্যানুরাগ, গানের সভা, ব্যাঘ্রসভা, গৌখানা, সূক্ষ্মার্থ, তত্ত্বজ্ঞানী, নিজস্ব সম্পত্তি, বিরহ বেদনা, সূক্ষ্ম ডাক্তারি।

আয়তনে সংক্ষিপ্ত এই রচনাগুলির বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায় নামকরণেই। যদিও শারাড বা হেঁয়ালি-নাট্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগুলি রচিত হয়েছে, তবুও হেঁয়ালি বা ধাঁধার সীমিত পরিধি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ায় রচনাগুলিতে সাহিত্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায়। তাই হেঁয়ালি বা রহস্য-নাট্যের পরিবর্তে কৌতুক-নাট্য নামকরণটি চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাখ্যায় পাঠক উপলব্ধি করে চিরন্তন ও সর্বজনীন শিল্পবোধসম্পন্ন এক সাহিত্য-ব্যক্তিত্বকে।

পূর্বসূরীদের মতই স্বর্ণকুমারীও সমকালীন সমাজ ও মানুষের রীতিনীতি-চিন্তাভাবনায় অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছেন তাঁর কৌতুকনাট্য এবং প্রহসন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে উৎসর্গীকৃত 'কৌতুকনাট্য' গ্রন্থের উপহার-পত্রে কৌতুকের সুরে বলা হয়, 'ধর স্নেহ-উপহার স্নেহময়ি রাণি!/রূপ বা নিরূপ মন্দ/গন্ধ কিবা হীনগন্ধ/সুর বা বেসুর ছন্দ আমার যা বাণী,/সকলি তোমার কাছে আদরের জানি।'

প্রথম রচনা 'লজ্জাশীলা'র পাদটীকা থেকে বিষয়বস্তুর সম্যক পরিচয় মেলে। সেখানে বলা হয়, 'উক্ত নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়, এই অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গ মহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অন্তরাবরণ পরিধান এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচিসঙ্গত, শোভন বেশভূষার অঙ্গাবরণে প্রয়াসী হইতেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যভাজন হইতে হইত।'

এই বিষয়টি শুধুমাত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত, সরস রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এক নিমন্ত্রণ বাড়ির অন্তঃপুরে তিন অল্পবয়সী বধূ সিদ্ধেশ্বরী, নিধিমণি আর কামিনীর বিশ্রম্ভালাপের বিষয় হল শশী বোসের বৌয়ের শাড়ির সঙ্গে জ্যাকেট পরিধান সম্পর্কে সমালোচনা। তাদের বিচারে নীলাম্বরী, নেট, পায়নাপল পরাই সঙ্গত সাজসজ্জার নিদর্শন। শশী বোসের বৌয়ের কাছে সিদ্ধেশ্বরীর নাকাল হয়ে রণে ভঙ্গ দেওয়ার মধ্যে নাটিকাটি সমাপ্ত হয়। এই অংশের নাট্যরস যেমন উপভোগ্য, তেমনই নিন্দুকদের মুখোশ খুলে যাওয়ায় প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনও আকর্ষণীয়। সিদ্ধেশ্বরীর 'মুখে এক রাশ রুজ পাউডার' দেখে শশী বোসের বৌ সকলের সামনেই কটাক্ষ করে, 'তোমার গাল দুটো অত লাল দেখাচ্ছে কেন? পিঁপড়ে কামড়েছে নাকি?' কিংবা, 'মুখে তোর খড়িপানা ও কি লেগেছে? মুছে দেবো?'

অন্য রচনাগুলিও একই রকম কুশলতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। 'বৈজ্ঞানিক বর'-এ নববিবাহিত, গ্রাজুয়েট বর বাসরঘরের রঙ্গরসিকতায় গম্ভীর মুখে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজে, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় কোর্টশিপ আর বিধবা-বিবাহের সমর্থনে। কিন্তু নুন দেওয়া পান খেয়ে প্রাণের আশঙ্কায় সমস্ত যুক্তিতর্ক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় বৈজ্ঞানিক বরটির। নবপরিণীতা

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তখন তার কাতরোক্তিতে 'প্রেয়সী! ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করিবে।' পাঠক অত্যন্ত কৌতুকবোধ করে যেমন, তেমনই স্বর্ণকুমারী-নির্দেশিত বক্তব্য-বিষয়ের তাৎপর্যও উপলব্ধি করে।

কপটতা, ভণ্ডামি, মিথ্যে পাণ্ডিত্যভিমান ইত্যাদির মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'সৌন্দর্যানুরাগ', 'সূক্ষ্ম ডাক্তারী', 'নিজস্ব সম্পত্তি', 'তত্ত্বজ্ঞানী'। 'সৌন্দর্যানুরাগ'-এ স্বামী তার ইংরেজি জ্ঞান-বিদ্যা স্ত্রীর কাছে অন্তঃসারশূন্য বাকচাতুর্যে জাহির করে তৃপ্ত হয়, মেয়েদের সৌন্দর্য রসজ্ঞানহীন বলে তাচ্ছিল্য করে। অথচ স্ত্রী তার ভগিনীপতিদের রূপের প্রশংসা করলে ক্রোধে আত্মহারা হয়। এই নাটিকাতে অহংসর্বস্ব সংকীর্ণমনা পুরুষজাতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশই শুধু উদ্দিষ্ট নয়, মেয়েদের অগ্রগতিতে পুরুষের প্রতিবন্ধকতা, অন্যায়ের সামনে স্বামীর নিষ্ক্রিয়তার প্রতি স্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশও বিশেষ লক্ষণীয়।

'সূক্ষ্ম ডাক্তারী'তে যাদবচন্দ্রের চিকিৎসা-বিধিতে যাবতীয় খাবার নিষিদ্ধ হওয়ায় তার বৌদি সুস্থতার বদলে ক্রমে কাহিল হয়ে পড়ে। 'নিজস্ব সম্পত্তি'-র নভেল-লেখক ব্রজবাবুর রচনায় আর কোনও গুণ না থাকলেও অপরের কুৎসা-প্রচারে বিশেষ পটুতা আছে, সেটাই তার 'যথার্থ নিজস্ব সম্পত্তি'। 'তত্ত্বজ্ঞানী' রচনায় গুরু প্লাটার্ক তার শিষ্যকে উপদেশ দেয় 'অহঙ্কারের বিসর্জনই সত্যজ্ঞান লাভের উপায়'। আর দাসকে প্রহার করতে করতে বলে, 'বৎস, দাস সর্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।'

ছাত্র ও শিক্ষকের দুর্বলতার প্রতি কৌতুকপূর্ণ মৃদু কটাক্ষ করা হয়েছে 'ষষ্ঠীর বাছা' আর 'চাক্ষুষ প্রমাণ' রচনা দুটিতে। প্রথমটিতে রয়েছে লেখাপড়ায় কাঁচা, অকালপক্ক ছাত্র নবীনের বাচালপনা, তা সত্ত্বেও তার মায়ের অন্ধ সন্তান-স্নেহের ছবি; আর দ্বিতীয়টিতে ফাঁকিবাজ, উদরসর্বস্ব শিক্ষকের কথা আছে, যে তার দুষ্ট প্রতিবেশী শ্যামলবাবুর প্ররোচনায় ছাত্রের নামে অপপ্রচার করতে দ্বিধা করে না। প্রথমটির কোনও কোনও স্থানে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক'-এর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

'লোহার সিন্ধুক'-এ কথা গোপনে অপারগ দুই অন্তঃপুরিকার অতি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে তাদের স্বভাবের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদেরই একজন নিজের স্বভাবকে লোহার সিন্ধুকের সঙ্গে তুলনা করেছে।

'ব্যাঘ্রসভা' আর 'গৌখানা' বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' জাতীয় রচনা-সদৃশ। স্বঘোষিত, উন্নত, উদার, স্বাধীন ব্যাঘ্র-সভাপতি ও সভ্যগণের বিক্রমের দৌড় ফড়িং শিকারে সীমাবদ্ধ। ব্যাঘ্রশ্রেণীর আড়ালে থাকা এই মানুষদের বুদ্ধি বিষয়ে রঙ্গ-কৌতুকের আরও পরিচয় মেলে 'সূক্ষ্মার্থ' আর 'গানের সভা'য়। গানের সুর-অর্থ গ্রহণে অক্ষম অথচ বুদ্ধি জাহিরে ব্যস্ত মানুষদের কী অপূর্ব চিত্রণ!

'বিরহ-বেদনা'র সদ্যবিবাহিত মতির আকুলতা-সন্দিগ্ধতা দশ বছরের বালিকাবধূর জন্য। যে খেলা করাতেই আনন্দ পায়, তাকে সম্বোধন করে মতি বলে, 'রমণী, তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী!'

শব্দ নিয়ে ধাঁধার খেলার তাৎক্ষণিকতায় নয়, মানবজীবনের অসঙ্গতিজনিত গভীর অর্থবাহী হাস্যরসের চিরন্তন আবেদনে পৌঁছতে সফল হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী কৌতুকনাট্য রচনার মাধ্যমে।

'কনে-বদল' আর 'পাকচক্র' প্রহসন দুটিতে স্বর্ণকুমারীর কৌতুক-প্রবণ শৈল্পিক মনের সম্পূর্ণ উদ্ভাস হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-নির্মাণে, পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্রচিত্রণে।

'কনে-বদল' ১৩১২ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয় আর গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয় ১৩ বৈশাখ। ১৩১৬-র বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে 'পাকচক্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৩১৭-র ফাল্গুনে।

প্রহসন দুটিতে কাহিনীগত ভিন্নতা থাকলেও বিবাহকে কেন্দ্র করেই উপজীব্য বিষয় রচিত হয়েছে। হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়েই বিষয় উপস্থাপনায় শুধুমাত্র প্রহসনের প্রচলিত রীতির অনুসরণই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল না, নিছক হাসি-কৌতুক-আনন্দে পাঠক মনকে পরিতৃপ্তি প্রদানে ছিল বিশেষ আগ্রহ। উৎসর্গ পত্র দুটিতে এই রকম নির্ভেজাল আনন্দ-উৎসবের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। 'কনে-বদল'-এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে 'হাসি-খুশি এ কৌতুক ক্ষণিকের খেলাটুকু/বিশ্রাম-আরাম শুধু-শুধু নব বল' আর 'পাকচক্র'-এর 'হাসিতে রচি দিলাম গছি—/এই, কৌতুক নব ধাঁধা' প্রথম পঙ্‌ক্তি দুটিতে লেখিকার মানসিকতা স্পষ্ট হয়।

দুই অঙ্কের মোট দশটি দৃশ্যে বিন্যস্ত 'কনে-বদল' প্রহসনের কাহিনী দুই বিবাহযোগ্য যুবক শ্রীধর গড়গড়ি আর শশীনাথ পাকডাশির অভিভাবক মনোনীত পূর্বনির্দিষ্ট পাত্রীদের বিবাহে আপত্তি-অনীহাকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। শ্রীধরের বৌদি তার বোন মালতীর সঙ্গে শ্রীধরের বিবাহ বহুদিন থেকেই স্থির করে রেখেছে। কিন্তু শ্রীধর 'ফরমায়েসি মেয়ে বিয়ে করতে' চায় না, সে তার বৌদিকে স্পষ্টই বলে, 'আমি চাই কোর্টশিপ্— প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ।... ১৪/১৫ বছরের মেয়েতে এরকম প্রেম হতেই পারে না। তুমি যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জানা একটি বড় মেয়ে দিতে পার, তবেই বিয়ের কথা বলতে এস।' শ্রীধরের এই সিদ্ধান্ত তো আধুনিক মানসিকতার পরিচয়বাহী। তাহলে অসঙ্গতি কোথায়? আসলে সাম্প্রতিককালে শ্রীধর মালতীকে চোখেই দেখেনি, উপরন্তু কল্পনায় বিভোর হয়ে তার মানসকন্যার সঙ্গে সে মিলন আকাঙ্ক্ষা করে, তাতে আতিশয্যের প্রকাশ অধিক। শশীনাথের সমস্যা শ্রীধরের বিপরীত। তার ইচ্ছে 'একটি ছোট মেয়ে— উঠতে বললে যে উঠবে, বসতে বললে যে বসবে' এরকম পাত্রীকে বিবাহ করবে। বিলেত যাওয়ার পূর্বে শশীনাথ চন্দ্রাবতীকে 'like' করায় বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন 'কুড়ি বছরের বুড়িকে' সে বিয়ে করতে নারাজ। যদিও বিলেত থেকে ফিরে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শশীনাথের দেখা হয়নি।

শ্রীধর আর শশীনাথের ভ্রান্ত ধারণা ও নির্দিষ্ট চাহিদার অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে স্বর্ণকুমারী সুকৌশলে কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। শ্রীধর আর শশীনাথের পরস্পর কনে-বদলের সিদ্ধান্তে, মালতীর সম্পর্কিত এক বোন অপরিণতবুদ্ধি রসমঞ্জরী বা ক্ষেপির আবির্ভাবে ঘটনা জটিল পথে অগ্রসর হয়। শ্রীধর-শশীনাথের কনে-বদলের পরিকল্পনাতেই মনের মধ্যে হাসি বুড়বুড়িয়ে ওঠে প্রথম দৃশ্যে, তা বিস্ফারিত হয় দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীধরের বৌদি ললিতার দেবরকে জব্দ করতে ক্ষেপিকে কনে সাজানোর পরিকল্পনায়। তৃতীয় দৃশ্যে চন্দ্রাবতীর দিদি প্রভাবতীও শশীনাথের জন্য ওই রকমই ছলনার আশ্রয় নেয়। পাঠক-মন পরবর্তীর ঘটনার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। পাত্রী রূপে ক্ষেপিকে দেখার পর শ্রীধর-শশীনাথের মোহভঙ্গ হয়। তারা মালতী আর চন্দ্রাবতীকে চাক্ষুষ দর্শন করে তাদের ভ্রান্তি অনুভব করে। কিন্তু তখনই তাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয় না। কারণ রসমঞ্জরীর পিতা হরিহরবাবু শ্রীধর আর শশীনাথের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার মেয়েকে পাকা দেখে বিয়ে না করার অভিযোগে। শেষ পর্যন্ত শ্রীধরের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি দরিদ্র ও নিরীহ মোসাহেব ভোলানাথ ক্ষেপিকে বিবাহ করায় সমস্যার সমাধান হয়। কাহিনীগত কুশলতার আর একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয় যেখানে শ্রীধর পাত্রীরূপে ক্ষেপিকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে বাঁচে। ক্ষেপি শ্রীধরকে বিকৃত উচ্চারণে 'আমি তোমা বই জানি নে'-কে বলে 'আয়ি তোয়া বই জানি নে' আর তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রীধরের কাতরোক্তি 'এই প্রেমালাপ! এ যে বিছার কামড়?' এই দৃশ্যে

পাঠকবৃন্দ অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ে। শশীনাথেরও একই দুরবস্থা ঘটে। তবে দক্ষ লেখিকা একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করেননি; কেবলমাত্র শশীনাথের অভিজ্ঞতা তার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে। শ্রীধরের কল্পনাবিলাসিতা, শশীনাথের আত্মসুখপূর্ণ সঙ্কীর্ণচিত্ততা. ললিতার চাতুর্য, প্রভাবতীর কৌশল, মালতীর সলজ্জতা, চন্দ্রাবতীর অভিমান-ক্ষোভ, রসমঞ্জরীর বোধহীনতা, ভোলাদাদার সারল্য ও রসবোধ পাঠককে আকৃষ্ট করে। চরিত্র-অনুধাবনে সহজ সরল স্বচ্ছন্দ সংলাপ বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

একাঙ্কের সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত 'পাকচক্র'-এর কাহিনীও বিবাহ সমস্যাকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে— পুত্র বিনোদের বিবাহকে উপলক্ষ করে কর্তা-গিন্নির মতান্তর ও পাকচক্রে তার অবসান। জনৈক হরিবাবুর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ঋণের কারণে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কর্তা পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য, অথচ গিন্নি সেই পরিমাণ টাকা নগদ হাতে না পেলে বিনোদের বিবাহে অসম্মত। অর্থ নিয়ে এই অনর্থ ঘটায় বিনোদ কাতরচিত্তে পিসি বরদার শরণাপন্ন হয়। গিন্নির বোনের শাশুড়ির সইয়ের পাতান মেয়ে শশীমুখীর ব্যবস্থাপনায় ও কর্তার ভগিনীপতির শ্যালকের পোষ্যপুত্র চন্দ্রকান্তের কৌশলে সমস্যার নিরসন ঘটে। শশীমুখী-চন্দ্রকান্তের প্রণয়-সম্পর্ক এরই মাঝে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। স্বর্ণকুমারী অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে শশীমুখী-বিনোদের গোপন শলাপরামর্শের দৃশ্য উপস্থাপন করে কাহিনীতে সামান্য জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। বিনোদ আর শশীমুখীর মধ্যে গোপন প্রণয়-সম্পর্ক কল্পনা করে নেওয়ায় কর্তা-গিন্নির ক্ষণিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। ঘটনায় সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে কৌতুকরসও আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

কর্তা-গিন্নির অর্থগত দুর্বলতা-জনিত অসংগতিকে মূলত এই প্রহসনে চিত্রিত করাই ছিল স্বর্ণকুমারীর উদ্দিষ্ট, উপরন্তু পণপ্রথা সম্পর্কেও লেখিকার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কর্তা তাঁর বিশেষ অনুগত চন্দ্রকান্তকে বলছেন, 'আমি হলুম উন্নতিবিধায়িনী সভার প্রেসিডেন্ট, কাগজে কলমে লিখে প্রতিজ্ঞা করছি, বিয়েতে টাকা নেবও না, দেবও না।' তিনি বাধ্য হয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে এখন মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

'কনে-বদল'-এর তুলনায় 'পাকচক্র'-এ পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্রচিত্রণ বিশেষ প্রশংসনীয়। সেকালের ঘটককুলের প্রতিনিধিস্থানীয় ঘটকীর 'বানরানাং কণ্ঠে গজমতিবৎ তরলং', 'মহাজনস্য যঃ পন্থা স গতা' প্রভৃতি প্রবাদবাক্যের অশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণে বিশ্বাসযোগ্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে চরিত্রটি। প্রধান চরিত্র না হয়েও শশীমুখীর সক্রিয় ভূমিকা ও কৌশল যেমন লক্ষণীয়, তেমনই চন্দ্রকান্ত সম্পর্কে দুর্বলতা এবং বড়লোকের ঘরনী হওয়ার ইচ্ছা— এই দুইয়ের টানাপোড়েনের ফলে তার দ্বিধাজড়িত মনের প্রকাশে অনেকের মাঝেও সে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

কৌতুকনাট্য বা প্রহসন রচনায় স্বর্ণকুমারীর সমাজমনস্ক, সহৃদয় চিন্তাশক্তির যেমন অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনই তাঁর নান্দনিক শিল্পবোধের স্পর্শও অনুভব করা যায়। মানবমনের অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য কাহিনী-চরিত্র-সংলাপের সার্থক উপস্থাপনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; কিন্তু প্রকাশভঙ্গি কখনই তীব্র বিদ্রূপ বা শ্লেষাত্মক নয় বরং তা মৃদু কৌতুকপূর্ণ। ঘটনার নাটকীয়তায়, গতিময়তায়, চরিত্র-রূপায়ণের স্বতন্ত্রতায়, কখনও সংলাপে আঞ্চলিক কথ্যভঙ্গি ব্যবহারে স্বর্ণকুমারীর রচনায় মৌলিকত্ব ও নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। সর্বোপরি নির্ভেজাল নির্মল হাস্যরস আস্বাদনে পাঠকমন প্রাপ্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'কাহাকে' : একটি বিস্ময়কর উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার

হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসের স্বভাবধর্মই হল নিয়ত চিত্তভূমিকে দোলায়িত করা। এমন উপন্যাসের সর্বাঙ্গ জুড়ে যদি একটি গীতরসমাধুরী আবেশে বিহ্বল করে, তবে তার রণন প্রশান্তির মধুরিমা আনয়নে সক্ষম। অথচ মহৎ উপন্যাসের লক্ষণ সঙ্কট-সংশয়ে মানবচিত্তকে দীর্ণ করা, নিরন্তর যাতনায় হৃদ্‌ভূমি চাঞ্চল্যে ভরপুর করে তোলা, যদিও জীবনের অর্থ যন্ত্রণার আবর্তে অবিরল ঘূর্ণন নয়, সেখানে স্নিগ্ধতার একটি প্রহর মানব-হৃদয়ের জন্য অপেক্ষমান থাকে। কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেখানে দগ্ধ চিত্তের পাশাপাশি কোমলতা বাসা বেঁধে থাকে। এই দ্বিবিধ উপন্যাসবৃত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল বিস্মৃতপ্রায় অথচ সময়ের চেয়ে অনেক পুরোগামী একটি উপন্যাস আলোচনাক্রমে— স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' সেই দুর্লভদোসর উপন্যাসের নাম। বৈদগ্ধ্য ও রুচির কোমলপ্রাণতার সহাবস্থানে উপন্যাসটির কেন্দ্রভূমি উদ্বেলিত। শিক্ষা ও রুচিবোধের যথার্থতা দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের পরিবেশ থেকেই স্বর্ণকুমারী লাভ করেছিলেন, তা-ই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সম্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। শিষ্টাচার, চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ তাঁর অন্তরে লালন করেছিল যে আবেশ ও অনুভূতি— সর্বদা তা-ই ঘিরে রেখেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বকে। বস্তুত এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিন্তায়, রচনায়, সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা—সর্বক্ষেত্রে। তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের উৎস এখান থেকেই লক্ষণীয়। তিনি তো অবহিত আছেন, 'A writer's pattern of choice is a function of his personality. But personality is not in fact timeless and absolute. However it may appear to the individual consciousness. Talent and character may be innate ; but the manner is which they develop, or fail to develop, depends on the writer's interactian with his environment, on his relationships with other human beings'[১]। রুচি ও পছন্দের সূত্রেই কী লিখবেন, কীভাবে লিখবেন, কেমন করে তৃপ্ত হবেন নির্ধারিত হয়ে যায়। বক্ষ্যমান উপন্যাসটির শুরুতেই বায়রনের উদ্ধৃতি দিয়ে নারীমনের অনুভূতির অস্তিত্বের দিকটি নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ইংরেজি সাহিত্যের যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব, তার দায় এড়ানো স্বর্ণকুমারীর মত সর্ব-অর্থে শিক্ষিতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই নব্য-শিক্ষিত নারী রোমান্টিক কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবেন এটাই স্বাভাবিক, উপন্যাসে সেই রোমান্টিক প্রেম-মূর্ছনা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব প্রণালী থেকে উদ্ভুত। তাঁর অভ্যস্ত জীবনাচরণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধের সঙ্গে তা সম্পৃক্ত, মননশীলতা ও দার্শনিক প্রত্যয় সমন্বিত হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ উপন্যাসের নায়িকার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাই ডিকেন্স স্বর্ণকুমারীর আরাধ্য না হয়ে জর্জ এলিয়টের দীপিত বুদ্ধিমার্গ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মনোরাজ্যের জটিল রহস্যময়তা প্রার্থিত চরিত্রে এনেও, একটি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল উপন্যাসের মাস-মজ্জায় ছড়িয়ে রেখে অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন। যে পরিশীলিত মনোলোক ও সঙ্গীতের সূক্ষ্ম তন্তু জালে জীবনকে সমাচ্ছাদিত দেখেছেন, তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ ও মনোজয়িতার আধার 'কাহাকে' উপন্যাসের আদ্যোপান্ত তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

উপন্যাসের নায়িকা মণি বা মৃণালিনীর হৃদয়-মন পরিবৃত হয়ে আছে রোমান্টিকতার বাতাবরণে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি সেই প্রেক্ষিত আবিষ্ট করে রেখেছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধ থেকে মণি তা আহরণ করেছিল। এ কারণে উপন্যাসের বহুতর অধ্যায়ে Romantic Revival-এর কবিদের উদ্ধৃতি অবলীলাক্রমে যোজিত হয়েছে। মণির ভগিনীপতি-দিদি, রমানাথবাবু, ছোটুর পরিবর্তিত রূপ ডাক্তার সকলেই এই মোহের আবরণে মোহগ্রস্ত। উপন্যাসের শুরু বায়রনের প্রেমভাবনার পরিচয় জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে, প্রসঙ্গত এসেছে Gray-এর Elegy written in the country churchyard-এর সুবিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, এমন একটি পৃষ্ঠা আছে যেখানে একাধিক Romantic কবিদের Love-poems-এর সমাবেশ ঘটেছে। শেলি লেখিকার প্রিয় কবি, অবশ্য বায়রন ভাষ্যে একাধিক বার এসেছেন, এমনকি Hamlet-এর প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তিগুলিও বাদ যায়নি। এসব কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে এসেছেন Mary Ann Evans বা George Eliot (১৮১৯-৮০) এবং তাঁর আটটি উপন্যাসের মধ্য থেকে কারও কারও মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Middlemarch (১৮৭১) উপন্যাসটি 'কাহাকে'-র একাদশ অধ্যায়ে বহুলভাবে আলোচিত। উনিশ শতকের প্রথমাংশে মিডলমার্চের প্রাদেশিক শহর, যেখানে সামন্তরালভাবে দুটি অসুখী প্রেমের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে, লেখিকা মিডলমার্চ বলেই ক্ষান্ত না হয়ে Middlemarch, A study of Provincial life বলে জানিয়েছেন। এই intellectual ঔপন্যাসিকের চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-ব্যাখ্যার প্রতি আসক্তি অধ্যায়টিকে উত্তপ্ত করেছে, হয়ত জর্জ এলিয়টের সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিবাহ ও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে বিষয়টি বাঙালির একসময়ের শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের মানুষকে বিচলিত করেছিল। Lewes-এর সঙ্গে তাঁর জীবনযাপন যাকে সুবিখ্যাত রসবিদ্‌ Douglas Jerrold রসিকতাচ্ছলেই 'the ugliest man is London' বলে বিবৃত করেছেন যদিও জর্জ এলিয়টও সৌন্দর্যের দিক থেকে উল্লেখ্য নন, কিন্তু বিবাহ বিষয় উল্লেখে Bloomsbury guide to English Literature-এ বলা হয়েছে. 'This was bold decision in view of the rigid opposition in the English society of the time to open unions, not legalized by the marriage ceremony'[২] —সময় এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার করেছিল। ডাক্তার এবং মণির দিদির মধ্যকার আলোচনার মধ্যে জর্জ এলিয়ট সম্পর্কে ডাক্তারের দুর্বলতা এবং দিদির দীর্ঘ কথোপকথনকে লম্বা-লম্বা লেকচারের প্রতি বীতরাগ এবং নায়িকার দুবার বিবাহকে আত্মত্যাগ বলতে নারাজ হবার প্রসঙ্গে ডাক্তারের উক্তির মধ্য দিয়ে উপন্যাস-বিষয়ে যেন স্বর্ণকুমারীর মনোভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় হয়, 'আপনারা হয়ত ভুলে যান নভেলিষ্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন। তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে—কিন্তু তাঁর প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর।...ডরথিয়া ideal রাজ্যেই বাস করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই অসাধারণ; সভ্য জগতের সংস্রবে এরূপ স্বভাবের লোক কিরূপ ভুল করে, লেখকতার ছবিতে তাই দেখিয়েছেন। তাব জীবনের এই failure-এর মধ্যেও কি খুব একটা pathos নেই?'[৩] মণির ভগিনীপতিও একসময় এসে বলেছেন জর্জ এলিয়ট সম্পর্কে 'Oh! She is a great creator. we must admit that. I am sorry to say'। এইভাবে দীর্ঘসময় ডিনারের ডাক না পড়া পর্যন্ত তর্ক-বির্তক চললো। যদিও এক প্রশান্তিতে আলোচনা সমাপ্ত হল, বঙ্কিমচন্দ্রের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে—আসলে 'কাহাকে' উপন্যাসটিই এক মহা প্রশান্তির আবাসস্থল, যা নিয়ত আবহের মত একটি সঙ্গীত ধুয়ার আকারে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে উপন্যাস-শরীরকে।

শ্রেণীচরিত্রের দিক দিয়ে 'কাহাকে' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেরই পর্যায়ভুক্ত। উপন্যাস শ্রেণী-নির্বিশেষেই কমবেশি মনস্তাত্ত্বিক, এর মধ্যে কোনও কোনওটি মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্য-নির্ভর। মনোজগতের জটিলতা, মানব মনের নানান দুর্মর প্রবৃত্তির সমাবেশে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রটি

স্ফুটতর হয়ে ওঠে। বহিঃজগত অপেক্ষা অন্তঃজগতকে বিশ্লেষণের দিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি অধিক। এই ক্ষেত্রে বিষয়ের চেয়ে চরিত্রের প্রাধান্য বেশি, গুরুত্বও বেশি, সূক্ষ্মতার পরিমাণও যথেষ্ট, মনের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ কখনও বা দুরূহও বটে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এই সূক্ষ্ম বিচিত্রধর্মীতার পটচিত্র অঙ্কনে সক্ষম। 'কাহাকে' উপন্যাসকে বিশ্লেষণের মধ্যে একই রীতি অনুসরণ লক্ষণীয়। মণি বা মৃণালিনীর অন্তর্জগতের দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধে হয় না রমানাথ বা ডাক্তার তার নারীহৃদয়ে খানিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রমানাথের প্রেম-সম্ভাষণ, ডাক্তারের অকৃত্রিম প্রীতিপ্রকাশ যৌবনবতী নারীকে এক ধরনের তৃপ্তি দেয়, সঙ্গসুধায় আপ্লুত রাখে— তাকে মণির আকাঙ্ক্ষিত মনেও হয়। কিন্তু নিজেকে উজাড় করে তাদের কারও হৃদয়-মনে সমর্পিত হতে দেয় না! আরও কোনও নিগূঢ় কামনা তার মনের অবচেতন স্তরে অপেক্ষমান থাকে, স্মৃতির অগম অতীত ক্রমাগত তাকে আকর্ষণ করে, তার স্বরূপ জানা-অজানার মধ্যপথে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। নিজের অন্তর্গত এ-রহস্যের কিনারা সে পায় না, বাল্যে একটি বালক তাকে মোহমুগ্ধ করে রেখেছিল, বাল্যের প্রহর পেরিয়ে গেলে তার স্মৃতি মুছে যাবার কথা, কিন্তু মণির জীবনের কোনও কোনও অনুভূতি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের কালে এসে পৌঁছল না। বাল্যের স্মৃতি তাকে কোনওকালে ছেড়ে যায়নি, একটি সঙ্গীতের আবেশ তাকে ঘিরে রেখেছে, এখান থেকে মৃণালিনী যে দূরে সরে থাকতে পারেনি তা বুঝতে দীর্ঘ সময় তার অতিবাহিত হয়ে গেছে। মণির মনোজগৎটি কল্পনাপ্রবণ স্মৃতিবহ, প্রীতি-শ্রদ্ধা ভালোবাসার সূক্ষ্ম বিভাজন তার অজ্ঞাত, শিশুকাল থেকে শ্রেষ্ঠতম উপহার পিতাকে দিয়ে সে তৃপ্ত হয়েছে, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এখানে অঙ্গাঙ্গী। দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা তার মনে উদয় হয়েছে এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় হাত পড়বে ভেবে, অথচ ছোটুকে অবলীলায় প্রিয় পুষ্পরাজি অঞ্জলি ভরে দিয়ে ফেলে, যা একান্তভাবে পিতার জন্যে আহরিত, এখানে কোনও প্রতিযোগিতার কথা আদপে মনেই হয়নি। সচেতন হয়ে নিজের স্ব-ভাবে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছে। নিজের অন্তর্গত রহস্য না বোঝার মধ্য দিয়েই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি অনুভূত হয়। মানসিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। মণি তাই নিজের বাসনালোকের প্রকৃত সংবাদ উপলব্ধিই করতে পারেনি। বস্তুত উপন্যাসটি সঙ্কট-সংক্ষুব্ধ নয়, কিন্তু অন্তরালে প্রবাহিত দ্বিধা ও সংশয়ের গোপন স্রোত লক্ষণীয়। এরই ডাক্তারী অসুখ হিস্টিরিয়া মণি যাতে মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হয়। উপন্যাসে কাব্য-সাহিত্যের অতিরেকের কারণ মনোজগতের বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব পৃথিবীর রূঢ় আঘাত এসে ধাক্কা দিয়ে গেছে উপন্যাসের বহিরাবরণকে তবু কাব্যিক অনুভূতিময় বাষ্প কোথাও উবে যায়নি। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সহাবস্থান উপন্যাসটিতে সহজেই দৃষ্ট হয়। Leon Edel-এর উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে যায়, 'We have observed that the novelists began as naturalist or realist and end as symbolists! In their pursuit of shady, dancing, flowing thought they invoke prose–and produce poetry!'

'কাহাকে' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে সমর্পণ-বাসনা, হৃদয় উৎসারিত ভাবাবেগের অঞ্জলি, পাত্র কে এবং 'কাহারা' একটু গভীরে না ঢুকে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। উপন্যাস শুরুর আগে 'উপহার'-অংশে কৃতজ্ঞ ভালোবাসা, প্রেমের সঙ্গে করুণার কথাটি উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রীতিময় পূজা ও প্রণতি জ্ঞাপনে লেখিকা পশ্চাদ্‌পদ হননি। কোনও কোনও ভালোবাসার কুসুমের সঙ্গে প্রীতি-কৃতজ্ঞতা প্রণতির সুগন্ধ মিশে থাকে, নিশ্চিতভাবে তার শ্রেণীনির্ণয় সম্ভবপর নয়। মণি নিজেকে উপহার দেবে কাকে, পিতার সঙ্গে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা মিশে অর্ঘ্য প্রদানের মধ্যে প্রীতির অংশ অনেকখানি, শ্রদ্ধার পরিমাণই বেশি, যখন চোখের সামনে সকাম প্রীতির কোনও পুরুষ নেই, দীপিত যৌবনে অনুরাগের ফাগটুকু মিশে যা একান্তভাবে কাম্য হয়

সে সকাম প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু নয়, এর অঙ্কুরোদ্গাম হয় কিশোর বয়সের প্রত্যন্তকালে, তা-ই পুষ্পশাখে বিস্তারে একটু একটু করে রামধনুর সাতটি রঙ দেখিয়ে দিতে সক্ষম, নিজের অজান্তে পুষ্প-উপহারের মধ্য দিয়ে ছোটুর মধ্যে তার বীজ রোপিত হয়েছিল। মধ্যে রমানাথ, ডাক্তার ইত্যাদির সঙ্ঘর্ষে প্রেমের ভিত্তিভূমি নিরূপণ অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, বারবার হৃদ্‌কমল থেকে বিস্মৃত গানের কলি স্মৃতির মধ্যে বারংবার আসা-যাওয়া করেছিল। নিজেকে বুঝতে চিনতে মানুষের অনেক সময়েই বহুকাল ব্যয়িত হয়ে যায়, স্ব-রূপকে মণিরও উপলব্ধি করতে দিনক্ষয় হয়ে গিয়েছিল প্রচুর। তাই 'কাহাকে' তনুমন সমর্পণ করবে ভেবে দিশে পায়নি বলে কেবলই সংশয়ের বৃত্তে পাক খেয়েছে। ব্যারিস্টার রমানাথের কাছে সব পেয়েছি দেশের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়েছিল, তবু সংশয়ের দুয়োরটুকু পার হতে পারেনি, দ্বিধাজর্জর হয়েই থাকতে হয়েছে। সমাধানের প্রান্তে এসেও নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, একসময় বুঝেছে স্মৃতির হারানো কলিটি বারবার ফিরে ফিরে এসেছে বলেই রমানাথের প্রতি সে ধাবমান হয়েছিল। চিত্ত ব্যাকুল হয়েছিল, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল ছোটুর মুখের গানটুকু শুনে, যেই সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে রমানাথকে লোষ্ট্রবৎ ছুঁড়ে ফেলে দিতে এক লহমা দেরি হয়নি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর ডাক্তারের মৃদু, কোমল প্রীতিবাক্য আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছিল, তার সান্নিধ্য কাম্য হয়েও উঠেছিল, তবু সম্পূর্ণত চিত্ত বিকাশপ্রাপ্ত হয়নি। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘোর কাটাতে পারেনি। বাবার আহ্বানে তাঁর স্নেহছায়ায় আশ্রয় পেতে চেয়েছে, না-দেখা তাঁর মনোনীত পাত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাঁচতে চেয়েছে, দ্বিধার পাহাড়টিকে অপসৃত করে মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হতে চেয়েছে। কী ছিল বিধাতার মনে মণির জানা নেই, প্রীতিঋদ্ধ ডাক্তার স্বপ্ন-জাগরণের সঙ্গী ছোটুর মধ্যে মিলিয়ে গেছে, শুভ সমাপ্তি ঘটেছে তার প্রেমের চাঞ্চল্যের। শ্রেয়কর্মের বাঁধা চিরকালের এ-মিলন বহু কাঁটার পথ পেরিয়ে তবেই সম্ভাবিত হয়েছে। মন স্থির করতে মণির সময় লেগেছে বিস্তর। স্টিমারের পথে বাবা যখন ছোটুর সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনার কথা বলেন, তখন বিস্ময়ের ঘোর তার কাটে না, 'যে আশা, যে কল্পনা অনেক দিন ধরিয়া হৃদয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সুখকর স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করিত, আজ তাহাই সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনায় সহসা বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম'— তবু বাবাকে পত্র লিখে জানিয়েছে, 'ইংলণ্ডেও এমন অনেকেই অবিবাহিতা থাকেন, থাকিয়া দেশের জন্য কাজ করেন। আমিও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই। আমি বেশ জানি, তাহাতেই আমার একমাত্র সুখ। বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করিবেন না।' মণির মনোলোক যারা জানেন, তারা বুঝেছেন বিবাহে অনীহা-প্রকাশ বিবাহ বা একজন প্রার্থী ও পুরুষকে একান্তভাবে গ্রহণের তীব্র ইচ্ছার বা আগ্রহের আন্তরিকতার অন্যরূপ জ্ঞাপনমাত্র। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে সরলা দেবীর বর্ণনার রূপান্তর ঘটেছে এখানে। তাঁর মা বলতেন, 'সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে'। মণির হৃদয়কন্দর দৃশ্যমান হলে এ কেবল কথার কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না, যেখানে সঙ্গীতের এই কথাগুলিই কেবল ক্ষোদিত আছে, 'হায়! মিলন হলো!/ যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।/ হাতে ক'রে মালাগাছি, সারা বেলা বসে আছি/ কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো,—/আসিবে সে বর-বেশে পরাইব হেসে,/বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো!/ আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা—/ কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল—/ হায় মলিন হোল!' সঙ্গীতের অনুষঙ্গে মণির মুখের দীপ্তি দেখে কিছু কম্‌প্লিমেন্ট শুনিয়েছেন রমানাথ— 'What a lovely colour ! It suits the complexion beautifully' বা 'I wish I was a painter to paint you like this'—ইত্যাদি, কিন্তু সঙ্গীতের মূর্ছনার বাইরে তার অস্তিত্ব মণির জীবনে অবশিষ্ট নেই, মণি কাকে চায়— এই দেহবিশিষ্ট রমানাথ না তার স্বপ্নের মূর্তি— 'কাহাকে' তার হৃদয় চায়—এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়।

স্বর্ণকুমারী উপন্যাস রচনা শুরু করেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, পৌঁছেছেন সামাজিক উপন্যাসে, উভয় শ্রেণীর রচনাতেই তিনি কবিত্বের অধিকারী, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি বঙ্কিম অনুসারী, অবশ্য সকল উপন্যাসকারের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকেই তিনি উচ্চাসন দেন, 'কাহাকে' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জয় ঘোষণা একই উৎস থেকে সঙ্গত। সামাজিক উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনায়, চরিত্রসৃজনে, কাহিনীবিন্যাসে তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন বাস্তব পটভূমির সঙ্গে তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যিক উপলব্ধি মিশিয়ে 'কাহাকে' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসের পশ্চাৎপটে তাঁর পারিবারিক, পরিশীলিত সাংস্কৃতিক মন ও রোমাণ্টিক স্বপ্নাতুর দৃষ্টির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত সমাজই প্রকৃতপক্ষে এখানে তাঁর বর্ণিতব্য কাহিনীর মৌলকেন্দ্র, নায়িকা মণির দিদি, ভগিনীপতি এবং তার পরিপার্শ্বের চরিত্রসমূহ সেই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। এখানেই স্বর্ণকুমারীর রচনার পরিবেশ সমাপ্ত হয়ে যায়নি, উচ্চশিক্ষিতের, উচ্চচিত্তের নারী-পুরুষের কথোপকথন বাতাবরণটি সৃষ্টি করেছে, লেখিকার মূল উদ্দেশ্য মৃণালিনীর মনোজগত বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত, সেই নারীর স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব জীবনবোধ, স্মৃতি ও স্বপ্নময়তার রহস্য নিবিড়তা পৃথক অস্তিত্বের সূচনা করেছে। সাঙ্গীতিক যে প্রতিভা বাল্যকাল থেকে স্বর্ণকুমারী অন্তরমধ্যে আহরণ করেছেন তার আবেশে মণির অন্তরলোককে অভিসিঞ্চিত করেছেন। একটি সঙ্গীতই বিভিন্ন পরিবেশে হৃদয়-রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। ঠাকুর পরিবারের সূত্রে সঙ্গীতের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে যার বিস্তার, রবীন্দ্রনাথ যার শীর্ষস্পর্শ— এককথায় সংস্কৃতি সঙ্গীতের পরিমণ্ডল থেকে উঠে এসেছেন বলে সঙ্গীতকে কেন্দ্রমূলে রেখে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসটিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্মের লেখিকা যদিচ মনে করেন, '...স্বর্ণকুমারী দেবীর চরম দুর্ভাগ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন,'[৫] রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর স্বপ্নসাধ পূরণ হয়েছিল একথা ভাবেননি, বোধ করি স্বর্ণকুমারীর প্রতিভাকে বিস্মৃত হওয়ার প্রসঙ্গটি উক্তির অন্তরালে বিরাজ করেছে। তথাপি বাংলা সাহিত্যের তথা উপন্যাসের তন্নিষ্ঠ পাঠক কিংবা গবেষক নিজের তাগিদে স্বর্ণপ্রসূ এ লেখনীর কাছে বারংবার ফিরে আসতে বাধ্য, এর পুরোগামিতা ও বৈদগ্ধ্যের কারণে। শতবর্ষ পূর্বের (জুলাই, ১৯৯৮) এ কাহিনী 'রোমান্টিক প্রেমকাহিনী মাত্র' নয়, উনিশ শতকের বিশিষ্ট মানসলোক অক্ষয় হয়ে আছে উপন্যাসটিতে। উত্তমপুরুষে; রোমান্টিক বাতাবরণে এবং নানান যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে নির্ভার মনের আলাপ আলোচনার সূক্ষ্মতা ফুটে ওঠার মধ্যে একটি নারীর হৃদয়-অন্তর্গত অনুভূতির নৈকট্যের উত্তাপ পাঠকের প্রাপ্য হয়ে যায়, যাতে উল্লেখযোগ্য কাহিনীবিন্যাস এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সময়ের খানিক আগেই যেন অনুভূত হয়— একথা হয়ত কেউ বিস্মৃত হতে পারেন না। পিতৃমাতৃপ্রেম, কিশোরের ভালোলাগা, দাম্পত্য প্রেম, ব্যক্তি-বিশেষে বিচিত্রতার আস্বাদন লাভ করা যায়, এক কথায় প্রেম-শ্রদ্ধা-সখ্য-দাম্পত্য একটি নারীর দৃষ্টির উদ্‌ভাষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— পরবর্তী বাংলা উপন্যাস 'কাহাকে'র ঋণে আবদ্ধ হতে বাধ্য, বিস্মৃতির সাময়িকতা পেরিয়ে ঔপন্যাসিকের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা-আনত হতে হয়, শতবর্ষের পরবর্তীকালের অর্ঘ্য গৌরবের কথা মনে রেখেই সম্পন্ন হওয়া বিধেয়।

গ্রন্থসূত্র

১. The Meaning of Contemporary Realism, George Luckacs, Third Impression, Pg 54

২. Edited by Marian Wynne-Davais, 1992 edition, Pg 484

৩. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী, বাণী রায় সম্পাদিত, পৃ ২৩২

৪. The Psychological Novel, 1900-1950 1st edition, Pg 185

৫. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী, বাণী রায় সম্পাদিত, পৃ ১

‘কাহাকে’ : জবানবন্দির যাথার্থ্য

প্রসূন ঘোষ

রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি যদি মৃত্যুর পর পুণ্যবলে পুরুষ বা নারী হবার স্বেচ্ছাধিকার পান, তবে পুনরায় পুরুষ জন্মই গ্রহণ করবেন। কেননা, ‘আমি যদি আমি না হয়ে আমার ন'দিদি হতুম তবে কি আমি এই আমি হয়ে উঠতে পারতুম? ন' দিদিও লিখতেন, প্রতিভা ছিল তাঁর; তিনি থেমে গেলেন।’[১] উনিশ শতকে অসাধারণ নমনীয় মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের এই ন' দিদি অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি সৃষ্টি করে যথাসাধ্য অবদান রেখে গিয়েছেন।

‘কাহাকে’ স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস—যেখানে উনিশ শতকের নারী জাগরণের প্রতিনিধি মৃণালিনী ওরফে মণি আত্মউন্মোচনে প্রয়াসী, ভালবাসার স্বরূপ সন্ধানে তৎপর। জীবনের প্রারম্ভেই সে ভালবাসতে শিখেছিল, তার পিতা ছিলেন সে কলাজগতের পরিচালক। এরপর শিক্ষায়তনের ছোটুর সঙ্গে পরিচয়, যার গান তাকে মুগ্ধ করে। কালপ্রবাহে দিদির বাড়িতে আর এক প্রেমিকের আবির্ভাব—ব্যারিস্টার রমা ঘোষ, তার মুখে সে শুনতে পায় সেই বাল্যসখা ছোটুর গাওয়া গান। নায়িকা দ্বিধান্বিত, বুঝতে পারে না, সে রমানাথকে ভালবাসে, না রমানাথের গান তার ভাল লাগে। তবুও রমানাথ ও মণি যখন প্রায় বাগদানে উন্মুখ, তখন রমানাথের স্বার্থবোধ ও অহঙ্কার বিমুখ করেছে মণিকে। সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে এক ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়। ডাক্তারের প্রতি প্রেম যখন পল্লবিত ও মুকুলিত তখন মণির সহৃদয় পিতা তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্বনির্বাচিত পাত্র বিনয়কুমার বসুর সঙ্গে পরিণয় দানে প্রয়াসী। ডাক্তার, ছোটুর সেই গান, পিতার স্বনির্বাচিত পাত্র—এই সমস্তর মধ্যে নায়িকা যখন দোলায়মান, তখন বিনয়কুমার, ছোটু ও ডাক্তার যে আসলে একজনই— এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটেছে।

সুতরাং, ‘কাহাকে’ উপন্যাসের কেন্দ্রে উনিশ শতকের শিক্ষিতা নারী মৃণালিনী আর মৃণালিনীর উপজীব্য তাঁর নিষ্পাপ প্রণয় তার সর্বাংশ আচ্ছন্ন ক'রে আছে, সমগ্র সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তার ভালবাসা। পাঁচমিশালি সংসারে নয়, অভিজাত পরিবারে তার জন্ম, বিলাতফেরত মানুষের আনাগোনা সেখানে। এই কারণে, গড়পড়তা বাঙালি পরিবারের সঙ্গে অমিলই বেশি, আর তাই যে বয়সে বাঙালি মেয়েদের বিয়ে সচরাচর হত সেকালে, সে বয়স অতিক্রম করেছিল মণি। যে সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কার সে সময় নারীদের রক্ত-মাংস-দেহ-মজ্জা জুড়ে থাকত, সে সংস্কার নায়িকার ক্ষেত্রে ছিল না। তার মত শিক্ষিতা শুধু উনিশ শতকে নয়—সব যুগেই বিরল, কেননা তার ব্যক্তিত্ব আছে। মণিও তাই প্রেম দিতে চায় না, প্রেম পেতেও চায়। প্রেমিক তার কাছে ‘নির্ভরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী’। অনেকটা যেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতই সে বলতে পারে— ‘করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা/ভালবাসা চাহে ভালবাসা’। কিন্তু লক্ষণীয়, সংস্কারহীনা এই নারীর চৈতন্যের

---

১. ‘গুরুদেব’—রানী চন্দ।

অতলান্ত গভীরে যে ঐতিহ্যের বীজ প্রোথিত, তা সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যই। প্রজাপতি স্বভাব নয়—একনিষ্ঠতার সঙ্গে প্রেমনিবেদনে প্রয়াসী সে।

তাই দেখি, মণির নিষ্পাপ প্রণয়কে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে প্রজাপতি-স্বভাব পুরুষ রমানাথ অন্য নারীর প্রতি আসক্তির কথা যখন গোপন থাকে না, তখন কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয় মণি। এই বেদনা যে কতখানি ভয়াবহ ছিল, তা তার জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া থেকেই উপলব্ধি করা যায়। উনিশ শতকী বিলেত ফেরত পুরুষরা যে একাধিক বিদেশি নারীর প্রেমে পড়ত এবং স্বদেশী প্রণয়ীকে মর্মবেদনায় জর্জরিত করত, সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। মৃণালিনীর প্রেমিক রমানাথ একাধিক বিদেশি নারীর প্রতি আসঙ্গলিপ্সাকে সাধারণ ঘটনা বলেই চাপা দিতে চেয়েছিল।

২.

'কাহাকে' উপন্যাসটি নায়িকার জবানবন্দিতে রচিত, এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' ও 'ইন্দিরা'-য় উত্তমপুরুষের রীতিতে অর্থাৎ আত্মকথন-রীতিতে উপন্যাসের কাহিনী বয়ন করেছিলেন। সুতরাং এদিক দিয়ে উপন্যাসের এই Style কোনও অভিনব Style নয়। কিন্তু তাই বলে, 'কাহাকে' ও 'ইন্দিরা'-র রীতিপদ্ধতি সম্পূর্ণত একও নয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের ঘটনাবহুলতা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসটিতে নেই। তা ছাড়া, 'ইন্দিরা'-তে যেখানে নায়িকা লঘুচপল ভঙ্গিতে প্রতিবেশকে রঙ্গমুখর করেছে, সেখানে 'কাহাকে'-র আদি অন্ত Serious ও গম্ভীর। আবার, 'রজনী' বিভিন্ন চরিত্রের জবানবন্দির সমবায়ে গঠিত, 'কাহাকে'-তে একজন নারীই আগাগোড়া বলে গিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে যেখানে লেখক সর্বজ্ঞ, চরিত্ররা তাদের হৃদয়ানুভূতি নিজ মুখে ব্যক্ত করেনি, বড়জোর সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে মাত্র, সেখানে 'রজনী' কিংবা 'ইন্দিরা'-তে চরিত্ররা স্বকীয় অন্তরের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে পেরেছে নতুন এই রীতির জন্য। কিন্তু তাহলেও, ঘটনার পর ঘটনার সংযোজনের ফলে স্বভাবতই চরিত্ররা নিজের মনের কথা তেমনভাবে প্রকাশ করার অবসর পায়নি। 'কাহাকে' উপন্যাসের নায়িকা আত্মমগ্ন, উপন্যাসের শিকড় তাই বাইরের জগতে নয়, অন্তরের জগতে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'আমি'-র দ্বারা বলা কাহিনীতে যে ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠার কথা, তা হল রচয়িতার সচেতনতার অভাব। এক্ষেত্রে বক্তা বা কথক অন্য চরিত্রকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত করতে পারেন না, অপর চরিত্রকে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁর বাহ্যিক কার্যকলাপের দিকেই নজর দিতে বাধ্য হন, কেননা অবচেতনের গভীর জটিলতাকে উপস্থাপিত করা অনেকাংশেই সাধ্যাতীত। ফলে, এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রায়শই কথক বা নায়ক-নায়িকা চরিত্রকে যেমন বাইরের জগৎ ও অবচেতনের গভীর জগৎ—এই দ্বিমাত্রিক করে উপস্থাপিত করার সুযোগ পান, অন্য চরিত্রগুলিকে তেমন দ্বিমাত্রিক করে গড়ে তোলার অবসর পান না। ফলে, উপন্যাসের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কথক চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি আধখামচা হয়ে যায়। এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য মহৎ স্রষ্টারা অন্য চরিত্রের ডায়েরি, চিরকুট, চিঠি, ফটোগ্রাফ কিংবা কারও মুখে শোনা কথা অথবা স্মৃতিচারণা, নেপথ্য থেকে শোনা কথা—প্রভৃতি ব্যবহার করেন এবং উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কোনও-কোনও সময় কথক চরিত্রকে প্রধান রূপে উপস্থাপিত করেন না, কোনও-কোনও সময় কথক চরিত্রকে প্রধান চরিত্র রূপে গড়ে তুললেও অন্যান্য চরিত্রকে উপেক্ষা করেন না, সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে তোলেন। উপরন্তু উপন্যাস-রচয়িতার একটি স্থির প্রত্যয়

থাকা সত্ত্বেও আপাত নিরাসক্ত ভঙ্গি প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রায়শই দেখা যায় ডায়েরি বা স্মৃতিচারণার প্রয়োগ। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিনয়পূর্ণভাবে নিজেকে আড়াল করে শচীশ ও দামিনীর কথাই বলতে চেয়েছে শ্রীবিলাস, নিজের কথা নয় (যদিও শেষপর্যন্ত নিজের কথা না বলে-ও থাকতে পারেনি), তাই কখনও সে শচীশের ডায়েরি ব্যবহার করেছে, বন্ধু শচীশের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরেছে, কখনও বা বলেছে যে সে শচীশ সম্বন্ধে দামিনীর মুখে শোনা কথাই বলছে। অবশ্য, 'কাহাকে'-র বিষয়টি ভিন্ন ধরনের, এখানে রচয়িতা বক্তা চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসাবেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন, অন্য চরিত্র বক্তা চরিত্রের প্রয়োজনেই এসেছে-গিয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই বক্তার মুখেই তার পিতার প্রতি ভালবাসার কথা শোনা যায়—এরপর পিতা চরিত্রটি আর কোথাও আসেনি, সবশেষে কথককে দিদির বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বাগদান করিয়ে দিয়েছে মাত্র। কিছু সংলাপ ব্যতীত দিদি ও ভগিনীপতির অন্য পরিচয় নেই। আসলে অন্যান্য পাত্র-পাত্রীকে জটিল ব্যক্তিসত্তা করে আঁকেননি ঔপন্যাসিক। অথচ, তিনি একবার পাত্র ব্যবহার করেছেন 'পর্দার আড়ালে শুনিয়াছি'—এই রীতি এবং বন্ধু চঞ্চলের সঙ্গে মণি একবার মাত্র কথা বলেছে। মনোজগৎ উদ্‌ঘাটনের দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়ত ঔপন্যাসিক এই সমস্ত কৌশলের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের দ্বারা বহুমাত্রিক ক'রে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। উপন্যাসে ডাক্তারের সঙ্গে রমানাথের পরিচয় ছিল, কুসুমও নায়িকা মণিকে জানত-চিনত। কিন্তু ডাক্তার রমানাথ, কুসুম প্রভৃতি পাত্রপাত্রী এক জটিল কাহিনীর অংশীদার হয়ে ওঠেনি—পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। রমানাথকে প্রেমিকরূপে মণির অনীহা, কুসুমের সঙ্গে রমানাথের বিবাহের কথা অথচ মণির সম্মতির অপেক্ষা, পরে মণির সঙ্গে রমানাথের প্রেম ও তাতে কিছু দ্বিধা; অবশেষে ডাক্তার ও ছোটুর এক হয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে উপন্যাসটি যেন সরল জীবনের ফটোগ্রাফ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর, এই সরল জীবনের সাক্ষী স্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে দিদি ও ভগিনীপতি, চঞ্চল ও কথকের পিতা।

অবশ্য, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, নায়িকা মণি উপন্যাসের আদ্যন্ত বিস্তৃত করে নিজ ভাবনা প্রকাশ করেছে এবং সেই ভাবনাই কাহিনীর জাল বুনে গিয়েছে। ফলে, উপন্যাসটি কাহিনীপ্রধান নয়, বঙ্কিম-উপন্যাস থেকে সরে এসেছে এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অভিমুখী হয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসে যেখানে চরিত্রের প্রধান হয়ে ওঠার ব্যাপারটি নেই, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সেখানে চরিত্রই সর্বেসর্বা। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চরিত্রের স্থিতিশীলতা নয়, গতিময়তা বা ক্রমবিকাশশীলতা কিংবা বেড়ে ওঠাই আসল। অথচ কী অদ্ভুত রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসগুলি, যেখানে চরিত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টির সঙ্গে কাহিনীনির্মাণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তাঁর যেসব উপন্যাসে চরিত্ররা নিজের কথা বলে গিয়েছে কিংবা যে উপন্যাসে কোনও চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের কথা নিজের মত ক'রে বলেছে সেখানেও কাহিনী ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিতে পর্যবসিত হয়নি। স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে'-তে নায়িকা মণির ছেলেবেলা থেকে বিবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত যে অধ্যায়—সেই বিস্তৃত অধ্যায়ে পিতার প্রতি ভালবাসা, সখার প্রতি ভালবাসা, পরিশেষে প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা অকপটে ব্যক্ত করেছে নায়িকা। কিন্তু কাহিনীর কক্ষপথ এমনই রৈখিক যে, সেখানে বৈচিত্র্য কম, জটিলতাও বড় অল্প। কাহিনীকারেরা চরিত্রের দিকে নজর দিয়েও মূল কাহিনীর সঙ্গে associate ও parallel কিংবা disassociate ও opposite কাহিনী বুনে উপন্যাসকে উপভোগ্য করেন। কিন্তু, 'কাহাকে'-তে স্বর্ণকুমারীর কাহিনী এমন, যেখানে প্রধানত একটিমাত্র চরিত্র, মূলত একটিমাত্র পরিবার। সুতরাং, উপন্যাস বিস্তৃত ও সুদূর

প্রসারী নয়। অবশ্য পটভূমিকে বড় না ক'রেও উপন্যাসের কাহিনীকে জটিল করা যায়— স্বর্ণকুমারী-পরবর্তীতে তা আমরা দেখেছি। 'কাহাকে'-তে ব্যক্তি-মনকে বড় করতে গিয়ে. ঔপন্যাসিক এদিকে নজর দেননি।

তাই দেখি, এক আশ্চর্য আকুতি ও আততির বশবর্তী হয়ে প্রেমিকার অনুসন্ধান এক অভিনব সময়েরই পরিচয় দেয়। বোঝা যায়, এই নারী বাঙালি হলেও এক মুখ ঘোমটা টানা বাঙালি নারী নয়, সমাজটাও নয় সংস্কার আঁকড়ে ধরা বাঙালি সমাজ।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলেও বিবাহের ব্যাপারে খুব উদারপন্থী ছিলেন না— তার প্রমাণ পুত্রকন্যার বিবাহ। তিনি কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন অল্প বয়সেই, পুত্রবধূরাও ছিলেন কমবয়সী। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের আগে অর্থাৎ 'নৌকাডুবি' রচনার আগে অবিবাহিত নারীকে উপন্যাসের নায়িকা ও প্রেমিকা হিসাবে উত্থাপন করেননি। অথচ, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, 'কাহাকে'-র নায়িকা ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করে, ইংরেজি ও বাংলা কবিতা মস্তিষ্কজাত করে। এমন শিক্ষিতা অবিবাহিতা নারীকে সেই রক্ষণশীল সমাজে প্রেমিকা হিসাবে গড়ে তোলা অপার সাহস ব্যতীত আর কী বলা যায়।

উনিশ শতকের অন্যান্য উপন্যাসে মূলত পুরুষ ঔপন্যাসিকরাই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে নারী চরিত্র এঁকেছেন। সেদিক দিয়ে তাঁদের উপন্যাসে নারীচরিত্র অঙ্কনে অনিবার্যভাবে আংশিকতা থেকে গিয়েছে। কেননা, একে উপন্যাসের সৃষ্টিই সবে মাত্র হয়েছে, তার উপর সেকালে নারীদের গতিবিধিও বড় সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালের লেখকদের বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেকালের নারীদের শুচিস্নিগ্ধ, কল্যাণীমূর্তি, তাদের সহানুভূতিপূর্ণ সত্তাকে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত নিপুণতায় পরিস্ফুট করেছেন। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে নায়িকা মণির আবেগব্যাকুলতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, সেকালের পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে সেই চিত্র সম্পূর্ণ নেই।

৩.

অবিবাহিতা এক শিক্ষিত নারীর ভালবাসা 'কাহাকে'-র উপজীব্য। পিতাকে দিয়ে যার অঙ্কুর, তা পুষ্পিত ও পল্লবিত হল ডাক্তার বিনয়কুমার বসুর মধ্য দিয়ে। ভালবাসতে গেলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়, কিন্তু ব্যথা পেতে হয়—নায়িকাও পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য চরিত্র যারা নায়িকার পাশাপাশি এসেছে তাদের সম্পূর্ণতা কোথায়! তারা সবাই তো প্রায় দ্বন্দ্বহীন। উপন্যাসের প্রথমেই নায়িকার স্মরণে এসেছে পিতা, ছোটু—যদিও দেখা মেলেনি তাদের। অথচ পরে তারাই এসেছে ঘুরে-ফিরে। অর্থাৎ showing নয়, telling রীতিই অবলম্বন করেছেন লেখিকা। রমানাথ, যে প্রেমিকের অন্যতম দাবিদার সে-ও প্রেম না পেয়ে কিংবা প্রেম না করে পালিয়ে গিয়েছে। তার মনের বেদনা আদৌ হয়েছে কি না বোঝা মুশকিল। অনুমান করা বৃথা নয়, রমানাথ হয়ত রক্তমাংসের মানুষ নয়, অন্য ধাতুতে গড়া, ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। উপরন্তু ছোটুকেও ঔপন্যাসিক নিয়ে এসেছেন অনেক পরে—উপন্যাসের প্রাক-অন্তিম মুহূর্তে। রমানাথ ও ছোটু উভয়ের মধ্যে প্রেমের প্রতিযোগিতা অসম্ভব ছিল না। অথচ, লেখিকা সেই প্রতিযোগিতা অঙ্কনকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই দেখি, ব্যারিস্টার ভগ্নীপতি ডাক্তারের কাছে রমানাথের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইলে ডাক্তার বলে উঠেছে, প্রসঙ্গটি ডিনার টেবিলে আলোচনা না করাই ভাল। একথা বলার মাধ্যমে ডাক্তার চরিত্রের মহত্তর দিকটি হয়ত উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন লেখিকা। এর ফলে ডাক্তার সামাজিক চরিত্র হিসাবে 'ভাল মানুষ' হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে, art-এর দিক দিয়ে কিছু অসম্পূর্ণতা

থেকে গিয়েছে। উপন্যাসটি 'মধুরেণ সমাপয়তে' হয়েছে— ডাক্তার মণিকে রমানাথ কুসুমকে বিয়ে করেছে। কিন্তু চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ও নিটোল হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন:, 'পাত্রপাত্রীরা তাদের সৃষ্টিকর্তার সুবিধেমত চলাফেরা করে।'[২] 'কাহাকে' উপন্যাসের চরিত্রগুলিও যেন লেখিকার হিসেবমত ঘোরাফেরা করেছে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছে। এই কারণেই, তাদের গতিবিধি বড় বেশি সীমাবদ্ধ। অবশ্য, ঔপন্যাসিক নায়িকার অন্তঃসত্তাকেই উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন, অন্য বিষয়গুলি তাঁর লক্ষ্যবস্তু ছিল না।

৪.

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলই মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই।...'[৩] তাঁর মতে, বাঙালি সমাজে আড্ডা নেই, কাজের প্রয়োজন ছাড়া নিছকই সমাবেশের বিরলতা লক্ষ্যগোচর। 'কাহাকে' উপন্যাসে কাজের প্রয়োজন ছাড়া চরিত্ররা মিলিত হয়েছে—অবশ্য সে মিলন চণ্ডীমণ্ডপীয় pattern-এ নয়, খাবার টেবিলে। ফলে, উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে polemic। polemic চরিত্রকে গতিময় করে, কাহিনীকে লক্ষ্যাভিমুখী করতে সহায়তা করে, সর্বোপরি উপন্যাসে বৈচিত্র্য আনে। অবশ্য polemic যেখানে চরিত্রায়নের প্রয়োজনে উপস্থাপিত হয় না, সেখানে চরিত্র নিছকই বাকসর্বস্ব হয়ে ওঠে, চরিত্রকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলে না। polemic-এর সাহায্যে চরিত্রকে গতিময় করে তুলতে গিয়ে মিতব্যয়ী ঔপন্যাসিক তর্ক থামিয়ে দেন, অবশ্যম্ভাবীভাবে আবহ কিংবা মুখ্য চরিত্রের খুঁটিনাটি বর্ণনার মাধ্যমে অর্থাৎ showing-এর সাহায্যে স্বতন্ত্র বাতাবরণ তৈরি করেন। উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটিকে—যার যত্রতত্র রয়েছে polemic-এর প্রয়োগ। কিন্তু, এই polemic 'গোরা' উপন্যাসটিকে মহৎ হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, উপভোগ্যতাকে বিন্দুমাত্র হানি করেনি। তাই দেখি, পরেশবাবুর বাড়িতে গোরা যখন বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপ করে হারানের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন গোরার কণ্ঠস্বব, সর্বোপরি সেই গৌরবর্ণের দীর্ঘ চেহারাটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অবশ্য, সচেতন লেখক তর্কের কিছু উল্লেখ করেই চলে যান অন্য প্রসঙ্গে। তর্ক চলছে, অথচ সুচরিতার অন্তরের কথাটুকুও শুনিয়ে দিলেন লেখক। অদ্ভুত মাদকতা ও মোহাচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয় পাঠক। আর এর ফলে, গোরা নিছকই বাকসর্বস্ব চরিত্র হয়ে ওঠে না, তার উষ্ণ রক্তস্রোত, প্রতিটি হৃদস্পন্দ, পানুবাবুর মূঢ়তা, সর্বোপরি সুচরিতার অন্তঃস্থলটুকু উপলব্ধি করে পাঠক। একই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট দেশ-কালটিও ধরা হয়ে যায় উপন্যাসে। এইভাবেই Polemic উপন্যাসে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কাহাকে' উপন্যাস সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন : 'ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক আছে...'।[৪] আমাদের মতে, উপন্যাসে তর্কবিতর্ক যৎসামান্যই, আবার সে তর্কবিতর্কে উষ্ণতাও তেমন নেই। কেবলমাত্র দশম পরিচ্ছেদে ডাক্তার ও ভগ্নীপতির মধ্যে জর্জ এলিয়ট সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা হয়েছে। গোটা উপন্যাস বাদ দিয়েও সামান্য এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মণি সাধারণ মেয়ে নয়, আলোচক চরিত্রগুলির পশ্চাদপটও মামুলি নয়। এই পরিচ্ছেদে Polemic-কে দীর্ঘস্থায়ী করেননি স্বর্ণকুমারী, তাঁর এই কৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়—'এই সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল, আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাদের বাগযুদ্ধ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়

২. 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য'—বুদ্ধদেব বসু।
৩. 'জীবনস্মৃতি'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ভাবিয়া আমরা মহাভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।—দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'তর্কটা এখন রেখে দিলে হয় না—ডিনারের ঘণ্টা পড়েছে।...' লক্ষণীয় আলোচনাকালে মুখ্য আলোচক চরিত্রদুটি ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রেরও মনের ভাব কেমন ছিল, তা পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য একথা বলতে হয় যে, 'কাহাকে'-তে এই ধরনের তর্কবিতর্ক আরও সংযোজিত হলে উপন্যাসটির দেশ-কাল ফুটে উঠত যথার্থভাবে।

তবে, এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, স্বর্ণকুমারী 'কাহাকে' উপন্যাসের ঘটনাধারাকে কোনও কোনও স্থানে সংলাপের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। ফলে, এই সমস্ত ঘটনাধারা প্রায় নাট্যায়নে পর্যবসিত হয়েছে। ঘটনাধারা visual হওয়ার ফলে চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠেছে। উপন্যাসে একইসঙ্গে বর্ণনার ব্যবহার, সংলাপের সংযোজন এবং polemic-এর ঠিক-ঠিক ব্যবহার উপন্যাসে বিমিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করে। এই অভিনব রূপনির্মিতির প্রচেষ্টা স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে'-তে দেখি, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

৫.

উপন্যাসের ভাষাকে উপন্যাসের অন্য উপাদানগুলি থেকে আলাদা ক'রে দেখা আংশিক দৃষ্টিকোণপ্রসূত। আত্মকথনরীতিতে লেখা উপন্যাসে ভাষার নির্মোহতা বজায় থাকে না অনেকসময়ই। অদ্ভুত মোহাচ্ছন্নতায় লেখক উপমার পর উপমা ব্যবহার করেন, বিশেষণের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করেন না, অলঙ্কারের আতিশয্য সম্বন্ধে সচেতন হন না, দ্রুততালে চালিয়ে যান ভাষাকে। 'কাহাকে'-র উপজীব্য প্রেম, বলাবাহুল্য সে প্রেম আবেগময়ই। এই আবেগ ভাষাতে-ও রয়েছে, কিন্তু লেখিকা মোহগ্রস্ত হননি। সহজেই বোঝা যায়, এ ভাষা তথ্যবহুল প্রবন্ধের ভাষা নয়, এ ভাষা কবির ভাষা, আত্মমুখীন তার রূপ। ঔপন্যাসিকের কল্পনামুখীন মন ভাষাকে আশ্চর্য সূক্ষ্ম করে গড়ে তুলেছে। এ ভাষা কৃত্রিম নয়— এর মৃদুপ্রবাহ, ছন্দস্পন্দ কানে শোনা যায়। নিজের মনের অকপট আর্তিকে প্রকাশ করতে গেলে ভাষায় flexibility-র প্রয়োজন, প্রয়োজন sophistication-এর। 'কাহাকে'-র ভাষায় রয়েছে আশ্চর্য সংযম— সে সংযম কী অলঙ্কার প্রয়োগে, কী শব্দ চয়নে। ভাব এখানে গম্ভীর, ভাষাতেও রয়েছে গাম্ভীর্য, যে গাম্ভীর্য সৌন্দর্যের হানি ঘটায়নি। গম্ভীর কোনও ভাবকে যখন কোনও কবি তাঁর অপরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেন, তখন সেই গাম্ভীর্যের মধ্যে সরসতা ও সজীবতা উপভোগ করা যায়। নিছকই ভাষার টানে অবলীলায় পাতার পর পাতা ওল্টানো যায়।

উনিশ শতকে প্রায় সমস্ত উপন্যাসই লেখা হয়েছে সাধুভাষায়। ঠাকুরবাড়ির ভাষা অন্যান্য রচয়িতার লিখিত ভাষা নয়— সে ভাষার সজ্জা ও সৌযম্য যোজনব্যাপী ব্যবধান তৈরি করেছে অন্যদের থেকে— এ অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। 'কাহাকে'-র ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ভাষা সাধু কী চলিত তা বড় নয়, এ ভাষা শিকড়হীন-বিচ্ছিন্নও নয়, এ ভাষার বড়গুণ এর বিস্ময়কর সামঞ্জস্য— সে সামঞ্জস্য তাঁর কবিসত্তা ও ঔপন্যাসিক সত্তার। লেখিকা কখনও নির্বিশেষে ভাবকে সবিশেষের উপর আরোপ করেছেন, কখনও-বা সবিশেষ ভাব থেকে নির্বিশেষে চলে গিয়েছেন।

'চোখের উপর খোলা কেতাব—যন্ত্রের মত হরফগুলি নিঃশব্দে আওড়াইয়া যাইতেছি, অথচ খানিক পরে, আত্মস্থ হইয়া দেখিতেছি, এক অক্ষরও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আসলে পড়িতেছি না, ভাবিতেছি, কিন্তু কী ভাবিতেছি তাহারও একটা ঠিক-ঠিকানা নাই; অস্পষ্ট, অসংযত বিশৃঙ্খল ভাবনা— মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ, কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কী, তাহার আকৃতি কিরূপ,

স্থিতিই বা কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যেই নাই। মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি পড়িতেছিল—উদার স্তব্ধ সৌন্দর্যদৃশ্যের মধ্যে আমার উদাসচিত্তে স্বপ্নের মত যেন, সহসা আবার তাহা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া পুস্তকে চক্ষু ফিরাইতেছিলাম। ঠুংঠুং করিয়া চারিটা বাজিল, আকাশে চাহিয়া দেখিলাম, সুন্দর লাল মেঘের শোভা; সমুদ্র মনে পড়িল এই প্রশান্ত, সুরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া কটকে যাইবার পথে ঝটিকা তরঙ্গিত যে ভীম সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়িল, কে জানে এ দৃশ্যের সহিত তাহার কী যোগ?'

লক্ষণীয়, উদ্ধৃতাংশের ভাষা মসৃণ, সাবলীল, শ্রুতিমধুর— অভিভূত করে পাঠককে। এখানে লেখিকা যেমন 'হৃদয়ঙ্গম', 'আত্মস্থ', 'সৌন্দর্যদৃশ্য', 'উদাসচিত্ত', 'প্রশান্ত', 'সুরঞ্জিত', 'ঝটিকা তরঙ্গিত' প্রভৃতি গম্ভীর শব্দ ব্যহার করেছেন, তেমনি 'ঠুংঠুং'-এর মত ধ্বন্যাত্মক শব্দও প্রয়োগ করেছেন। আবার 'খানিক'-এর মত চলিত শব্দ এবং 'কেতাব' এই বিদেশি শব্দ প্রয়োগের ফলে ভাষা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য, মনের ভাব এখানে serious তাই ধ্বন্যাত্মক ভাব পরিস্ফুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ। বলা বাহুল্য, বিশেষণগুলির অর্থ এক নয়। অবচেতন জগতের ভাবনা সজ্ঞান-চেতনার মত স্পষ্ট, সংযত ও শৃঙ্খলাযুক্ত নয়— এ ভাষা মনস্তত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রমাণিত সত্য। তাই, নায়িকার ভাবনাও এখানে 'অস্পষ্ট, অসংযত, বিশৃঙ্খল'। 'বাসনা', 'বিতৃষ্ণা', 'আগ্রহ' এবং 'স্থিতি', 'আকৃতি' প্রভৃতি সমধর্মী কিন্তু ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহারের ফলে ভাষা এখানে ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিতে পর্যবসিত হয়নি।

উপন্যাসে অলঙ্কারের বিরলতা লক্ষ করার মত। তবু, দু-একটি অলঙ্কার যা ব্যবহার করেছেন, তাতে নতুনত্ব আছে। যেমন,

১) 'যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয় ততক্ষণ নক্ষত্র দীপ্তিশালী, চন্দ্র উঠিলে কি তাহার আলো চোখে লাগে? ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়াই কুসুম মন পরিবর্তন করিয়াছে...'

২) 'একি অপরূপ রহস্য, জানি না, সূর্যের উদয়াস্তে পৃথিবী যেমন দ্বিমূর্তি ধারণ করে, উক্ত ভাবের উদয়াস্তে আমি সেই দুই আমি হইয়া পড়িতাম।'

'কাহাকে' উপন্যাসের সংলাপ চলিত ভাষায় লিখিত। এক্ষেত্রে দু-এক স্থানে সামান্য ত্রুটি আছে— যেমন কখনও-কখনও 'নেওয়া'-র স্থানে 'লওয়া', 'সঙ্গে'-র পরিবর্তে 'সহিত' শব্দ ব্যবহৃত। তবুও ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি উপন্যাসে এই ধরনের সংলাপ ব্যবহার লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে সন্দেহাতীতভাবে।

"দিদি যখন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তার সঙ্গে কি কথা হ'ল' তখন বিবাহ করিতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি বলিলাম 'বুঝেছি, তাকে বিয়ে না করে কোন দোষ করেন নি।"

'তোকে যে খুব ভালবাসে, তাও বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।'

'এখন বিয়েতে আপত্তি আছে কি ?'

বলিলাম 'না'।

দিদি ভারী খুশী হইয়া বলিলেন, 'এক হপ্তা পরে সে আসবে—না?'

দিদি-বোনের এই কথাবার্তায় মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক, ফলে তা অস্বাভাবিক লাগে না আমাদের কাছে। নায়িকা লরেটো কনভেন্টে পড়েছে, তার দিদিও ইংরেজি উপন্যাস পড়েছে। তবুও সংলাপকে স্বাভাবিক করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মণি বা তার দিদি যখন নিজেদের মধ্যে বা অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে অথবা পিতার সঙ্গে এমনকি ভগ্নীপতির সঙ্গে কথা বলে তখন তাদের ভাষায় ইংরেজি বাক্য দেননি। আবার, রমানাথ, ভগ্নীপতি বা ডাক্তার

যখন কথা বলে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা-ইংরেজির দো-মিশালি ভাষা ব্যবহার করে। সে সংলাপও অস্বাভাবিক মনে হয় না, কেননা তারা সকলেই বিলাত থেকে ঘুরে এসেছে। উপরন্তু, এই ধরনের সংলাপ থেকে সেকালের ইঙ্গবঙ্গ সমাজটিকে ধরা যায়। শুধু তাই নয়, নায়িকা তার জবানবন্দি যে ভাষায় দিয়েছে আর সে সংলাপ যে ভাষায় বলেছে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে— সাধু ও চলিতের পার্থক্য ছাড়াও একটি আবেগপূর্ণ, অন্যটি প্রাকৃত শব্দের ব্যবহারে ঘরোয়া। কেবল ডাক্তারের কয়েকটি সংলাপ 'her master's voice'-এ পরিণত হয়েছে, যখন সে জর্জ এলিয়টের উপন্যাস আলোচনা করেছে। তবে, অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ ও লেখিকার বক্তব্যের ভাষা স্বতন্ত্র, 'her master's voice' নয়। ভাষার এই বৈচিত্র্য স্মরণে রাখার মত।

তবে, ভাষায় লেখিকার কৃতিত্বকে স্বীকার করেও বলতে হয় যে, এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। পাঠককে সম্বোধনের রীতি থেকেই তার নজির মেলে। যেমন 'অনেকেরই সংস্কার আছে, পিতৃমাতৃপ্রেম ও দাম্পত্যপ্রেম পরস্পর নির্লিপ্ত পৃথক দুই বস্তু। একের সহিত অন্যের তুলনাই অসঙ্গত, অসম্ভব। তুমি আমার সহিত মিলিবে কিনা জানি না, আমার কিন্তু ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।'

৬.

'কাহাকে' উপন্যাসে একটি গান আছে। গানটি উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে। কোনও কথা, বিশেষত গান বা কবিতার কোনও কথা বা কোনও দৃশ্য স্মৃতিকে ধরে রাখতে সহায়তা করে, বেদনামূলক অতীতকে বারবার মনে পড়ায়— একথা মনস্তত্ত্ববিদরাই বলেছেন। 'কাহাকে' উপন্যাসের গানটি নায়িকা মণির মনোজগৎ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছে। দিদির বাড়ীতে রমানাথ গানের প্রথম কয়েক কলি গাইলে বাল্যসখা ছোটুর কথা মনে পড়েছে মণির, যার ফলে পরবর্তীতে ছোটুর কথা অনায়াসেই বলতে পেরেছে মণি।

লক্ষণীয় উপন্যাসের প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত গানটির সম্পূর্ণ গাওয়া হয়নি। ছোটুই গানটি সম্পূর্ণভাবে গেয়েছে—উপন্যাসটিও প্রায় তারই সঙ্গে শেষ হয়েছে (এরপর শুধু 'উপসংহার' আছে)। আসলে, বৈষ্ণবসাহিত্যে যেমন প্রেম বৈচিত্র্যময়, তা স্বতঃই নিত্যনবীন, তেমনি 'কাহাকে'-তেও ঔপন্যাসিক জীবন্ত করতে চেয়েছেন প্রেমকে। তাই গানটিও শেষ হয়েছে এইভাবে—

> 'শুভক্ষণে ফুলহার, পরান হোল না আর
> হাতের সুগন্ধি মালা হাতে শুকাল;
> নিশিশেষে আঁখি মেলে, বাসি মালা দিনু গলে,
> মরমে বেদনা নিয়ে নয়নে জল।
> হায় মিলন হোলো !'

অংশটিতে মিলনের মধ্যেও বিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই জন্যই বলা হয়েছে 'বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো!' এই বিষাদময়তা, বেদনাবিধুরতা রোমান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে রোমান্টিক নায়িকার প্রেম অন্বেষণকে সমগ্র ও সম্পূর্ণ করেছে গানটি।

প্রসঙ্গের যবনিকা টানার আগে বলব, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'বাল্যপ্রণয়ে বুঝি অভিসম্পাত আছে।' বাল্যপ্রণয় মাত্রেই যে অভিসম্পাত নেই, স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' উপন্যাস পড়ে পাঠক-পাঠিকারা সে সান্ত্বনাটুকু লাভ করতে পারেন।

‘কাহাকে’ ও তার ইংরেজি অনুবাদ

অম্বরীষ রায়

১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘কাহাকে’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি তিনি নিজে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন, যা ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে ‘An Unfinished Song’ নামে লন্ডনের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি বিদেশি সমালোচকদেরও যে ভাল লেগেছিল তার প্রমাণ সমকালীন কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ‘Clarion’ লেখে ‘Remarkable for the picture of Hindu Life......’; ‘West Minster Gazette’-র ভাষায় ‘Mrs Ghosal ... is well qualified to give this picture of a Hindu maiden development.’ এর দ্বিতীয় সংস্করণও ওই কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এটা নিশ্চয় তাঁর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ। তবে আর যাই হোক, বিদেশি পাঠকের কাছে নিজের উপন্যাসের স্বকৃত অনুবাদ নিয়ে তাঁর দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথের বোধহয় মনঃপুত হয়নি। রোটেনস্টাইনকে লেখা তারিখবিহীন একটি চিঠিতে তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন এই ভাষায়:

‘She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities ... Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literacy agents in London... I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light.’

চিত্রা দেব[১] ধারণা করেন এই চিঠি খুব সম্ভবত তখন লেখা যখন ‘কাহাকে’ উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। ‘কাহাকে’ স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাইঝি শোভনা দেবীও অনুবাদ করেন। ‘To whom’ নামে এটি কলকাতা থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। ইংরাজি অনুবাদে উৎসর্গ পত্রটি (‘উপহার’) বাদ পড়েছে ও ‘Preface’ যুক্ত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ উভয় ক্ষেত্রেই শুরু একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তারপর মূলে আছে : ‘এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষ।’ অনুবাদে ‘পুরুষের’ স্থলে হয়েছে ‘a great man’ (পার্থক্য/বিশেষণ প্রয়োগে)। ‘তখন আমার বয়স কত?’ (মূলের) অনুবাদ হয়েছে ‘What was my age when love first came?’ এবং তারপর ‘I do not know the day and year of my birth’ মূলে পাই ‘সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না’—যা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুর বাক্য-র অর্থানুগ। মূলে ‘একবার একখানা গানের খাতার কোণে তারিখটা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম...’। অনুবাদে হয়েছে : ‘Once I found among a pile of waste paper an old note book of my father's in which the dates of these important events were recorded. I tore out the page containing the record and pasted it in the corner of my song book...’ বাবার খাতার উল্লেখমাত্র মূল বাংলায় নেই, আরও নেই ওই সব নানাবিধ কার্যকলাপের বিবরণ। এই একই পরিচ্ছেদে ‘১২৮৩’ বঙ্গাব্দের খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর— ‘1882 or 1883’ (ইং অনু) সাধিত হয়েছে। ‘কানে কানে’ কথা বলা সম্পর্কের যে ঘনিষ্ঠতা বা নৈকট্যের ইঙ্গিত করে, অনুবাদে তা লক্ষ্য করা যায় না— ‘I would question’। অনুবাদে

---

১. ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ, কলি-৯ (২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭)।

এরপর একটি সম্পূর্ণ নতুন কথা পাই, যা মূলে নেই — 'I still remember the many ways in which I used to show my solicitude for him.' তাঁর অনুবাদের অন্যতম একটি রীতি হল জটিল বাক্যকে ভেঙে শ্রুতিমাধুর্যের প্রয়োজনে পরপর ছোট ছোট বাক্য সাজিয়ে যাওয়া; যেমন: 'শীতকালে বাবার গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকিলেও আমার গায়ের ছোট রুমালখানি দিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে না ঢাকিতাম, ততক্ষণে মনে হইত, তাঁহার শীত ভাঙ্গিতেছে না।'— 'If it was cold in winter, his warm clothing was insufficient to keep him warm, it required my little shawl to cover him and protect him from the cold.' মূলে 'জেঠাইমা'-র বাড়িতে আদপে কী ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে লেখিকা নীরব। কিন্তু ইংরাজি অনুবাদের মাধ্যমে বর্ষীয়ান এই আত্মীয়ার সাবেক ভারতীয় পরিবারে কী ভূমিকা ছিল তা নতুন পাঠককুলকে অবহিত করতে বলেছেন, 'My poor widowed aunt who superintended our household...' শৈশবের যে সময়টা লেখিকার বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তখন তিনি যে পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা ('at most five years old')– তা আমরা জানতে পারি ইংরাজি অনুবাদ থেকেই। 'যৌবনের বহু পূর্বে শৈশবের বাবার এ ভালোবাসার ভাগীদার জুটিয়াছিল'—ইংরাজী অনুবাদের এইখানেই পরিচ্ছেদ বিভাজন ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনা; বাংলায় কিন্তু এইখানে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়নি।

মূলে বলা হয়েছে বাবা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু অনুবাদে 'Service under Government' বলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল যে জমিদার কৃষ্ণমোহন বাবুর বাড়ীতেই বসত, সে খবর ভাষান্তরে আসে কিছু পরে, 'ছোটু'-র পরিচয়সূত্র ধরে। ছোটুর গান শুনে প্রভা বলে—'ছোটু গান করছে, এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি, তা'পর শিখে গিয়ে বলব, কেমন শুনে নিয়েছি।'—ভাষান্তরে দাঁড়িয়েছে : 'Listen', she said, 'Chotu is singing. Let us wait and hear him awhile, and after we have learnt what he sings, we will tease him and sing the song before him.'

ইংরেজি অনুবাদে স্বর্ণকুমারী সর্বদা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। থিয়েটারে রাজার ছেলের হাতে তরবারি যে নকল, তা ভাষান্তরে নির্দিষ্ট করে বলেছেন : 'wooden sword', পরী ও উপন্যাস ইংরেজিতে হয়েছে 'houris' এবং 'romance' ('fairies' এবং 'novel' নয়)। অনুবাদে 'Chapter 3' শুরু হবার আগে 'Chapter 2' এর শেষ বাক্য হল 'After two years my father was again transferred and about that time my sister's marriage took place.' তাঁর পিতার কোথায় বদলি ও নিজ চেষ্টায় কি না, যা বাংলার উক্ত, সে খবর ভাষান্তরে নেই।

আবার কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদে মূল তার ইঙ্গিতময়তা ও রহস্য হারিয়ে ফেলেছে, যেমন 'টেপা হাসি' হয়েছে নিছক 'Smile'। সংস্কৃত উদ্ধৃতি অনুবাদে নেই। যেমন 'ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ' — এই উদ্ধৃতিটির একটি working meaning ভাষান্তরে পাই। 'কর' পরিবার অনুবাদে হয়েছেন 'Mullick'। মূলের মি. ঘোষ ভাষান্তরে হয়েছেন Mr. Roy। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে নিজেদের মধ্যে অনেকেই বহু সময় ইংরাজিতে বাক্যালাপ করেছেন। কিন্তু ভাষান্তরের সময় মূলের ইংরাজি যথাযথ রক্ষিত হয়নি। মি. ঘোষ-র উত্তর এসেছে, 'I refused them so many times before, that I had not the heart to do so again, so sorry–but did you really expect me? If I had only known it, I would have sacrificed a thousand—' (মূলে)। ইংরাজি অনুবাদে ওই একই কথা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে, 'I had refused them so often,' he continued, 'that I had not the heart to do so again. Did you really expect me? If I had known that I would sooner have sacrificed a thousand Mullicks.'

মূলে এক জায়গায় বাঙালি পোষাক 'শাড়ী'র প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু অনুবাদে এই পোষাকের উল্লেখ পাই না। মূলে ও ভাষান্তরে একটি গান ঘুরে ফিরে আসে। মূল বাংলায় এই গানের অন্তিম তিন চরণ হল:

'আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা—
কেমনি কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল—
হায় মলিন হোল!'

এই তিন চরণ অনূদিত হয়নি।

আবার ভাষান্তর সংস্করণে কখনও কখনও 'area of interest'-র সামান্য বিচলন বা চ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। মূল উপন্যাসের নাম 'কাহাকে', ভাষান্তর সংস্করণ হয়েছে 'An Unfinished song'। 'কাহাকে' — ব্যক্তিজ্ঞাপক, যেখানে অনুবাদে নামকরণের ঝোঁক একটি বিশেষ গানের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রকাশে। গানটি নায়িকার জীবনের এক বিশিষ্ট স্মৃতির অনুষঙ্গবাহী।

৩য় পরিচ্ছেদ /Ch - 4-এ ভাষান্তরে দেখি তিনি আবার স্পষ্টতার দিকে জোর দিয়েছেন। মি. ঘোষ / Mr Roy কে মূলে 'ইঁহাকে' বললেও ভাষান্তরে 'Mr Roy' বলা হল। 'তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর করিলাম— দিদির জন্য' (মূল) : ইংরাজীতে 'For my sister' I faltered shyly.' রমানাথের আগে নভেল পড়তে অবাস্তর লাগত কারণ 'first sight-এ love', যদিও ভাষান্তরে নভেল অবাস্তব লাগার এই কারণটা জানা যায় না। হঠাৎ ভগিনীপতির আগমনে রমানাথ অস্বস্তিতে পড়েছেন এ খরর মূলে পাই, কিন্তু তারপরেই যে তিনি 'but in a minute he was master of the situation' হয়ে যান তা ভাষান্তর বিনা বোঝার উপায় নেই। এরপর বাংলায় আছে, ডাক্তার বোস দেখা করতে এসেছেন, যদিও এই নাম ইংরাজি সংস্করণে বদলে হয়েছে 'Binoy Kumar Choudhury'। ভাষান্তরে রমানাথকে Chapter IV-এর এক জায়গায় নায়িকার 'Lover' বলা হয়েছে, যদিও এ ধরনের খোলামেলা স্বীকারোক্তি মূল বাংলায় নেই।

রমানাথের ব্যক্তিগত জীবনের উপর থেকে ডাক্তার যখন পর্দা তুললেন তখন রমানাথ ভীষণ বিড়ম্বনার সাথে বলতে বাধ্য হলেন 'I thought that affair was over and done with long ago. For goodness' sake don't bring that up before anybody here– all my friends would think I was villain of the deepest dye' ইংরাজি সংস্করণে : '...I thought that affair was a thing of the past. For goodness sake don't start the subject here, my friends might consider me a villain if they heard of it.' ডাক্তারের উত্তরেরও পাঠান্তর আছে, ভাষান্তরের পাঠ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল :

'And (ভাষান্তরে নেই) what else do you (can you) make yourself out to be? Do you think (consider) it is very (ভাষান্তরে নেই) honourable conduct to forsake a helpless (young) girl who has trusted you implicitly (ভাষান্তরে নেই)? যখন তাঁর (মেয়েটির) চোখদুটি জলে ভরে আসে, সান্ত্বনা দিতে দিদি এগিয়ে এলেন। এই দিদির সম্বন্ধে ভাষান্তরে একটি কথা পাই যার ভাব মূলে থাকলেও কথা ছিল না— 'Dear, kind sister, now tenderly she caressed me, how solicitous she was of my well-being.' 'কান্না হয়েছে 'sadness' ('crying' নয়)।

মূলের এই কথাটিও অনূদিত হয়নি—'চারিদিকে বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তন অনুভব করিলাম।' দুর্বাসা মুনি যে শকুন্তলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তার উল্লেখ ইংরাজি অনুবাদে থাকলেও মূলে নেই— 'Durbassa who, when asking the love– stricken Sakuntala for alms, was roused to anger because she noticed him not' মণি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আবার ডাক্তারের

ঔষধে সেরে উঠলেন। অনুবাদে আছে। 'Thus passed the day. I felt my strength returning gradually. After dusk my sister again sat beside me.' এই অংশটিও মূলে অনুপস্থিত। 'ভাবনা' anxiety টা হয়েছে 'terror'। এই পরিচ্ছেদের আরেকটি বাক্যও 'My sister's expression of confidence in this man sounded like irony to me –' মূলে নেই। দিদির মনের ভাব লক্ষ্য করে বোনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃততর বর্ণনা ইংরেজি সংস্করণে পাই: 'This was more than I had expected of my sister. She surprised me disagreeably and my reply was quick and fretful.' 'তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই বেশি মায়া করবে।' —এই অংশের অনুবাদ হয়নি। স্বামীর সম্বন্ধে বলা কথা : 'সংসার যেমনই হৌক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব' —এরও অনুবাদ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (Chapter VI)-র (মূলে) 'তাহার প্রত্যাশা বড় অধিক' —অনূদিত হয়নি। আবার ইংরাজি সংস্করণের 'He spoke in his own defence' ও অনূদিত হয়নি।' 'কথাটি বড়ই খারাপ লাগিল'— এর অনুবাদে নাটকীয়তা লক্ষ্য করার মত— 'How cruel those last words sounded, how extremely repugnant it all seemed to me.' কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পাবার প্রক্রিয়াটিও ইংরাজি অনুবাদে নাটকীয়ভাবে দেওয়া হয়েছে— 'These thoughts revolved in my mind and excited my nerves, and my feeling was in my voice when I spoke.' 'কিছু পরে বলিলেন'— 'It took some time to master his agitation. I saw he struggled to suppress his anger as he spoke.'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কিছু অংশ ইংরাজিতে অনুবাদ হয়নি,—'আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম—তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ! তিনি যে আমাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আমারি ছলনা বটে! কি চমৎকার যুক্তি-চাতুরী! আমার এতদূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত।' 'আমি বলিলাম, 'না অমন বিশ্রী ওষুদ আমি আর খাব না।''. অনুবাদে এটি বিস্তৃত রূপ পেয়েছে— 'I did not like the tonic, it tasted bitter, and I did not waste a minute in expressing myself on the subject. I declared pettishly the tonic must be stopped, it did not suit my palate.' 'এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে'—অনুবাদে নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ /Chapter VIII -এ মূলের 'Lorets convent' অনুবাদ সংস্করণে হয়ে গেছে 'one of the best English schools in Calcutta.' 'সেই জ্ঞানের ফল আজ পাঠককে উপহার দিতেছি, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন,' পাঠকের প্রতি এই বক্তব্য অনুবাদে স্থান পায়নি। 'ত্রেতা যুগে' বাল্মীকি বর্তমান ছিলেন। এই যুগনির্দেশ অনুবাদে অনুল্লিখিত।

Chapter X-এ 'but if I had expected sympathy, I was mistaken' অংশটি মূলে (নবম পরিচ্ছেদে) নেই। তাঁর দিদি যে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাব বিবরণ ইংরাজি অংশেই পাই 'displeased, very displeased.' 'তাঁরই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমার কিছুমাত্র নেই!'—এই বাক্যটি ভাষান্তরে মিলবে না।

মূলে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখি কথা প্রসঙ্গে দিদির 'মণি' কে টেনে আনার একটা সচেতন প্রয়াস আছে—'কেমন মণি?'— কিন্তু ইংরাজিতে তা অনুপস্থিত। এই একই পরিচ্ছেদে (Chapter XIII) ভাষান্তরে দেখি নির্দিষ্ট করে বলার দিকে ঝোঁক। যেমন মূলের 'এককালে....আমরাও', 'পুতুলের মতো মুখ' যথাক্রমে হয়েছে 'Our Aryan ancestors' এবং 'their soft white faces and cheeks like dolls'.

এবার আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের সম্মুখীন হই · মূলে আছে, ভগ্নীপতি বলছেন '...

আমার দশা তো দেখতেই পাচ্ছ'— ডাক্তারকে সম্বোধন করে, যদিও (মূলে) উত্তর দিয়েছেন দিদি। ভাষান্তরে দেখি ভগিনীপতি তাঁর কথার অনুরূপ উত্তরই পাচ্ছেন কিন্তু সেটা যে দিদির তা বোঝার উপায় নেই। মনে হয় তা যেন ডাক্তারেরই কথা। মূলে শুধু আছে 'দিদি হাসিয়া বলিলেন', ইংরাজিতে তা হয়েছে: 'My sister laughed most cordially at this comparison and asked him to explain.' ইংরাজিতে আছে, ডাক্তার দোকানদারের অনুরোধে ঢেঁকি গিলে অনেক পাউন্ড খরচা করে ফেলেন— 'Simply on account of the importunity of the shopkeeper'—এই অংশ মূল বাংলায় নেই। অনিবার্য কারণে রমানাথের প্রসঙ্গ ওঠে। স্বভাবতঃই ডাক্তার সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। মূলে আছে 'ভগিনীপতি তাঁহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন'—এই সঙ্কোচের ব্যাপারটা অনুবাদে অনুপস্থিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে (Chapter XVII) 'দ্বেষের পরিবর্তে এই ঈর্ষার আঘাতে আমার হৃদয়ে একটি গুপ্ত প্রীতিধারা সহসা খুলিয়া গেল'—এর অনুবাদ নেই। 'আস্তে আস্তে আবার ফিরিয়া গিয়া বিছানায় ঢুকিলাম'— এই সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। মণিকে উনিশ বছরেও কুমারী থাকতে দেখে পাড়াশুদ্ধ লোক ধিক্কার দিতে দিতে কী বলল তা আমরা যথার্থ জানতে পারি অনুবাদের মাধ্যমে। একটি পুরো অনুচ্ছেদ অনুবাদে সংযুক্ত হয়েছে, যা মূলে ছিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে (Chapter XIX)-এ মূলে ডাক্তার বলেন যে তিনি মণি (মৃণালিনী)-দের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অনুবাদে কিন্তু ডাক্তারের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে খুব সহজ ভাবেই। 'you' যেখানে বহুবচন নয়, একবচন—'মণি'-র উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত। মণি তাই বলে ওঠেন, '...he had come expressly to see me!'। 'এ মিলন শুরু চিরবিচ্ছেদ, চিরব্যবধানের জন্য'— অনুবাদ হয়নি। বিংশ পরিচ্ছেদ (Chapter XXI)-এ 'বিধাতা আমার জন্য কি তাঁহার নিয়ম পরিবর্তন করিবেন?' — এই অংশের ভাষান্তর হয়নি, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি ইংরেজ পাঠককে। মণির গানের তিনটি কলির (সেই মিলন...আঁখি ভরিয়ে এল!) অনুবাদ হয়নি। মণির বাবা বলে ওঠেন 'এই যে বিনয়কুমার' ইংরাজিতে হয়েছে 'Binoy Krishna'।

উপসংহার ('Conclusion') অংশে 'ইঁহার মুখ' হয়েছে 'his handsome face', 'মিষ্টার ঘোষ' হয়েছে 'poor Ramanath', (মূলে) ডাক্তার আর 'আপনি' সম্বোধন শুনতে চাইছেন না—'আবার আপনি?' ভাষান্তরে সেটাই হয়ে গেছে— 'Doctor again?'। 'আচ্ছা, আচ্ছা তুমি,-' 'But how could you, Chotu'। 'যখনি আমার কথা থেকে বুঝলে, তোমার সঙ্গেই বাবা সম্বন্ধ করেছেন, তখন সেটা' —ইংরাজিতে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে : 'When you understood from my remarks that father had settled my marriage with you, that very moment you left me alone.' ইংরাজি অনুবাদে 'Sense' -এর পরিপূর্ণতা রক্ষা করতে অনেক সময় নতুন বাক্যও যুক্ত হয়েছে যেমন 'Love gets easily frightened' এবং 'Is that your idea of chivalry?' 'পুরান আমাকে'— 'নতুন লোক-কে'— অনুবাদে নির্দিষ্ট হয়েছে 'Chotu, the friend of your childhood'-, 'the new man, the doctor'। 'তোমার প্রেম পুরাতনের উপর'— ইংরাজিতে অনূদিত হয়নি।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর অনুবাদে বিদেশি পাঠকের সুবিধার জন্য চলিত বাগ্‌ধারা ('মাঝগঙ্গার হাবুডুবু' প্রভৃতি) প্রভৃতি যেমন একদিকে সযত্নে পরিহার করেছেন, তেমনি হিন্দুসমাজকে বোঝার সুবিধার জন্য অনুবাদে কখনও কিছু যোগ-বিয়োগও করেছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মূলত ভাবানুবাদের দিকে জোর দিয়েছেন। অনুবাদ তাঁর কলমে সত্যই নতুন এক সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠেছে।

'বিদ্রোহ্' : একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস

রবিন পাল

মোট এগারটি উপন্যাসের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ইতিহাসকে আশ্রয় করে পাঁচটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল দীপনির্বাণ, মিবাররাজ, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ এবং ফুলের মালা। তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ (১৮৭৬) ইতিহাসাশ্রিত, পূর্ব উল্লিখিত উপন্যাসগুলি যথাক্রমে ১৮৮৭, ১৮৮৮, ১৮৯০, ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে দুটি সামাজিক উপন্যাস ছিন্নমুকুল (১৮৭৯) ও স্নেহলতা (১৮৯০, ১৮৯৩) প্রকাশিত হয়। ইতিহাস নিয়ে উপন্যাসেই তাঁর যাত্রা শুরু, তারপর সামাজিক উপন্যাসে পদক্ষেপ। তবে সুদূর হোক আর নিকট হোক, ইতিহাসের পর্যবেক্ষণেই তাঁর প্রবণতা। ঐতিহাসিক ব্রদেল যে ইতিহাসের বড় সময়, ছোট সময় এবং ব্যক্তিগত সময়ের কথা বলেন, স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে ইতিহাসাশ্রিত এবং সামাজিক দুটি ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়েছে। ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা, যুগ-উত্থিত স্বাদেশিক চেতনা, সখিসমিতি, মহিলা শিল্পমেলা স্থাপন, হিন্দুমেলায় যাতায়াত, স্বামী জানকীনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে যাতায়াত, ১৮৯০-এ কংগ্রেসের প্রতিনিধি পদপ্রাপ্তি, প্রভৃতি তথ্য থেকে বোঝা যায় ইতিহাসের গৌরবময় এবং অন্ধকারময় ঐতিহ্যের দিকে স্বর্ণকুমারীর জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশমান সচেতনতা ছিল। দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ছিল উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের অঙ্গ, যে দুটি ব্যাপারে স্বর্ণকুমারীর কারয়িত্রী নৈপুণ্য ছিল অতীব স্মরণীয়। সতীদাহ এবং বাল্যবিবাহ-বিরোধিতাও ছিল সুস্পষ্ট। এ পথেও তিনি ইতিহাসের উপস্থাপন, বিশ্লেষণের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন স্বাদেশিক চেতনা।

এটাই ছিল বঙ্কিমী যুগের প্রগতিশীল রীতি। তাই দেখি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ইতিহাস আশ্রয়ী এবং সামাজিক— দুই প্রকার উপন্যাসেই আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে যেমন কালগত বিচারে স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন, তেমনি ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস বা রোমান্স রচনার জোয়ার আসে। বঙ্কিম রমেশের পাশে স্বর্ণকুমারী বাদে এ ধারার রচনা প্রয়াসের জন্য প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মীর মুশররফ হোসেন, চণ্ডীচরণ সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। সুনির্দ্দিষ্ট দেশকাল না থাকলেও কাল্পনিক অতীতাশ্রয়ী রোমান্স লিখেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সাধারণ প্রবণতার কারণ আমাদের মনোযোগ অবশ্যই দাবী করবে।

গেওর্গ লুকাচ বলেছেন, নেপোলিয়নের পতনের সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব হয় ইউরোপে। ফরাসি বিপ্লব, বিপ্লবকেন্দ্রিক যুদ্ধসমূহ, নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও পতন ইতিহাসকে করে তোলে জনঅভিজ্ঞতার অন্তর্গত। ওয়াল্টার স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাস বেরতে শুরু করে ১৮১৪ থেকে। স্কট-পূর্ব উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও কালের ঐতিহাসিক অদ্ভুতত্ব বাদ দিয়েই চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করা হত। আর উপন্যাসের এই ধারার বিকাশের অন্তরালে এনলাইটেনমেন্ট যুগের ইতিহাস নিয়ে লেখালিখির প্রভাব ছিল ব্যাপক, যা সামন্ত একাধিপত্য থেকে সমাজমুক্তির কথায় ছিল উদ্বেল। এই এনলাইটেনমেন্ট যুগের শেষ পর্বে জার্মানিতে সাহিত্যে অতীত প্রতিবিম্বন হয়ে উঠেছিল একান্ত

জরুরি। উইঙ্কেলমান এবং লিসিং-এর অতীত ব্যাখ্যান তাতে প্রেরণা জোগায়। গোটের প্রয়াস প্রভাব ফেলেছিল স্কটের লেখায়। এইভাবে ইতিহাস বিষয়ে জনঅভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজ রূপান্তরের তাগিদে যুক্ত হল জাতীয়তাবোধ, অন্যদিকে জনগণ উত্তরোত্তর জাতীয় এবং বিশ্ব ইতিহাসের অনিবার্য সম্পর্ক বিষয়ে হয়ে উঠল সচেতন। (The Historical Novel, পৃ ১৫-২৮) অন্যদিকে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টির কারণ সন্ধান করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বঙ্কিমের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে সক্রিয় ছিল সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শ, কিন্তু সমকালীন জীবনের বন্ধ্যা সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে তিনি পরিহার করেন অ্যাভারেজ ঘটনা বা কাহিনী এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্র। উনিশ শতকীয় ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় নিজ রুচি গঠিত করেও বঙ্কিম উপন্যাসের মেজাজে প্রশ্রয় দেন রোমান্টিকতাকে, তৎকালীন শক্তিধর ডিকেন্সে প্রেরণা সন্ধান করেন না, বরং ঝোঁকেন স্কটের দিকে আর ঐতিহাসিক যুগসন্ধির দ্রষ্টা হিসেবে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেন কয়েকটি যুগসন্ধি— হিন্দু-তুর্কি, মোগল-পাঠান, নবাব-ইংরেজ, মোগল-রাজপুত। 'জীবনের স্থিতাবস্থা যখন ব্যাহত হয়, খণ্ডীভূত হয় জীবনের ধ্রুবরূপ, তখনই মানুষের কল্পনালোকে শুরু হয় ব্যাপক আলোড়ন। তখনই সে সান্ত্বনা খোঁজে অন্তরের সাড়া পেতে চায় প্রকৃতিতে।' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৯১, ৯৪, ৯৬) ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসের দিকে অন্য অনেকের মত স্বর্ণকুমারীর আগ্রহ সঞ্চয়ের কারণ অনুসন্ধানে দেশচেতনার খণ্ডীভবন, স্বদেশচেতনার উৎসার এবং সমকালীনতার জাড্য-বিমুখতা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এইখানে বলে নেওয়া যাক, স্বর্ণকুমারী মুসলমান ও হিন্দু রাজশক্তির সঙ্ঘাতের মধ্যে সন্ধান করেছেন বিদেশি আক্রমণ, শাসনের সঙ্গে জাতীয় প্রতিরোধের দ্বৈরথ (দীপনির্বাণ), মুসলমান মনীষীর দানশীলতার কাহিনী (হুগলীর ইমামবাড়ী), রাজপুত-ভীলের সঙ্ঘাত এবং প্রজাবিদ্রোহের কাহিনী (মিবাররাজ, বিদ্রোহ)। তাঁর অনেক ছোট গল্প গাথাকবিতা রাজস্থানের ইতিহাস দ্বারা সঞ্জীবিত। লক্ষ্য করতে হবে, ইতিহাস চৈতন্য ও স্বাদেশিকতার সংমিশ্রণ জাত বোধ আগ্রহী হয়েছিল রাজস্থানের ইতিহাসে আর এক্ষেত্রে টডের গ্রন্থ নিয়েছিল এক উল্লেখ্য ভূমিকা। 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি (টডের রাজস্থান) হইতে গৃহীত'— বিবেকানন্দের এই মন্তব্য সমর্থিত হবে বাংলা নাটক, কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতিতে টডের বইটির প্রেরণা সন্ধান করলে (এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে)। স্বর্ণকুমারীর তিনটি উপন্যাস— দীপনির্বাণ, মিবাররাজ এবং বিদ্রোহ-এর পটভূমি রাজস্থান। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', মাধবী কঙ্কণ দামোদরের 'প্রতাপ সিংহ', রোহিণীকুমার সেনগুপ্তের 'চণ্ডবিক্রম', হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য' এবং 'মন্ত্রের সাধন', সীতানাথ চক্রবর্তীর 'সরোজ সুন্দরী', দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'হাম্বির', বরদাকান্ত মজুমদারের 'কর্মদেবী', মনোমোহন রায়ের 'সতীর মুল্য'— এ সবেরই পটভূমি রাজস্থান, প্রাথমিক তথ্যপ্রেরণা টডের মহাগ্রন্থ Annals and Antiquities of Rajasthan (1894)। বোঝা যায় স্বাদেশিক চেতনা শিল্পরূপের সন্ধানে যোগ্যভূমি পেয়েছিল রাজস্থান ও তার শৌর্যবীর্যময় ইতিহাসে। এ এক উল্লেখযোগ্য সাধারণ প্রবণতা বলা চলে। তবে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস দুটি একদিক থেকে ব্যতিক্রম। অন্যান্য উপন্যাসে রাজা ও রানীর জীবনই প্রধান চরিত্র, স্বর্ণকুমারী কিন্তু যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ভীল জাতির জীবনকেই এবং তাদের স্বদেশক্ষুব্ধতাকে উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। অনেক পরবর্তীকালের মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' এর সার্থক পূর্বসূরী 'বিদ্রোহ', যদিও এই দুই উপন্যাসের বৈসাদৃশ্য ও শিল্পী-জীবনবোধের ভিন্নতাও কম নয়।

স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন, 'ইতিহাসের দু' একটি পাত্রপাত্রী থাকলেও এটি ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।' (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ. ১৩১) অন্যদিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিদ্রোহ স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।' (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ২৮৫)। পশুপতি শাসমল বলেছেন, এই উপন্যাসটিকে 'রাজস্থানের ইতিহাসকেন্দ্রিক নিশ্চয় বলা চলে।' এখানে তিনি 'টডের সামান্য বিবরণকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন বিনা দ্বিধায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকের এই অধিকার থাকে। সমগ্র উপন্যাসে এই বিদ্রোহের (ভীল) প্রকাশ পরম্পরা নিপুণতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।' (স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯)। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, 'বিদ্রোহ স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস, দুই শ্রেণী (অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও সামাজিক) মিলিয়ে দেখলে এ সবচেয়ে পরিণত রচনা।' (বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য়, পৃঃ ১০৬)।

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস। ঐতিহাসিক অতীত মানসিকতার পরিবর্তন পরম্পরা ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন না। ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সৃজনী কল্পনার যোগে সেই দুরূহ বিস্ময়কর কর্মটি সম্পন্ন করেন সাহিত্যিক। ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শক, সাহিত্যিক স্রষ্টা, (যদিও ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যার ভিন্নতা ইতিহাসের ভিন্ন বোধ এনে দেয়) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ইতিহাস পড়িব, না আইভানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভানহো পড়ো।.......কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।' তবু যেহেতু ঐতিহাসিক উপন্যাস/রোমান্স নামে একটি পৃথক শাখা তৈরি হয়ে গেছে তাই তার কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা যাক :

ক) ঐতিহাসিক উপন্যাসের/রোমান্সের জন্য ঔপন্যাসিক নির্বাচন করেন অতীত ইতিহাসের কোনও বিশেষ সময় পরিধি, প্রধান ঘটনা ইতিহাসের, অপ্রধান ঘটনায় তিনি স্বাধীনতা নিতে পারেন তবে তা হওয়া চাই প্রথমটির সঙ্গে মানানসই।

এক্ষেত্রে বঙ্কিমের মন্তব্য স্মরণীয় : 'উপন্যাস লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। ...উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।'

খ) উপন্যাসে যে যুগ বর্ণনা তাকে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত করে উপস্থিত করার জন্য বর্ণিত যুগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার সংস্কার, বেশভূষা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়।

গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র (পুরুষ ও নারী) হওয়া উচিত ইতিহাসের পরিচিত চরিত্র, এখানে গৌণ চরিত্র চিত্রণে তিনি স্বাধীনতা নিতে পারেন তবে তা হওয়া চাই বর্ণিত যুগোপযোগী।

ঘ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে থাকা চাই ইতিহাসের বিশাল পটভূমি, ইতিহাসের সামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাত, আবেগ আলোড়ন, যদিও ইতিহাসের চরিত্র নির্মাণের পাশে পাশেই থাকা চাই ব্যক্তিচরিত্রের নির্মাণ, তাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আবেগ, উল্লাস আর্তনাদ। এখানে 'সাধারণ জীবন তাই ইতিহাসেব বর্ণানুরঞ্জিত হয়ে অসামান্যতা লাভ করে কারণ ঐতিহাসিক উপপ্লবের মধ্যে পতিত হয়ে সাধারণ জীবন দুঃখভোগের মহিমাতে অসাধারণ হয়ে পড়ে।' (পশুপতি শাশমল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫) ইতিহাস-জ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের দুর্লভ সম্মিলন তাই প্রত্যাশিত।

ঙ) ঐতিহাসিক উপন্যাস যেহেতু মহাকাব্যের আধুনিক উত্তরসূরী, তাই এর আবেগ যেমন হবে সমুন্নত, তেমনি তার ভাষা হবে গম্ভীর ও চাপল্যহীন, সে সময়ের ভাষা নয়, লেখকের

সমসময়ের ভাষাই ধরবে অতীতকে, আঁকবে ছবি, তবে থাকবে ধ্রুপদী মহিমা।

চ) ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে না, আনবে সেই ঐতিহাসিকতার অন্তর্গত মানুষদের অনুভব লোকের পুনর্জীবন। আমরা পাঠকরা, সেই সমাজ ও সমাজ অন্তর্গত মানব মনোভঙ্গিগুলি যা মানুষকে চিন্তা করতে, অনুভব করতে, সক্রিয় হতে— এককথায় ঐতিহাসিক বাস্তবতার চলিষ্ণুতার উপাদান হতে সাহায্য করে তা পুনরায় আমাদের অভিজ্ঞতার সামিল করব। ঐতিহাসিক উপন্যাস তাই শিল্পের প্রণালী বেয়ে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও চরিত্রগুলির বিস্তৃত আলেখ্য রচনা করে।

ছ) ইতিহাসের মত ঐতিহাসিক উপন্যাসও হল অতীত ও বর্তমানের চিরায়ত কথোপকথন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা তাঁর কালের কোনও প্রশ্ন, কোনও সংশয়, কোনও সঙ্কটের নিরসনের জন্যই যে কোনও নয়, বিশেষ কোনও ইতিহাস, বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্বাচন করেন উপন্যাসের জন্য, সেখানে ইতিহাসের ভিন্নতর ব্যাখ্যা রচিত হতে পারে সমসাময়িকতার অন্তর্গূঢ় অভিঘাতে।

জ) ইতিহাসের উপাদান এবং উপন্যাসের শিল্প উপাদানের আনুপাতিক হার নির্ণয় কঠিন। তবু ইতিহাসের গৌণতা, চরিত্র পাত্রের আলোকসমুন্নত জীবনচর্যা প্রাধান্য পেলে রচনাটি 'নভেল' অপেক্ষা 'রোমান্স' আখ্যা পাবারই উপযুক্ত।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসটির মধ্যে এবার ঢুকে পড়া যাক। মোট ৪৭টি অধ্যায়ে (তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ের পৃথক নাম) ভীল ও রাজপুতের বিরোধ, মিলনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'মিবাররাজ'-এর বিষয় একই যদিও 'বিদ্রোহে'র ঘটনা দু' শত বছর পরের ব্যাপার। গুহা বা গ্রহাদিত্য এবং মন্দালিকের সময় যে বিরোধের সূচনা, গুহার অসঙ্গত আচরণে ভীলদের মধ্যে যে অসন্তোষ জাগে, নাগাদিত্যের সময় তা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ লাভ করে। মিবাররাজে ছিল গুহার মৃগয়াসক্তি ও ভীল যুবকদের মধ্যে খেলাধূলা, অন্য যুবকদের সঙ্গে রাজা হওয়া নিয়ে গুহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভীলরাজ মন্দালিকের রহস্যময় হত্যা, মন্দালিকের ছেলে ও গুহার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ভীলপুত্রের ঈর্ষা, কলঙ্ক মাথায় নিয়ে গুহা-র গ্রহাদিত্য নাম নিয়ে ইন্দর রাজত্ব করা ইত্যাদি। বিদ্রোহ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা জানি গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য আহর পর্যন্ত অধিকার করে আশাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করে, এখানেই গুহলুট বংশীয়রা বাস করত, মাঝে মধ্যে শিকার করতে যেত ইদর। কিন্তু আশাদিত্যের পৌত্র নাগাদিত্যের আমলে জেগে উঠল ইদর। তৃতীয় অধ্যায়ে জানা যায় নাগাদিত্যের পূর্বপুরুষ আশাদিত্যকে একজন ভীল হত্যা করতে গিয়েছিল তারপর থেকে রাজার সঙ্গে ভীলদের আর সম্প্রীতি ছিল না, তবে অসন্তোষ ব্যাপক ছিল না। নাগাদিত্য সম্প্রীতিতে সচেষ্ট হলেও সভাসদ ও অমাত্যরা তা চাননি। ভীলরা রাজপুতরাজার বশ্যতা স্বীকার করে কৃষিকর্ম, মেষপালন করে অবীরোচিত জীবন যাপন করত। ভীল জুমিয়ার প্রতি রাজার প্রীতির সম্পর্ক ও জুমিয়ার পালিত কন্যা সুহারের প্রতি তার আকর্ষণ তার রাজ্য ও পারিবারিক জীবনে অসন্তোষ ডেকে আনে, রাজা ও রানীর মনোমালিন্য ও অসন্তোষ বাড়ায়। সুহারের প্রতি রাজার আকর্ষণ ক্লেদাক্ত বিরুদ্ধতায় আসক্তির তীব্রতা বাড়ায়। অন্যদিকে সুহারের প্রণয়ী ভীল যুবক ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ভীলদের মধ্যে সুপ্ত রাজার প্রতি বিদ্রোহমনস্কতাকে তীব্র স্ফূরণে উত্তপ্ত করে। রাজার মৃত্যুতে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে, ভীলরা রাজপুত রাজ্য ধ্বংস করে, জুমিয়া এই আগুন নেভাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় ও আত্মবলিদান করে। রাজপুত বংশের ভবিষ্যৎ শিশু বাপ্পা সুহারের মাতৃস্নেহ সান্নিধ্যে আশ্রয় পেয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। তাহলে রাজপুত-ভীল অসন্তোষের কাহিনী হল প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং রাজার প্রণয় ও ভীল যুবকের প্রতিহিংসা-তৎপরতা

উপন্যাসটির রক্তমাংসলতা রচনায় সহায়তা করছে বলা যায়।

টড শুধু বলেছিলেন, ভীলরা রাজপুত শাসনে বিরক্ত হয়ে নাগাদিত্যকে হত্যা করে এবং দীর্ঘদিনের বিদেশি শাসনের অবসান হয়। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে নাগাদিত্য শিকারের সময় নিহত হননি, বরং ভীলকন্যা সুহারমতীর বিয়ের আসরে নাগাদিত্য নিহত হয়। পুরোহিত হরিতাচার্যকে দেখানো হয়েছে কমলাবতীর বংশধররূপে। সুহারমতী ভীলকন্যা নয়, সে হরিতাচার্যবংশীয় ব্রাহ্মণকন্যা, তার ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্বর্ণকুমারী বলেন নাগাদিত্য গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্যের পৌত্র, কিন্তু টড দেখান নাগাদিত্য গুহার অষ্টম পুরুষ। চতুর্থত, নাগাদিত্য উপন্যাসে স্বৈরাচারী এবং রূপমোহ থেকে মৃত্যুমুখী পরিণামে উপনীত, যা রচনায় আছে লেখিকার সহানুভূতি। কিন্তু টড নাগাদিত্যের ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। পঞ্চমত, নাগাদিত্য সুহারমতীর প্রণয় প্রসঙ্গ টডের রচনায় নেই। নাগাদিত্যের জন্মবৃত্তান্তের যে বিবরণ আছে তা টডের লেখায় নেই। জুমিয়ার বর্শার আঘাতে রাজা ও রানীর মৃত্যুবরণের ঘটনাও টডে নেই। তাই বলা চলে প্রধান চরিত্র ও প্রধান ঘটনা বর্ণনায় স্বর্ণকুমারী কিছু পরিবর্তন করেছেন, কোথাও বা আভাসিত উল্লেখকে উপন্যাসের স্বার্থে বর্ধিত করেছেন।

সাধারণত রাজপুত জীবন নিয়ে উপন্যাসে পাঠান মোগলদের সঙ্গে সঙ্ঘাতই প্রদর্শিত হয়। রাজপুতরা স্বাধীনতা-বিপন্ন, পাঠান মোগলরা আগ্রাসী শক্তি এটা দেখানো হত। কিন্তু 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে একটু ভিন্নতা আছে। রাজপুত রাজারা এখানে আগ্রাসী শক্তি, ভীলরা নিগৃহীত। উপন্যাসের পঞ্চম থেকে নবম পরিচ্ছেদে ভীলজাতির ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রস্তুয়মানতার কথা এসেছে। পঞ্চমে আছে ভীলদের ঐশ্বর্য এবং সন্তোষের চিত্রমালা। যারা মন্দালিকের সময় ছিল অরণ্য-বৈশিষ্ট্যময় তারা ক্রমশ হয়ে ওঠে সভ্য। তাদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল বিদ্রোহবহ্নি যা জঙ্গু কুল্লু জংলি জুমিয়া জাগিয়ে তোলে। একদা ভীলরা ছিল শিকারজীবী, উৎসবপ্রিয়। মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তারাই হয়ে ওঠে কৃষকএবং জায়গীরদারের দাস। বনভূমিতে স্বাধীন বিচরণকারী হয়ে ওঠে মহাজনের কাছে বাঁধা। বিদ্রোহবহ্নির এটা অর্থনৈতিক কারণ। আবার মৃগয়ামত্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত দরিদ্র ভীলের শস্যপূর্ণ খেত ধ্বংস করে দিয়ে যায়, ভীল মেয়েদের রাজধানীতে ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু রাজ অন্তঃপুরে স্থান দেয় না, এই অনুরোধ ও দাবি জানালে স্পষ্টবাদী ভীল যুবক শাস্তি পায়। এই নির্যাতনও বিদ্রোহের বাস্তবতা রচনা করে। রাজাদের নৈতিক অধঃপতনের পাশেই দেখানো হয় স্বধর্মভ্রষ্ট পুরোহিতকে, যাদের মুখে চোখে একটা ক্ষুদ্র মোসাহেবি ধরন উঁকি মারতে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আছে নাগাদিত্যের সভাসদ ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের নীচমনা পরিচয়। জুমিয়ার গুণে মুগ্ধ নাগাদিত্য তাকে উচ্চপদে আসীন করলে রাজসভাসদরা অসন্তুষ্ট হয়, তার নানা গুণ রাজা আবিষ্কার করলে সভাসদরা নিজেদের রেষারেষি ভুলে রাজার কাণ্ডজ্ঞান হারানোর কথা বলে হাসাহাসি করে। অন্যদিকে, সভাসদদের ভীরুতাও প্রকট। তাদের মেরুদণ্ড নেই। এসবও রাজপুত অধঃপতনের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ভীল জীবনের একটা সামগ্রিক ছবি নির্মাণের, তাদের অপবিশ্বাস, সংস্কার, বৃক্ষপূজা, বলি-মানত, ওঝাগিরি, প্রতিজ্ঞা, সত্য ও সরলতার কিছু প্রসঙ্গ এনে আবহরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন স্বর্ণকুমারী। অরণ্যের অধিকার হারানো এক আদিবাসী সম্প্রদায় বহিরাগত রাজপুতদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এটা যেমন, তেমনি ভীল জীবন চিত্র রচনায় স্বর্ণকুমারীর প্রয়াস, আন্তরিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য স্বীকার করতেই হবে। 'মিবাররাজ' উপন্যাসেই আমরা ভীল জীবনের ব্যাপ্ত চিত্র পেয়েছি। এখানে ছিল ভীলদের সারল্য, আতিথেয়তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার চিত্র। ছিল তাদের সাহস, মৃগয়াপ্রীতি, ঋতুউৎসব, নানা সামাজিক উৎসবের বিবরণ। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে রাজপুত-ভীল সম্পর্কের কথা থাকলেও এই বিশদ উপস্থাপনা নেই। আরণ্যক ভীল

জীবনের প্রতি এই গুরুত্বদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কেননা আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা তখনও ছিল না। স্বর্ণকুমারী ছিলেন সাধ্যমত ইতিহাস সচেতন, পাঠকেন্দ্রিক সচেতনতা, 'ঝাঁসির রাণী' রচয়িতা মহাশ্বেতার মত অঞ্চল পরিদর্শনে তথ্য সংগ্রহ হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সেকালে। কিন্তু 'দীপনির্বাণ' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শাসমল দেখিয়েছেন কীভাবে স্বর্ণকুমারী এলিয়টের হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, কানিংহ্যামের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এলফিনস্টোনের হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, টডের রাজস্থান, নানা পত্র-পত্রিকা এবং চাঁদ কবির বিখ্যাত কাব্যের সাহায্য তিনি নিয়েছেন। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮) তাঁর একাধিক উপন্যাসে আছে উপক্রমণিকা, পরিশিষ্ট বা পাদটীকা, যা ইতিহাস নিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে। প্রিয়রঞ্জন সেন বলেছেন, এ রীতি স্কটের উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যেত। এই সাধারণ প্রবণতা এবং উপন্যাস শিল্পের অর্জিত অভিজ্ঞতা 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে অবশ্যই সাবলীল সাফল্যমুখী হয়েছে। উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে শিখরপাড় গ্রামে ভীলজীবনের বর্ণনা আছে, আছে সন্নিহিত প্রকৃতি বর্ণনা, জীবিকার কথা। পাহাড় স্তরের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজানোর কথা। আবার মৃগয়াকালে শস্যক্ষেত্র নষ্টের কথা। সপ্তম অধ্যায়ে আছে গণনায় বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি। বান্নু গণৎকারের প্রতারণা সরল ভীলরা বুঝতে পারে না। অষ্টম অধ্যায়ে আসে জঙ্গুর চোখে ভীলদের অর্থনৈতিকতার পরিবর্তন। দশম অধ্যায়ে অরণ্যের বর্ণনাও আমরা এই আবহনির্মাণের অংশ রূপেই দেখব। এই মিলিত নির্মাণে তাঁর দক্ষতা উপন্যাসটির বিশ্বাসের ভীত রচনা করেছে। এই ভীল বিদ্রোহের কাহিনীতে ভীলদের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর এবং রাজপুতদের সঙ্গে ব্রিটিশের তুলনা সহজেই মনে আসতে পারে। দুশ বছরের পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রামে মতের পার্থক্য, সত্যিকারের নেতৃত্বের অভাব ভীলদের মধ্যে দেখানো হয়, কিন্তু নব্বই দশকেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সেসব ছিল। জঙ্গুর সংলাপেও ভীলদের বিক্ষুব্ধ স্বদেশচেতনা যেন পরাধীন ভারতীয় চেতনার বিদ্রোহ উন্মুখতার পরিচয়বাহী। 'তুইতা মুইতা যেন মরিল, মুরা বুড্ডা, মুদের ছাবালরা—তুইতার ঐ ছাবালরা—উনারা অমনি থেতোল খাইবে—পিষণ সহিব চিরকালডা চিরকালডা ?' (৬ অধ্যায়) জঙ্গু বলে, 'এই ত সময় ডা, এখন তুইরা উঠ্ দাঁড়া সব।' এবং 'একাত্তা হইতেই দোকাত্তা মেলে—দোকাত্তা হইতে হাজারতা মেলে। কাজে লাগু রে—কাজে লাগু।' অষ্টম অধ্যায়ে জঙ্গু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবতে থাকে : 'এই শোভা সৌন্দর্য-বিকশিত বনপ্রদেশ একদিন তাহাদের ছিল—আবার কি তাহাদের হইবে না?' পাঠককে সম্বোধন করে লেখিকা বলে নেন, 'অসভ্য আদিম জাতি বলিয়া পাঠক যেন ভীল জাতিকে কাফ্রির দলে না ফেলেন।' বারো অধ্যায়ে জঙ্গুর কথায় যেন আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর— 'ছাবালরা শোন, তুইদের পরাণ বাঁচাউতেই তুইদের মরুতে ডাকুছি। পরাণ যদি না দিবু, তবে পরাণ রাখিবু কেমন?' পশুপতিবাবু যথার্থই বলেছেন, 'উপন্যাসের এবং বিবিধ ঘটনা পরিকল্পনার পশ্চাতে লেখিকার স্বাদেশিক মন ছিল অতীব সক্রিয়' (পৃ. ১৯৪) আর 'লেখিকা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের জাতীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ভাবনা-চিন্তার সম্পর্ক আছে।' (পৃ.১৯৪). ক্ষেত্রগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—'শাসক জাতিকে ভালো ইংরেজ মন্দ ইংরেজে' ভাগ করে দেখা উনবিংশ শতক থেকে শিক্ষিত বাঙালির অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া স্বর্ণকুমারী বিশ্বাস করতেন, শক হুন মোগল পাঠানের মত বহিরাগত ব্রিটিশ শাসকরাও এই ভারতের মহামানবের সাগরে মিলে যাবে।' রাজপুতরা, নাগাদিত্যের মত সৎ রাজারা ভীল বালিকাকে প্রেম করে বিবাহ ক'রে এ দুই জাতির মিলনের পথ প্রশস্ত করবে— এমন চিন্তাও ছিল। অন্যদিকে জনবিদ্রোহের চিত্র আঁকতে গিয়েও স্বর্ণকুমারী ভাবেন : 'পৃথিবীতে যখন যে দেশে কোনো মহৎ কার্য-সিদ্ধি হয়, প্রায় একজনের দ্বারাই হইয়া থাকে।' (১২ অধ্যায়) মহৎ কার্যসিদ্ধি বলতে লেখিকা বিপ্লবের কথাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তা

নেতৃত্বনির্ভর বিপ্লব। তাই তিনি ওই অধ্যায়ে নেপোলিয়ন, ম্যাটসিনি, প্রতাপসিংহের সাফল্যের এবং সিরাজদৌল্লার ব্যর্থতার কথা বলেন। উপন্যাসে আদিবাসী বিদ্রোহের সমর্থক স্বর্ণকুমারীর কংগ্রেসে যোগদান নারী মনে স্বদেশী সঞ্চার এবং পরবর্তীকালে কন্যা সরলার লাঠি বন্দুকের জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিরোধিতা হয়ত রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করলেও তাঁর স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা এবং স্বদেশ প্রেমের ঔপন্যাসিক শিল্পায়ন সম্পর্কে সংশয় থাকে না। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের লেখক যে বর্তমান পাদপীঠের জীবনবীক্ষা থেকেই অতীত ইতিহাস নির্বাচন ও ব্যাখ্যা করেন মিবাররাজ এবং বিদ্রোহ পড়লে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর এই ইতিহাস রচনায় তিনি যেমন মৌলিকতার পরিচয় দেন, তেমনি তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন গুণে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেন।

ইতিহাসের বড় সময়কে ছেড়ে আমরা যদি ইতিহাসের ব্যক্তিগত সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দুটি প্রসঙ্গ ইতিহাসের ব্যাপ্ত পরিসরের চাঞ্চল্য ও নাটকীয়তায় প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছে। একটি হল রাজা নাগাদিত্য ও তার রাণির সম্পর্ক। এ দুজনের ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্যের আভাস প্রথম পাই একুশ অধ্যায়ে। তার আগের অধ্যায়ে অন্তঃপুরের মজলিসের সঙ্গীতরসের মধ্যে সখী শ্যামার সংলাপ। রানী থাকতে রাজা ভীল বালিকার রূপে মুগ্ধ একথা রানী সেমন্তীর মনে যন্ত্রণা এনে দেয়। পরের অধ্যায়ে স্বামীকে এ প্রশ্ন করাতে রাজা রানীর প্রতি তার মুগ্ধতার কথা বললে রানীর প্রেমপূর্ণ চিত্ত উথলে ওঠে। রাজা-রানীর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব পরিবর্তনের ধারা কীভাবে ট্রাজেডি ঘনিয়ে আনল, তা অঙ্কনে স্বর্ণকুমারীর নৈপুণ্য আলোচকরা স্বীকার করেছেন। রাজার কাছে আশ্বস্ত হলেও পুরোহিতের উপদেশ এবং পরিচারিকার পরামর্শে সেমন্তীর মন আবার সংশয়ে পূর্ণ হয়—এই সংশয় ও বিশ্বাসের দোলাচলতা তথা অন্তঃপুর চিত্রণে নারীসুলভ দক্ষতার কথাও বলা হয়েছে। এরপর আসে নাগাদিত্য ও সুহারমতীর প্রণয় বিকাশ-পরম্পরা। চতুর্থ অধ্যায়ে মৃগয়াকালে রাজার সঙ্গে সরলা সুহারমতীর সাক্ষাৎ, তারপর পূর্বরাগ ও অনুরাগ। অন্যদিকে পাহাড়ের চোঁয়ানো জলের সঞ্চয়ের সামনে আত্মবিম্ব দর্শনে বালিকার মুগ্ধতার চিত্র অসাধারণ। অকারণ ব্যথা এবং আত্ম-আবিষ্কারের উল্লসিত আকুতি বালিকা হৃদয়কে যৌবনে উন্নীত করে। অন্যদিকে ক্ষেতিয়ার কুণ্ঠাহীন অবিরাম প্রেমনিবেদন সুহারমতীকে দোটানায় ফেলে। একদিকে উচ্চবংশীয় দৃপ্তভঙ্গি রাজার আকর্ষণ, অন্যদিকে সরল প্রেমউচ্ছ্বাসী ক্ষেতিয়া— এই প্রেমদ্বন্দ্বে চরিত্রটির সূক্ষ্ম দোলাচলতা, টানাপোড়েন চমৎকার আসে উপন্যাসটিতে। সাঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে সুহারমতী ও সেমন্তীর সাক্ষাতের দৃশ্য দুই চরিত্রের উন্মোচনে অতীব সার্থক। রানী সুহারের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলেন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সে তার কষ্টদুঃখের কারণ। সুহারের ভয়সঙ্কুচিত মুখে তার বালিকা হৃদয়ের লুকোনো প্রেমরহস্য তিনি লক্ষ্য করলেন, রাগ দ্বেষের পরিবর্তে একটা কোমল কৌতূহলে তার হৃদয় পূর্ণ হল। মনে পড়ল, এমন বয়সে তার মধ্যেও প্রেমের এরূপ সর্বাঙ্গ-বিকশিত ভাব ফুটেছিল। অন্যদিকে, সুহার সেমন্তীকে দেখে ভাবছিল এ কোন্ দেবী? সেমন্তী সুহারকে বোঝায়, যতই ভালোবাসুক, রাজা তাকে বিয়ে করতে পারবে না—তার কলঙ্ক হবে। সুহার বলে, রাজাকে সত্যিই ভালোবাসি, কারণ আমার গৌরব, আমার ধর্মকে ভালোবাসি তার থেকে বেশি। আমি আর তার সঙ্গে দেখা করব না। এই অধ্যায়ে নারী মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় স্বর্ণকুমারী এক অদ্ভুত detachment-এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা দক্ষ উপন্যাসেও দুর্লভ। উনচল্লিশ অধ্যায়ে রানীর যাতনার চিত্র রচনাতেও পরিচয় মেলে অনুপম দক্ষতার। শেষ দৃশ্যে সুহার ও শিশুর নিষ্কলঙ্ক শিশু-সহ মাতৃমূর্তি, ও স্বপ্নস্মৃতির উদ্বেলতা অল্প আয়াসে তিনি চমৎকার অঙ্কন করেন। তবে প্রেমের নিঃস্বার্থতা, আদর্শভাবের মন্তব্যগুলি একালের পাঠকের কাছে কিছু বিসদৃশ, অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। পশুপতিবাবুর সঙ্গে আমরা একমত, নারীজীবনের

মর্মকথা সন্ধানে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব অপরিসীম এবং যুগাতিক্রমী। ক্ষেত্র গুপ্তও যথার্থই বলেন, বিবাহিত পুরুষের প্রেম, রাজপুত রাজার ভীল তরুণীর প্রতি আসক্তি বাইরের সমাজ এবং চরিত্র সঙ্কট চিত্রণে স্বর্ণকুমারীর সাফল্য বঙ্কিম-অনুকারীদের মধ্যেও ছিল দুর্লভ। ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের সঙ্গে প্রেম সঙ্কটের এই কাহিনীকে তিনি চমৎকার মিলিয়ে দেন। রাজার প্রেমজীবন ও ভীল বিদ্রোহ ও প্রতিশোধ সুন্দর বিশ্বাস্য পরম্পরা রচনা করে ও ইতিহাসকে উপন্যাসের দীপ্তি দান করে।

এইখানে বলে নেওয়া চলে, ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে চরিত্রের টাইপ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা থেকে যায়, তাকে ইন্ডিভিজুয়াল করার দক্ষতা সবার থাকে না। স্বর্ণকুমারী কিন্তু রাজপুত্র সভাসদ এবং ভীলদের একদিকে যেমন যূথবদ্ধ অস্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত করেছেন অন্যদিকে তারা, বিশেষত কয়েকজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। এক্ষেত্রে জুঙ্গু, জুমিয়া এবং ক্ষেতিয়ার কথা সব থেকে আগে মনে পড়ে। জুঙ্গু স্বাধীনতাস্পৃহায় প্রজ্জ্বলন্ত শিখার মতই সমগ্র উপন্যাসে এক অনিবার্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। এ চরিত্র এতই আদর্শায়িত যে প্রায় যুগ-বিশ্বাস্যতার সীমানায় পৌঁছে যায়। জুমিয়া চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং অবক্ষয় ও আত্মদান চরিত্রটিকে যথোপযুক্ত নাটকীয় করেছে, ভীল ভীরুতাময় হৃদয়ে নিগ্রহ বেদনার দ্বন্দ্ব তাকে ইতিহাসের মহান দায়িত্ব পালনে (বন্ধু রাজপুতরাজের বুকে বর্শা নিক্ষেপ) প্রণোদিত করেছে। সে তুলনায় ক্ষেতিয়ার ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা এবং মমতা ও সেবায় আত্মউদ্বেলতার প্রশমন ইতিহাসের ব্যাপ্ত সময়ের পটে নিতান্ত ব্যক্তিক ট্রাজিক বেদনায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেমন্তী এবং সুহারের ক্ষেত্রেও বলব, নারী চরিত্রের ঈর্ষা, ক্ষতি, প্রেমানুভবের স্ফুরণ ইত্যাদি চমৎকার রূপায়িত, অন্তঃপুরিকাদের দহনধর্ম ও কানাকানি যা সামাজিক উপন্যাসে মেলে, সুমিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। চরিত্রায়নের প্রয়োজনে আবেগ উদ্বেলতা এবং প্রয়োজনে আবেগ নিয়ন্ত্রণ ইতিহাসের তরঙ্গ ভঙ্গের উপস্থাপনায় কঠিন কর্ম সন্দেহ নেই এবং স্বর্ণকুমারী অন্তত 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উপন্যাসে বিষয়বস্তু এবং ভাষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করেই তা কখনও কাব্যের মত গভীরগামী, কখনও গম্ভীর। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। স্বর্ণকুমারী যে এই ভাষা বৈচিত্র্য রচনায় দক্ষ তা 'বিদ্রোহ' পাঠে যে কোনও পাঠকই বুঝতে পারবেন। বাইশ অধ্যায়ে রাজার অ.কর্ষণ জানতে পেরে সুহারমতীর মনোচাঞ্চল্য চমৎকার ধরা পড়ে ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্বাভাবিক নিকুঞ্জে আত্মপর্যবেক্ষণে। 'পাহাড়ের একটি অংশ হইতে জল চুঁয়াইয়া এই নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় হইয়াছে, বালিকা সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া বসিল।' আজ চুল বেঁধে মাটির টিপ গড়ে কপালে দিয়ে বাবলার ফুল তুলে কানে দিয়ে জলে সে মুখ দেখতে লাগল এবং নিজে সুন্দর কি না এই সংশয়ে পড়ল। জলাশয়ের দিকে চেয়ে বসে থাকার এই কাব্যময়তায় চুঁইয়ে আসা জলের সঞ্চয় হয়ে ওঠে নিভৃতপ্রেমের সঞ্চয়ও বটে। একত্রিশ অধ্যায়ে দেখি প্রেমোদ্বেল সুহারের বর্ণনায় অসামান্য কাব্যময় প্রকাশ : 'ধূমকেতু আকাশের দেবতা, মর্ত্যের তরুলতার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের জীবনপথে উদিত হইয়া শুষ্ক করিয়া দিয়া যায়, শূন্যময় দগ্ধজীবন লইয়া তরুলতা অনন্তকাল ধরিয়া এখানে পড়িয়া থাকে।......তরুলতা শুষ্ক হৃদয় লইয়া মাটিতে মিশাইতে মিশাইতে কাঁদিয়া মরে। বালিকা আজ জলাশয় তীরে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। তাহার সেই আকুল দৃষ্টি হইতে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতে একটা করুণ কাতর ভাব উত্থিত হইয়া চাঁদের প্রাণ সিক্ত করিতেছিল।' এই ভাষা একান্তভাবে যেমন কাব্যের, তেমনি কোমল অনুভবের, প্রকৃতি ও মানব মনোসাযুজ্যের সুন্দর উদাহরণ বটে। আবার অন্যদিকে পরিস্থিতির ভিন্নতায় সঙ্কট বা বিরূপতা ভাষাকে বিষয়ের দাবিতেই করে তোলে গম্ভীর। যেমন 'জঙ্গুর উত্তপ্ত কৈশোর রক্ত

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, অদূরদর্শী বালক হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া সেইখানে তাঁহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দৈবক্রমে রাজা 'বাঁচিয়া গেলেন—জঙ্গুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।' (৮ম অধ্যায়), কিংবা বিচারালয়ে ভাবোদ্বেল রাজার মনোভঙ্গি—'তাহার সেই বলিষ্ঠ মূর্তি, সরলভাব, অসমসাহস, রাজার প্রতি পরিপ্লুত প্রেমভক্তি সব মনে পড়িয়া যাইতেছে, আর তাঁহার নিজের সেই প্রীতি-বিভাসিত হৃদয়ালোকে জুমিয়ার সমজাতি সমশ্রী অপরাধীগণের মলিন মুখশ্রী পর্য্যন্ত তিনি নির্দ্দোষ বিমল দেখিতেছেন।' (১৬নং অধ্যায়)

এই সূত্রেই বলে নেওয়া যায়, উপমা ও চিত্রকল্প বয়নে লেখিকার মুন্সিয়ানার কথা। উপন্যাস শুরু হয় : 'পার্বত্য প্রদেশে ঝড় উঠিয়াছে' এই বাক্যে। অচিরেই আমরা বুঝতে পারি এ ঝড় প্রকৃতি সঞ্জাত হলেও অচিরেই ভীল জাতির নিগৃহীত হৃদয়ের ঝড়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আবার এই ঝড়ের স্পষ্ট উপস্থিতি—সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃণ ঝড়ের মুখে না উড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঝড় নয়, জ্যোৎস্নার বহুল ব্যবহার, বিশেষত নাগাদিত্য-সুহারমতি প্রসঙ্গায়নে। ভাষার এই চিত্রকল্পন তাঁর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই।

ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস বা নাটকে দ্বন্দ্ব এবং নাটকীয়তা জীবন বা আদর্শগত সঙ্ঘাতকে ফোটাতে সাহায্য করে। স্বর্ণকুমারী এ ব্যাপারে বিশেষ রচনা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের ভিন্ন অভিপ্রায়ের দ্বন্দ্বে যেমন, বহিরঙ্গিক ও অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে যেমন তা স্পষ্ট, তেমনি তা ধরা পড়ে অধ্যায় সূচনা ও সমাপ্তিতে। যেমন ১নং অধ্যায়ে শুরু 'পাব্বর্ত্য প্রদেশে ঝড় উঠিয়াছে' শেষ হয় ছোট ছোট দুটি নাটকীয় সক্রিয়তায়—পথিক নির্জীব শিশুকে হাত পাতিয়া ধরিলেন। রমণী প্রাণত্যাগ করিল। ৪নং অধ্যায়ের শুরু হয় অল্পক্ষণে অসংখ্য সৈন্যের সমাবেশে আর শেষ—বালিকা দৌড়িয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা ফিরিয়া আসিয়া অশ্বারূঢ় হইলেন।' ১৬নং অধ্যায় শুরু— 'যে দুইজন নিরপরাধ ভীল অপরাধী রূপে ধৃত হইয়াছেন—মাসাবধি পরে আজ তাহাদের বিচার।' আর শেষ হয়—'ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই—রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।' এ হল বর্ণনার ভাষা নয়, সক্রিয় অভিব্যক্তির ভাষা, যা ইতিহাসের অন্তমুখর সঙ্ঘাতের তীব্র গতি, আবেগকে চমৎকার ধারণ করে। রচনারীতির এই উৎকর্ষ বঙ্কিমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটিকে রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় শুধু মনে করেননি, ভাষা, কবিত্বশক্তি, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের দিক দিয়ে রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে এমন বলেছেন। (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ.২৮৫)

পুশকিন স্কট সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন : 'The influence of Walter Scott can be felt in every province of the literature of his age. The new school of French historians formed itseif under the influence of the Scottish noveltist. He showed them entirely new sources which had so far remained unknown despite the existence of the historical drama of Shakespeare and Goethe......' বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্ব স্মরণে রেখেও বলা চলে স্বর্ণকুমারীর সম্পর্কে এ মন্তব্য অনেকাংশ প্রযোজ্য হতে পারে। কর্ম সচেতনতা, সাহিত্যের বহু শাখায় সমর্থ পদচারণায় শুধু নয়, আদিবাসী বিদ্রোহকেন্দ্রিক ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি নানা সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সমসাময়িকতার স্বাদেশিক বেদনার টানে ইতিহাস বিশেষের নির্বাচন ও শিল্পায়নে উদ্দীপন রচনা ১৯০৫-এর পরে নাটকেও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। উপন্যাসে বঙ্কিমী প্রয়াসের মহনীয়তার পাশে অল্পালোচিত কিন্তু সমুন্নত কৃতী স্বর্ণকুমারী। 'বিদ্রোহ' সেই সচেতন সামর্থ্যের সুমিত এক অভিজ্ঞান।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও বিজ্ঞানসাহিত্য

অংশুমান দাশ

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়ানোর কাজটি সহজ নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একাদশ সন্তান স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী পড়তে পড়তে হয়ত এই কথাটিই মনে পড়বে। অথচ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমরা উদাসীন। ১৮৮০-৮১ সালে স্বশিক্ষিতা এই রমণীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ যখন 'তত্ত্ববোধিনী' আর 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তখনও তাঁর পাঁচ বছরের ছোট ভাই, দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান 'বিশ্বপরিচয়' নামের বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থটি লেখার কথা ভাবেনওনি। সমসাময়িক আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯৫ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখছেন তাঁর প্রথম রচনা 'আকাশ স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ'। ওই একই সালে 'মুকুল' পত্রিকা ধন্য হচ্ছে তাঁর অনবদ্য রচনা 'গাছের কথা'-য়। তবুও স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ নন! তাঁর 'পৃথিবী' কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় গবেষকদেরই পাঠ্য।

শিক্ষার মাধ্যম, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম কেন মাতৃভাষা হওয়া উচিত— এ বিষয়ে যে কোনও কথাই এখন পুনরুক্তি মনে হবে। এত আলোচনা সত্ত্বেও সঠিক অর্থে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা আমরা আজও শুরু করতে পারিনি। এখনও তৈরি হয়নি প্রয়োজনমত পরিভাষা। 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান' অর্থাৎ কিনা popular science বিষয়টার উদ্ভাবক পশ্চিমের লোকেরা। অত্যন্ত সহজে সহজপাচ্য করে মানুষের বিজ্ঞান সংক্রান্ত কৌতূহল নিবারণের মাধ্যমই হচ্ছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান। সহজপাচ্য হওয়ার পথে মাতৃভাষাই হচ্ছে যোগ্যতম উৎসেচক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তা যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাহিত্যের আক্ষরিক অনুবাদ হয়, তবে তাতে বদহজমের সম্ভাবনাই বাড়ে। কারণ সমুদ্রের ওপার আর এপারের মানুষের বোধগম্যতার একটা তফাত আছে; এক জায়গার পদ্ধতি অন্য জায়গায় প্রয়োগ করতে গেলে সবসময় সুফল পাওয়া যায় না। আজকেব জনপ্রিয় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ঠিক এই ভুল পথেই হাঁটছে। স্টিফেন হকিং, রজার পেনরোজ— এঁদের বিখ্যাত বইগুলির আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। প্রয়োজন এদেশের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মৌলিক চিন্তাধারার। স্বর্ণকুমারী দেবীর এই চিন্তার ফসল ফলেছে আজ থেকে একশ কুড়ি বছর আগে— আমরা আজও কি তার স্বাদ পাব না?

সকলের জন্য বিজ্ঞান লিখতে গেলে অঙ্কের ভয়াবহতাকে সুনিপুণ হাতে অস্ত্রোপচার করতে হবে; এ ধারণা স্বর্ণকুমারী দেবী ধার করলেন পাশ্চাত্য লেখক নরম্যান লকিয়ার, গডফ্রে, নিউকাম ব্যালফোর কাছ থেকে। তারপর তাকে ঢাললেন নিজের ছাঁচে। প্রয়োজনমত তৈরি করলেন পরিভাষা, সঠিক অর্থের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য প্রচলিত শব্দের বদলে অনেক অপ্রচলিত তৎসম শব্দও প্রয়োগ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে Volcano-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি ব্যবহার করছেন জ্বালামুখী; আগ্নেয়গিরি নয়। তৎসম

শব্দের পাশাপাশিই রাখছেন হয়ত চলতি শব্দ। এমনকি কখনও কখনও মূল ইংরেজি শব্দ রেখে দিতেও তাঁর কুণ্ঠা নেই। অনেক সময় আমাদের কাছে অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলা প্রতিশব্দের থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়; অনাবশ্যক আক্ষরিক অনুবাদে বাক্যের গাম্ভীর্য বাড়ে ঠিকই কিন্তু তা বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছতে সময় নেয়। স্বর্ণকুমারী দেবী এসব ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি শব্দ রাখছেন অথবা অনুবাদ করলেও মূল শব্দটি রাখছেন বন্ধনীতে। এতে সহজ সরল প্রকাশভঙ্গীটি কোথাও বাধা পাচ্ছে না। যেমন 'Precession of the equinoxes' এর অনুবাদ করলেন 'ক্রান্তিপাতের চক্রগতি'—আক্ষরিক না হলেও এই ভাবানুবাদ বোধগম্য, তবুও তিনি মূল শব্দটি বন্ধনীতে দিতে ভুললেন না।

সাহিত্যিকরা হয়ত ইংরেজি শব্দের এহেন যথেচ্ছ ব্যবহারে খুশি হবেন না কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন পাঠকরা। জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের উদ্দেশ্য সুন্দর ও অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি নয়— বরং তা নিছকই প্রয়োজনের। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলে আগে দরকার জল, তারপরের কথা সেই জলের শুদ্ধতা। স্বর্ণকুমারী দেবী বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও বোধগম্য করতে চেয়েছেন, নিছক সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ তিনি যখন উপন্যাস লিখছেন, তার নির্মাণশৈলী ভিন্ন! সেই ক্ষেত্রেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য : 'সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয় ... বরং সময়ে সময়ে রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।'

স্বর্ণকুমারী দেবীর পক্ষে প্রথাগত শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তের বছর বয়সে কৃষ্ণনগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিবাহের পর তাঁকে ছয় বছরের মধ্যে চারটি সন্তানের জন্ম দিতে হয়। এরই মধ্যে চালিয়ে গেছেন নিজেকে শিক্ষিত করার কাজ। ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয় তৎকালীন বিজ্ঞানের দুরূহতম বিষয়গুলিকেও কী অনায়াসে নাড়াচাড়া করেছেন এই নারী! চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে লেখা সমস্ত বিজ্ঞান প্রবন্ধ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে ১৮৮২ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর একমাত্র বিজ্ঞান গ্রন্থ 'পৃথিবী'। এতে প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'সৌর পরিবারবর্তী পৃথিবী ও পৃথিবীর গতি প্রণালী'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সবটাই ভূবিদ্যা; মূলত পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণাম বিষয়ক প্রবন্ধ।

অ্যারিস্টটল ও টলেমির মহাকাশ সংক্রান্ত প্রাচীন ধ্যানধারণা অতিক্রম করে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিও আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞান বা জ্যোতিষীদের জনক। 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে'— এ কথা বললেও এখন আর প্রাণদণ্ড হয় না। গ্যালিলিওর এই সত্যকে সূত্রে রূপ দিয়েছেন কেপলার সাহেব। যে সব সূত্র আমাদের বলে দেয় সূর্যকে ঘিরে ঠিক কেমনভাবে ঘুরবে গ্রহগুলি। এই সূত্রত্রয়ই মহাকাশবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

১. গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয়। সূর্য ওই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে অবস্থিত।

২. যে কোনও গ্রহের সহিত সূর্যের সংযোজক সরলরেখা সমান সময়ের অবকাশে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

৩. সূর্যের চারিদিকে যে কোনও গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ সূর্য হইতে ওই গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

মাননীয় পাঠক, উপরের সূত্র তিনটি কেপলারের দেওয়া মূল সূত্রের বাংলা রূপান্তর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্র না হলে সূত্রগুলির রসাস্বাদন সহজে সম্ভব নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী অহেতুক

গাণিতিক জটিলতা সরিয়ে রেখে এই সূত্রগুলি উপস্থাপন করলেন আরও সহজে অথচ মূল সুরটিকে অবিকৃত রেখে।

১. গ্রহ সকলের ভ্রমণপথ (কক্ষ) সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হইয়া ডিম্বাকৃতি (বৃত্তভাস) এবং এই বৃত্তাভাসের দুটি অধিশ্রয়ের একটিতে সূর্য অবস্থিত।

২. সূর্য হইতে গ্রহ যত দূরে যায় তাহার বেগের তত হ্রাস হয়, আবার ঘুরিয়া সূর্য্যের নিকটে আসিলে তাহার বেগের বৃদ্ধি হয়। কক্ষের সর্ব্বাংশে গ্রহের গতি সমান বেগশালী নহে।

৩. যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরে অবস্থিত তাহার গতিবেগ তত মন্দ।

বিজ্ঞানের তত্ত্বকে সরল করতে গেলে অনেক সময় গুরুত্ব হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর অসাধারণত্ব এইখানেই, সরল করতে গিয়ে তিনি কিছুকেই তরল করে ফেলেননি; সীমারেখাটি তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট। কেপলারের সূত্রের এই সরলীকরণ তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এমন উদাহরণ 'পৃথিবী' গ্রন্থের পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষিক অধ্যায়ে রেখাচিত্রের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সবসময় উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছেন পরিচিত জগৎ থেকে। ভাষার ব্যবহার কখনও কখনও ভারি হৃদয়গ্রাহী। ধূমকেতুর ঘনত্ব ভীষণ কম; একটুখানি পদার্থ ছড়িয়ে থাকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'ধূমকেতুর গুরুত্ব অতি অল্প; লম্বায় সহস্র সহস্র ক্রোশ হইলেও উহাকে স্বচ্ছন্দে একটা বড় বোতলে ধরিয়া রাখা যায়।'

এই অধ্যায় যত এগিয়েছে মহাকাশবিজ্ঞানের কঠিনতর দিকগুলিতে ততই বেশি করে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন লেখিকা, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। যতক্ষণ সূর্যকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহের গতির কথা ছিল, ছিল জোয়ার-ভাঁটার কথা—ততক্ষণ বাধা পড়েনি বোধগম্যতায়। কিন্তু নক্ষত্র-কাল (sidereal time), ক্রান্তিপাত (equinoxes), চন্দ্রের আকর্ষণে সম্ভূত মেরুর গতি পরিবর্তনের হিসাব—এসব আলোচনা কিছুমাত্রায় তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের উপরে নির্ভরশীল, না হলে সম্পূর্ণতা আসে না। প্রবন্ধের প্রথমদিকে যে আড্ডার মেজাজটি ছিল, এই পর্বে তা হারিয়ে যায়; হয়ত সঙ্গত কারণেই। বাক্যের গঠন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে, এমনকি অর্ধশতাধিক শব্দ নিয়ে তৈরি বাক্যও চোখে পড়তে থাকে। এ সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপরে যথার্থমাত্রায় নিষ্ঠাশীল থেকেছেন লেখিকা।

বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত। যেখানে এসে আবার লেখিকার সাহিত্যিক শৈলী প্রকট হয়ে ওঠে। কোনও উদাহরণ দেওয়ার প্রসঙ্গ এলেই তিনি উদাহরণ খোঁজেন ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি থেকে, কথায় কথায় টেনে আনেন পুরাণের অনুষঙ্গ। অনায়াসে আলোচনা করেন বাইবেল আর মহাভারতের যোগসূত্র, প্রসঙ্গত উত্থাপন করেন কনফুসিয়াসের তত্ত্ব। তেমনই ঝরঝরে তাঁর পরিভাষা সৃষ্টি। 'Argilaceous Schists'-এর অনুবাদ করলেন কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে— 'সমুদ্র কর্দ্দম'। আরও আশ্চর্য লাগে অন্তঃপুরে বসে কী প্রচণ্ড মাত্রায় সমকালীন তিনি, ইংরাজিতে যাকে বলে up to date! ১৮৫৮ সালের ডঃ ককনর ব্রিক্সহ্যাম-এর পরীক্ষাও আলোচনা করলেন একবার। পৃথিবীর পরিণতির কথা বলতে গিয়ে বললেন, প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতা (Uniformity of natural law)-র কথা, যার সম্পর্কে কাজ হবে আরও ভবিষ্যতে!

'পৃথিবী' গ্রন্থের সব থেকে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হচ্ছে লেখিকার স্বকৃত ভূমিকা। বিজ্ঞানের উপরে এত ভাল মৌলিক প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে হাতে গোনা— এ বিষয়ে নিশ্চিত থেকে বাজি ধরা যায়। ভূমিকার সমস্ত সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব লেখিকার মৌলিকত্বের দাবিদার। সমগ্র বিজ্ঞান

যুগকে তিনি ভাগ করেছেন তিন ভাগে।

১. প্রাচীন বিজ্ঞান যুগ— এই যুগে জ্যামিতির উদ্ভাবন হচ্ছে। পরের দিকে লুপ্তপ্রায় হয়ে বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগের পুনর্জাগরণ হয় ষোড়শ শতাব্দীতে।

২. যুদ্ধের কাল— এ সময়ের তিন পুরোধা কোপার্নিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিও। 'যুদ্ধের কাল', কারণ প্রাচীন ধ্যানধারণা ভেঙে নতুন করে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার সময়।

৩. জয়ের কাল— এ কালের তিন মহান বৈজ্ঞানিক দেকার্ত, হাইগেন্স ও নিউটন পূর্বজদের বিজিত ক্ষেত্রের উপর জয়স্তম্ভ গড়ছেন।

'যুদ্ধের কাল' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তুলে ধরলেন কার্যকারণ সম্পর্কের কথা। বিস্তারিত আলোচনা করলেন আরোহণ ও অবরোহণ পদ্ধতি নিয়ে। Method of induction & deduction বললে আমরা হয়ত আরও নিশ্চিত হব। আরোহণ ও অবরোহণ প্রণালী-হচ্ছে সেই সিঁড়ি যাতে ভর করে অনায়াসে যাওয়া যায় তথ্য থেকে তত্ত্বে; বা এক তত্ত্ব থেকে অন্য তত্ত্বে। সুতরাং যে বিস্তারিত আলোচনা এরা দাবি করে স্বর্ণকুমারী দেবী তা দিতে কার্পণ্য করেননি। এই চমৎকার আলোচনার পুরোটাই তুলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সমস্যা স্থানাভাব। আর স্বর্ণকুমারী দেবীর বলিষ্ঠ গদ্যের কোনও শব্দই কাটা যায় না। তাই ভয় হয়, সম্পাদকমশাই এ অধমের স্বকৃত সাহিত্যকর্মকে বঞ্চিত করে স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্ধৃত গদ্যাংশকেই প্রাধান্য দেবেন। তবুও আরোহণ ও অবরোহণ প্রণালীর চমৎকার সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

অত্যন্ত সহজ উদাহরণের মাধ্যমে আরোহণ প্রণালী ব্যাখ্যার পরে সংজ্ঞায় লেখিকা বলছেন, 'আগে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া পরে যে প্রণালী দ্বারা সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনাব্যাপী একটি সাধারণ মূল সূত্রে উপনীত হই, বা কতকগুলি বিদিত সত্য লইয়া যে প্রণালী-ক্রমে সেই বিদিত সত্যব্যাপী একটি অবিদিত সত্যে আসি তাহাকে আরোহী প্রণালী কহে।'

অবরোহণ প্রসঙ্গে বলতে চান : 'কোন একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত হইতে যে প্রণালী দ্বারা কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া যায় সেই প্রণালীকে অবরোহী বলা হয়।' এমন কি এই সংজ্ঞায় যে ফাঁক আছে তা সম্পর্কেও তিনি সচেতন করে দিয়েছেন পাঠকদের।

ঠিক যে প্রসঙ্গের অবতারণা করে এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম, সে প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে। ইতিহাস সচেতনতা ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ একটি জাতিকে মহান করে তোলে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' গ্রন্থের পাতায় পাতায় ভারতবর্ষের অতীত ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত। প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গ আনেন। আক্ষেপ করেন : 'ভারতবর্ষ প্রকৃত ইতিহাস শূন্য'। কোনও তথ্য বা তত্ত্বই প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে অজানা ছিল না, লেখিকা প্রতি মুহূর্তে তার প্রমাণ দিতে থাকেন। কোপার্নিকাসের অনেক আগে আর্যভট্ট বলে গেছেন, 'পৃথিবীর আবর্তন বশতঃই স্থির নক্ষত্রমণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।'

সৌরকলঙ্ক (Solar Spot)-এর প্রসঙ্গে বললেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা : 'তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণৈঃ ক্ষণৈঃ...'। 'বিশ্বকর্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্যের তেজ কর্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক হার্মেল সৌরকলঙ্কের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যোগাযোগের কথা বলেন। বরাহমিহির একথা বলেছেন আরও অনেক অনেক আগে।

নিউটন মহাকর্ষশক্তির কথা বলার আগে ভাস্করাচার্যের লেখায় পাই—

'নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ—
মনুজা দিত্য দৈত্যং সমস্তাৎ।'

'ইহারি সেই আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে দৈত্য দানব ও মানবাদি সমস্তই ইহার পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে।'

লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিলেন পুরাণে প্রাণিজন্মের পরম্পরা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ধারায় প্রাণিজন্মের পরম্পরার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়—মৎস্য, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ও মানুষ। রূপক রূপে সত্য আছে ভারতীয় পুরাণে ও দর্শনে। স্বর্ণকুমারী দেবী তাই সিদ্ধান্তে আসেন : 'এইরূপে পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেক লুক্কায়িত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।' আমরা কি আজও পূর্বসূরীদের আমাদের অজ্ঞানতা দিয়ে ঢেকে রাখব?

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'-এর উপর স্বর্ণকুমারীর প্রভাব প্রকট না হলেও প্রচ্ছন্ন। যদিও তাঁর লেখায় অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা একবারও আসেনি, একটি গ্রন্থও তিনি উৎসর্গ করেননি এই নিরলস সাহিত্যসাধিকাকে ; পত্রালাপও অপ্রতুল। বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পূর্বসূরীদের স্মরণ করছেন, অথচ বলছেন না স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা। অধ্যায় বিন্যাসেও 'পৃথিবী' ও 'বিশ্বপরিচয়'-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিশ্বপরিচয়ে রয়েছে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার। আমি কোনও গুণগত তুলনায় যাচ্ছি না!

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-পরবর্তী বিজ্ঞান সাহিত্যিকদের কারোর লেখাতেই স্বর্ণকুমারীর উল্লেখ নেই। এ কথা বেদনাদায়ক। বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষধারার সূত্রপাত করেছেন তিনি এবং সম্ভবত যা এখনও পূর্ণ বিকাশের অপেক্ষায়। 'বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্য্যগত শিক্ষার অভাবেই ইয়োরোপীয় জাতি হইতে আমরা অনেক বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি।... দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান বাধা, বিজ্ঞানের ক্ষমতাবলেই একমাত্র যে দারিদ্র্যের মোচন হইতে পারে। ... যে দিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন সেই দিন সর্ব্বতোভাবে, আমাদের উন্নতি হইবে...।'

সমকালীন সমালোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী

কল্যাণী হাজরা

বর্তমান সঙ্কলনটি স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকখানি পুস্তকের উপর তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা ও মন্তব্যের সংগ্রহ। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও গ্রন্থাদিতে উল্লেখ থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে এইরূপ কোনও সঙ্কলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত পুস্তকের মূল্যায়নের দিক থেকে এগুলি প্রাচীন দলিল বিশেষ। স্বর্ণকুমারী ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা বা পাঠকসমাজ কী ধারণা পোষণ করতেন, এই সঙ্কলনের সাহায্যে তারই কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

এই সকল সমালোচনা বা সম্পাদকীয় মন্তব্য অধিকাংশই বিভিন্ন পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত। পুরাতন পত্র-পত্রিকা এবং অধুনা অপ্রাপ্য ও দুরূহ-লভ্য গ্রন্থ থেকে এই সমালোচনাগুলি সংগৃহীত। স্বর্ণকুমারীর কোনও কোনও পুস্তকের পরিশেষে তাঁর বইয়ের সমালোচনার কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে।

স্বর্ণকুমারী-সমকালীন সুধীজনচিত্তে ও সাময়িক পত্রে তাঁর রচিত উপন্যাস, কবিতা, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদির যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈচিত্র্য বড় কম নয়। সেগুলি উদ্ধার করে বর্তমান কালের পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরাই এই সঙ্কলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

দীপ-নির্ব্বাণ।

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

—*CALCUTTA REVIEW*

দীপ-নির্ব্বাণ নামে একখানি অভিনব নভেল্ আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এ খানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা, এরূপ রচনা, এরূপ সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

—*সাধারণী*

বসন্ত উৎসব

Basanta Utsab has here and there passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt, it will make its way to every lover of Bengali literature. The songs in pp. 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic, and have an exquisitely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so throughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, "revolutionize the exsisting style of opera-writing in Bengali by giving it a healthy

tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a "bubble of visionary happiness," unruffled by the tempests blowing without. We cordially recommend it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excellent production. We shall be glad to see it in the hands of every reader of Bengali literature.

We hear the author is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. It is customary to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it, in the present case. *Basanta Utsab* can stand upon its own merits.

—***Indian Mirror***

আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসীদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুলতোলা, লীলার নৈরাশ্য, শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতিনাট্য খানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।

—***নববিভাকর***

ছিন্ন-মুকুল।

Another good book is before us–Chinna Mukul, a Novel by the authoress of Dip Nirban and Basanta Utsab. The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasent transition to nature and fancy–to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of Dip Nirnan. A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all of the characters are extremely natural especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self, liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod her selfish brother, has hardly, been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such character in this cold, calculating world. Niraja, the other female charactor thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur, a respectable place in Bengali fiction.

—***Indian Mirror***

গাথা।

The little book of poetical tales is a novelty in Bengali literature, and a novelty,

the charms of which challenge our sincere admiration. The poetry is the poetry of genuine heart-felt pathos–powerful from its sublimity and affecting from its tenderness. There is not a word or image in the Gathas to disturb the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of soft communion with some thing holy and far removed from earth. Lest we should be deemed to rhetorical, we give below, a rather loose translation of a picture drawn by the writer of an unhappy girl–lost, in the reveries of her sorrow and pains.***

Perhaps it would be needless to inform the reading public that the writer of the Gatha under review is the noted writer of Dip Nirban, Basanta Utsab, Malaty, and Chinna Mukul. An honest historian of Bengali literature will find himself puzzled in doing justice to a fair writer who commencing her literary career with the Dip Nirban at an early age, could surprise the literary public with gifts that would live as long as that literature lives.

—Sunday Mirror, September 11, 1881

পৃথিবী।

This book is a novelty in the Scientific literature of Bengali. It contains a series of essays in the astronomical, geological and physical aspects of the earth, by a lady of real powers and abilities. Srimati Sarna Cumari Devi, wife of Mr Janokinath Ghosol, is well known to the literary world.

The book before us opens with a learned essay in the study of Science, in which the writer gives a clear explanation of Bacon's theory of induction and traces the rise and development of astronomy, geology in Europe. She frequently compares the astronomical theories of Europe with those of Hindoo astronomy.

The early chapters treat of the fundamental physical phenomena such as the solar system, the motions of the earth and the seasons. To elucidate the solar system, a clear explanation of Newton's laws of universal gravitation and of motion has been given Later on the authoress enters way fully into the origin and structure of the earth's surface. She also touches upon the various theories regarding the interior of the earth. The concluding chapter is devoted to the discussion of the possible end of the earth.

The writer brings a great research and vast information to bear upon her book. All the difficult theories of the European astronomers and geologists have been explained in a clear chaste and vigorous style. She has introduced many Scientific terms into the Bengali language. The work does great credit to the writer. We have no hesitation in saying that this is the best book in popular astronomy and geology in the Bengali language.

–The Statesman And Friend of India

পৃথিবী—দীপ-নির্ব্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য ১ টাকা। ইহাতে জ্যৌতিষিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল এবং ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা রচয়িত্রীর চিন্তাশীলতা কি অনুসন্ধিৎসা; কবিত্ব শক্তি কি সরল বাঙ্গালা রচনার পারিপাট্য; স্বদেশ-হিতৈষিতা কি অন্তঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মভাব কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব জানি না। পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহামূল্য রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক গূঢ় তত্ত্ব এবং তাঁহাদিগের কল্পনার উচ্চচিন্তা সকল স্বায়ত্ত করিয়া একজন ভারত রমণী এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ইহা ভারতের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

—বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্ণকুমারী দেবীর বই : আখ্যাপত্রের বিবরণ

আশিসকুমার হাজরা

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত কয়েকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের বিবরণ এবং ওই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচিতি এই সঙ্কলনে মুদ্রিত হল। স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থ পরিচিতির ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ২য় খণ্ডের অন্তর্গত 'স্বর্ণকুমারী দেবী' ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিই একমাত্র পথ প্রদর্শক। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম আবির্ভাব কাল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপ-নির্ব্বাণ ওই সময় প্রকাশিত হয়। ক্রম অনুসারে স্বর্ণকুমারী বিরচিত কয়েকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের চিত্রলিপি ও সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উল্লেখ করা হল। সব তথ্য আখ্যাপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়নি। কিছু কিছু তথ্য অন্য সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পুস্তক প্রণয়নকালে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান এই গ্রন্থ পরিচিতির মধ্যে পাওয়া যায়, উপহার পত্রটি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উপহার পত্রটি হল লেখিকার প্রীতি ও সৌহৃদতার নিদর্শন। সাধারণ পাঠক এই উৎসর্গ বা উপহার পত্রের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেন না কিন্তু বিষয়টি উপেক্ষার নয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থগুলিতে উৎসর্গ না লিখে উপহার কথাটি লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও উৎসর্গ কথাটি না লিখে বহু ক্ষেত্রে উপহার কথাটিই ব্যবহার করেছেন। এই উপহারগুলি সবই আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষ স্বর্ণকুমারীকে জানতে হলে এই উৎসর্গের বিষয়টি ভাল করে অনুধাবন করা দরকার।

এই সঙ্কলনের মাধ্যমে তৎকালীন পুস্তক প্রকাশ, প্রণয়নের একটি সামগ্রিক রূপরেখা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

দীপ-নির্ব্বাণ

দীপ-নির্ব্বাণ / [উপন্যাস] / দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৮০৫ শক [১২৯০ সাল]।

দীপ-নির্ব্বাণ : স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালে (ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬), পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২১।

মূল্য : গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

পৃষ্ঠা : সম্মুখচিত্র, আখ্যাপত্র, উপহার (৬) + উপক্রমণিকা (৯) + ৩১৬ + Opinions of the press (২৯)

উপহার : শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু।

মেজদাদা।
উপহার সমর্পিনু সোহাগে যতনে,
লহ হাসি মুখে, নিরখিব সুখে,
সে মধুর স্নেহহাস্য সদা জাগে মনে—
যে হাসি দেখিলে, হৃদয় সলিলে,
ফুটিবে হরষপদ্ম অপূর্ব্ব শোভনে।
হায়, সে বিনোদ হাসি বড় সাধ মনে।
কিন্তু বা কেমনে কহি হাসিতে আবার!
আর্য্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়াছে চলি,
ঢেকেছে ভারতভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল!

বসন্ত উৎসব

বসন্ত উৎসব/গীতিনাট্য/দ্বিতীয় সংস্করণ।
প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
প্রকাশকাল : ১৮০৩ শক [১২৮৮ সাল]।
বসন্ত উৎসব গীতিনাট্যের প্রথম প্রকাশ ১৮০১ শক
[১২৮৬ সাল]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০
মূল্য : আখ্যাপত্রে উল্লেখ নেই।
পৃষ্ঠা : আখ্যাপত্র, উপহার ইত্যাদি (৬) + ৪১ + Opinions of the press (১১)
উপহার :

ভাই বিহঙ্গিনি,
সখিলো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে, লো, তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি—বিহগি আমার।

* ভাই বিহঙ্গিনি সম্বোধিত মহিলা হলেন স্বর্ণকুমারীর এক পাতান সখি; অ্যাটর্নি-কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী লেখিকার নিকট এই নামে পরিচিত ছিলেন।

ছিন্নমুকুল

ছিন্নমুকুল/উপন্যাস।
প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকাল : [৪ নভেম্বর ১৮৭৯]।

ছিন্নমুকুল 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮৫ পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৮৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত। তৃতীয় সংস্করণে ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নূতন রূপে প্রকাশিত হয়।

মূল্য : আখ্যাপত্রে উল্লেখ নেই।

পৃষ্ঠা ; সম্মুখচিত্র, আখ্যাপত্র, উপহার (৬) + ২৩৮ + Opinions of the press (২)

উপহার :

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিদাদা,

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-ভরে আজিকে তোমার করে
দলিত-কুসুম-কলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি?—এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি-সনে।

পৃথিবী

পৃথিবী / বৈজ্ঞানিক পুস্তক।

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : আশ্বিন ১২৮৯।

মূল্য : এক টাকা।

পৃষ্ঠা : সম্মুখচিত্র, আখ্যাপত্র, উপহার (৬) + সূচিপত্র (৪) + ভূমিকা (৪) + উপক্রমণিকা (২৪) + ১৮৪ + Opinions of the press (১৪)

উপহার :

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতৃদেব শ্রীচরণ কমলেষু।

খেলিতে খেলিতে ক্ষুদ্র শিশুটি যেমন
পেয়ে কোথা কাঁচ ভাঙ্গা, মাটী বা উপল রাঙ্গা,
কি জানি কি মহামূল্য ভাবিয়ে রতন,
মনের আগ্রহে ছুটি, বার বার পড়ি উঠি,
সঁপে আসি' মার করে সে অমূল্য ধন।

বিজ্ঞান জগত মাঝে স্খলিত চরণ,
ক্ষীণ হস্ত বাড়াইয়ে কি পাইনু কুড়াইয়ে,
দেখ দেব একবার মেলিয়ে নয়ন।
মা আমার নাই আর, ছুটে যাব কাছে যাঁর,
জনক-জননী দেব তুমিই আমার।
পূজিতে চরণ তব আজিকে আগ্রহে নব
এসেছি পিতা গো নিয়ে এই উপহার!

হুগলীর ইমামবাড়ী

হুগলীর ইমামবাড়ী/ঐতিহাসিক উপন্যাস।

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : পৌষ ১২৯৪। [৪ নভেম্বর ১৮৭৯]।

উপন্যাসখানি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (১২৯১ পৌষ—১২৯৩ বৈশাখ)

মূল্য : একটাকা চারি আনা।

পৃষ্ঠা : আখ্যাপত্র, সম্মুখচিত্র, উপহার, চিত্র (৮) + ২৫৬

উপহার :

তোমায়,
সংসারের সুখ দুঃখ, সংসারের হাসি,
সংসারের মোহমায়া ভালবাসাবাসি,
এ সব চাহ না কিছু, উর্দ্ধে আছ তার,
করুণ-নয়নে তবু কেন অশ্রুধার।
ও অশ্রু নহে ত সুখে অভিনব আশ,
ও অশ্রু নহে ত তীব্র বাসনা-পিয়াস,
বিমল করুণা ধার ঐ অশ্রু জল,
দুঃখের জগতে করে আশীষ-মঙ্গল।
ও করুণ আঁখি তুলে চাহ একবার,
জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি— জীবন মরণ-প্রীতি—
এনেছি চরণে দেব, দিতে উপহার।

কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা

কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা।

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। ১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ভারত যন্ত্রে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : ১৯০১ খ্রীঃ [১৩০৮ সাল]। জ্যৈষ্ঠ মাস।

মূল্য : দেড় টাকা।

পৃষ্ঠা : আখ্যাপত্র, উপহার, (৪) + ৮১ + শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন (১)

উপহার :

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে।
ধর স্নেহ উপহার
স্নেহময়ি, রাণি,
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীন গন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ
আমার যা বাণী,

সকলি তোমার কাছে
আদরের জানি।

ফুলের মালা

ফুলের মালা / [উপন্যাস]

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। অপার সারক্যুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে 'ভারতী যন্ত্রে' শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : মাঘ ১৩০১।

ফুলের মালা নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি উপন্যাস 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত। অসম্পূর্ণ অবস্থায় এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১২৯৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে একই নামে আরেকটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র ১২৯৯ এর ২৬৩ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, 'কয়েক বৎসর পূর্বে ফুলের মালা নামক যে উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এখানি নামে এক হইলেও রূপান্তরপ্রাপ্ত নূতন গল্প।'

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ১২৯৯ সালের পত্রিকায় মুদ্রিত 'ফুলের মালা'ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ফুলের মালা উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Fatal Garland' নামে Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (১৯০৯ এপ্রিল— ডিসেম্বর) গ্রন্থের অনুবাদিকার নাম ক্রিস্টিনা আলবার্স।

মূল্য : এক টাকা চারি আনা।

পৃষ্ঠা : প্রচ্ছদ আখ্যা, আখ্যাপত্র, উপহার (৬) + ১৫৯

উপহার :

সখি,
এ ফুলের মালা গাছি
বহুদিন ধরে—
লুকান রয়েছে গাঁথা
হৃদয়ের পরে।
আজ ধরিতেছি খুলি,
ছিন্ন ভিন্ন দলগুলি;
অনাদরে লবে তুলি—
অথবা আদরে?

কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় সখিকে সম্বোধন করে এই উপহারটি লেখা।

কবিতা ও গান

কবিতা ও গান।

প্রকাশক ও মুদ্রক : কলিকাতা। অপার সারক্যুলর রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে "ভারতী

যন্ত্রে" শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : কার্ত্তিক ১৩০২।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্বে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছে এবং দুই চারটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল "বসন্ত উৎসবে"র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই;

প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজি ভাব লইয়া রচিত।

অনবধানতাবশতঃ দুই একটি গান একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

মূল্য : দুই টাকা।

পৃষ্ঠা : আখ্যাপত্র, উপহার, বিজ্ঞাপন (৬) + সূচীপত্র (৪) + ২৪০ + শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী (১)

উপহার :

ভাই,
সামান্য এ উপহার, যোগ্য নহে তব!
শুষ্ক ফুল দু চারিটি, নাহি বাস নব;—
তবু যদি লহ হর্ষে, ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস স্বভাবে পুন হাসিবে এ সব!

An Unfinished Song

An Unfinished Song/ উপন্যাস /দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক ও মুদ্রক : New York. The Macmillan Company. The London and Norwich Press Limited London and Norwich কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯১৪ [১৩২১]

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় T. Werner Laurie Ltd. London কর্তৃক ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে। ইহা 'কাহাকে ?' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং।

মূল্য : গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

পৃষ্ঠা : অর্ধ আখ্যাপত্র, সম্মুখচিত্র, আখ্যাপত্র (৬) + ২১৯



‘ভারতী’ পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা : একটি নির্দেশিকা

স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত পর্ব

সংকলক দেবাশিস্ মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভার এক অন্যতম কীর্তি ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা। ‘ভারতী’ তদানীন্তন সময়ে বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র, যার আয়ু অর্ধশতাব্দী কাল। অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশিত এই পত্রিকার দীর্ঘতম সময়ের (দুটি পর্বে) সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। শুধু দীর্ঘতম সময় সূত্রেই নয়, পত্রিকা সম্পাদনার কৃতিত্ব গৌরবেও স্বর্ণকুমারী ও ‘ভারতী’ নাম দুটি অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্কে আজও জড়িত।

‘ভারতী’ যে সব সৃষ্টিসম্ভারে সমুজ্জ্বল— তার মধ্যে পুস্তক সমালোচনা এক বিশেষ দিক। ভারতী প্রকাশের সূচনা (১২৮৪) পর্ব থেকে প্রাক্ স্বর্ণকুমারী (১২৯০) পর্ব পর্যন্ত এর আখ্যাপত্রে উল্লেখ ছিল : ‘মাসিক সমালোচনী পত্রিকা’। স্বর্ণকুমারী তাঁর আমল থেকে ভারতীর আখ্যাপত্রের এই প্রজ্ঞাপন ব্যবহার করেননি কিন্তু পত্রিকার ‘সমালোচনী’ দায়িত্ব পালন করে গেছেন; এবং প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই অনেক পুস্তক সমালোচিত হয়েছে। আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীর আমলে ‘ভারতী’ পত্রে প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করলাম।

স্বর্ণকুমারী ১২৯১ থেকে ১৩০১ এবং ১৩১৫ থেকে ১৩২১ এই সময় পর্বে ‘ভারতী’ সম্পাদনা করেন। বর্তমান নির্দেশিকা প্রস্তুতকালে ভারতীর— ১৩০০, ১৩০১ এবং ১৩২১ এই তিনটি সংখ্যা আমাদের হাতে ছিল না। তাই এই তিন বছরের নির্দেশিকা প্রস্তুত সম্ভব হয়নি। সম্পাদক হিসেবে স্বর্ণকুমারী পুস্তক সমালোচনার দায়িত্বে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি। দপ্তরে যে কোনও ধরনের যত পুস্তকই এসেছে, সেগুলি সবই যে ভারতীতে সমালোচিত হয়েছে এমন কথা সহজেই মনে করতে পারি। হয়ত বা সময় বেশি লেগেছে কিন্তু কোনও পুস্তকই তিনি উপেক্ষা করেননি। এই সূত্রে সম্পাদকের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। একটি পুস্তক সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ‘প্রায় এক বৎসর হইল বইখানি আমাদের হাতে আসিয়াছে কিন্তু স্থানভাব বশত এতদিন ইহার সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারি নাই— যে জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি।’ (৪৯ পৃ. বৈশাখ ১২৯২)।

আমাদের প্রস্তুত নির্দেশিকাতে দেখা যায় স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় (ওই তিন বৎসর বাদে) ৬২৯ খানি পুস্তক (দু’ একটি সাময়িক পত্র-সহ) সমালোচিত হয়েছে। দু-একটি সংখ্যায় একখানি পুস্তকও আছে। এই দীর্ঘ সময়ে সবচেয়ে বেশি পুস্তক সমালোচিত হয়েছে ১৩১৭ সালের কার্তিক সংখ্যায়। পত্রিকার পরপর পাঁচটি (৬১৬-৬২০) পৃষ্ঠা জুড়ে কুড়িখানি পুস্তক সমালোচিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রে পুস্তক সমালোচনার যে নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হল তার প্রথমে গ্রন্থের নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থ রচয়িতার নাম লেখা হল। তার সমালোচকের নাম থাকলে তা ‘সমা’ বলে নির্দেশিত করা গেল। এ ছাড়া পুস্তকের সঙ্গে যে সব সাময়িক পত্র সমালোচিত হয়েছে তা-ও এই নির্দেশিকায় সংযুক্ত হল।

১২৯১ *শ্রাবণ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮৩।* ক. নারীনীতি (ঈশান চন্দ্র বসু)। খ. **প্রকৃতি বিজ্ঞান** (সূর্য্য কুমার অধিকারী)। গ. **তর্পস্বিনী** (সাময়িক পত্র)। ঘ. **বস্তুবিদ্যা** (সাময়িক পত্র)।

১২৯১ *আশ্বিন। ক-গ পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮০।* ক. **সংগীত সংগ্রহ**-২খণ্ড। খ. **স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন** (শ্রীমতী গুণময়ী)। গ. **ভাষাশিক্ষা**।

১২৯১ *কার্তিক। ক-চ পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৮।* ক. **রাজতরঙ্গিনী** (লোকনাথ ঘোষ) সমা— কৈলাশ চন্দ্র সিংহ। খ. **সৎসঙ্গ** (সাময়িক পত্র)। গ. **পতাকা** (সাময়িক পত্র)। ঘ. **আদর্শ নারী** (নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস)। ঙ. **সাধন বিন্দু** (সীতানাথ দণ্ড)। চ. **শোভনা**— ১ম ভাগ (হরিদাস ভারতী)।

১২৯১ *অগ্রহায়ণ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৭৬।* ক. **কুসুম মালা** (গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ)। খ. **ভগ্ন আশা** (শ্রীতশাহু দোল হোসেন)। গ. **কবিতা পাঠ**-১ম ভাগ (মধুসূদন সরকার)। ঘ. **বঙ্গগৃহ** (সীতানাথ নন্দী)।

১২৯১ *পৌষ। ক-ঘপৃষ্ঠা ৪২৪।* ক. **মিশর যাত্রী** (শ্যামলাল মিত্র)। খ. **বিবিধ সন্দর্ভ** (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। গ. **গৃহ মুকুর**-১ম ভাগ (রামদয়াল সেন)। ঘ. **চারুনীতি পাঠ** (কালীকৃষ্ণ দত্ত)।

১২৯১ *মাঘ। কপৃষ্ঠা ৪৭২।* ক. **গৃহলক্ষ্মী** (গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী)।

১২৯১ *ফাল্গুন। ক-খ পৃষ্ঠা ৫২২।* ক **বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী** (অমূল্য নারায়ণ ঘোষ)। খ. **শরৎ কুমারী অথবা বঙ্গ মহিলা**।

১২৯২ *বৈশাখ। ক পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।* ক. **হিন্দুইজম** (সুকুমার হালদার)।

১২৯২ *জ্যৈষ্ঠ। ক-খ পৃষ্ঠা ১৪৮।* ক **বাসুদেব বিজয়** (রামনাথ তর্করত্ন)। খ. **কৃষি গেজেট** (সাময়িক পত্র)।

১২৯২ *ভাদ্র। ক-ড পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮।* ক. **ধর্ম-জিজ্ঞাসা** (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। খ. **প্রাকৃতিক ইতিহাস** (প্রমথনাথ বসু)। গ. Grammer and Composition। ঘ. **রাজস্থানের ইতিহাস** (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)। ঙ. **জীবনী সংগ্রহ** (অমৃতলাল বসু)। চ. **নারী পূজা**। ছ. **শ্রীমদ্ভগবদগীতা** (অনু-কৈলাস চন্দ্র সিংহ)। জ. **পরিণাম** (সাময়িক পত্র)। ঝ. **গোপালন** (কমল কৃষ্ণ সিংহ)। ঞ. **সুবর্ণ বণিক** (নিমাই চাঁদ শীল)। ট. **বিষাদ মুকুল** (রাজকৃষ্ণ মিত্র)। ঠ. **রত্নমালা**-১ম ভাগ (রাধানাথ মিত্র)। ড. **বণিক দুহিতা** (নকুড় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১২৯২ *পৌষ। ক পৃষ্ঠা ৪৪০-৪৪২।* ক. **রত্নরহস্য** (রামদাস সেন)।

১২৯২ *মাঘ। ক-জ পৃষ্ঠা ৪৯৩-৪৯৪।* ক. **ভারত রহস্য** (রামদাস সেন)। খ. **জীবনের সদ্ব্যবহার** (নীলকমল মুখোপাধ্যায়)। গ. **স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্য তত্ত্ব**-১ম ভাগ (ধর্মদাস বসু)। ঘ. **সরল শিশুপালন ও শিশু চিকিৎসা** (পুলীন চন্দ্র সান্যাল)। ঙ. **তারা বিজয়** (অক্ষয়কুমার বসু)। চ. **ইন্দু প্রভা** (জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায়। ছ. **জীবতত্ত্ব** (জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায়)। জ. **ভারত সীমান্তে রুশ**।

১২৯২ **ফাল্গুন।** *ক-খ পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৪৬।* ক. **হিন্দু শাস্ত্র জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড** (বিপিন বিহারী ঘোষাল)। খ. **বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ** (নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস)।

১২৯২ *চৈত্র। ক পৃষ্ঠা ৫৯৩-৫৯৪*। ক. **বিষহরি পদ্মপুরাণ** (জীবন মৈত্র) সমা-মহেন্দ্র ভট্টাচার্য।

১২৯৩ *জ্যৈষ্ঠ। ক-গ পৃষ্ঠা ২২৬।* ক. **আশা কানন** (গোবিন্দ মোহন বাগচি)। খ. **প্রেমশিক্ষা** (দীননাথ মজুমদার)। গ. ভারত কুসুম।

১২৯৩ *আশ্বিন। ক পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৬৬।* ক. **ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ** (সম্পা-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

১২৯৩ *অগ্রহায়ণ। ক-খ পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৯৪।* ক. **পূর্ব্বাকাশে শুকতারা** : সমা-আশুতোষ চৌধুরী। খ. **সাধন সঙ্গীত** (সম্পা-কৈলাস চন্দ্র সিংহ)।

(পত্রিকা পৃষ্ঠায় গ্রন্থ দুটি সমালোচনা কালে ভুলবশত সমালোচক আশুতোষ চৌধুরীর নামটি দ্বিতীয় বইটির আলোচক হিসাবে ছাপা হয়। পরবর্তী পৌষ (১২৯৩) সংখ্যায় ভারতীর সম্পাদিকা এই ভুল

সংশোধনের বিজ্ঞাপন দেন : 'অগ্রহায়ণ মাসেব ভারতী ও বালকে যে দুইটি সমালোচনা বাহির হয়, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চৌধুরী তাহার প্রথমটির সমালোচক কিন্তু ভ্রমবশত তাঁহার নামটি সেই সমালোচনার নীচে ছাপা না হইয়া দ্বিতীয়টির নীচে ছাপা হইয়া গিয়াছে।' আমরা এই বিজ্ঞাপন মতে 'ঐ' নামটি যথাস্থানে ব্যবহার করলাম।

১২৯৩ *ফাল্গুন। ক-গ পৃষ্ঠা ৬৮৪-৬৯০।* ক. **সাবিত্রী** (সম্পা-গোবিন্দবাবু) সমা-আশুতোষ চৌধুরী। খ. **বিষাদ সিন্ধু** (মীব মশাবরফ)। গ. **ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী**-২য় ভাগ (সংগ্রহ- নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়)।

১২৯৪ *বৈশাখ। ক-খ পৃষ্ঠা ৬৪।* ক. **বাল্যজীবন**-১ম ভাগ। খ. **মনোমোহন গীতাবলী** (সঙ্কলক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)।

১২৯৪ *জ্যৈষ্ঠ। ক-ঝ পৃষ্ঠা ১২০-১২৬।* ক. **সমালোচনা মালা** (যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়)। খ. **ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত** (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। গ. **বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন**। ঘ. **পিশাচ সহোদর**-১ম খণ্ড। ঙ. **ভারত কোকিল** (তারিণী চরণ সেন)। চ. **বিগত স্বপন**। ছ. **উদগীতা** (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী)। জ. **উপহার** (নগেন্দ্রনাথ সেন)। ঝ. **আমি ভালবাসি বা ভালবাসা** (অমৃতলাল বসু)।

১২৯৪ *আষাঢ়। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৬।* ক. **সরল পদার্থ বিজ্ঞান** (যোগেশ চন্দ্র রায়) সমা-ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। খ. **ভারত ইতিবৃত্ত সার** (শ্রীনাথ সিকদার)। গ **সেক্সপীয়ারের গল্প**-১ম ভাগ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)। ঘ **বসন্ত নির্ণয়** (গোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

১২৯৪ *শ্রাবণ। ক পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪৮।* ক **ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া**।

১২৯৪ *ভাদ্র। ক পৃষ্ঠা ৩০৫-৩১৪।* ক. **বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ** (অনু-কালীবর বেদান্ত বাগীশ) সমা-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৯৪ *আশ্বিন। ক-গ পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৬৩।* ক. **বাঙ্গালীর ছবি** (শ্রীযুক্ত 'আমার')। খ. **শক্তিকানন** (শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার)। গ. **অশ্রুকণা** (গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী)।

১২৯৪ *কার্তিক। ক-চ পৃষ্ঠা ৪২১-৪২২।* ক. **মানস প্রবাহ** (হেমচন্দ্র ঘোষ)। খ. **গীতিকবিতা** (ভবানী চরণ ঘোষ)। গ. **মায়াবিনী** (নিত্যকৃষ্ণ বসু)। ঘ. **জাগো মা আমার** (বিজয় লাল দত্ত)। ঙ. **বিসর্জন** (নগেন্দ্রনাথ সেন)। চ. **ভুল** (অক্ষয়কুমার বড়াল)।

১২৯৪ *অগ্রহায়ণ। ক পৃষ্ঠা ৪৮১-৪৮৫।* ক. **জীবন প্রদীপ উপন্যাস** (বিধুচরণ চট্টোপাধ্যায়) সমা-শ্রী দাস।

১২৯৪ *পৌষ। ক-গ পৃষ্ঠা ৫৪১-৫৪৪।* ক **মা ও ছেলে** (চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়)। খ. **আত্মচিন্তা** (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। গ. **রৈবতক** (নবীন চন্দ্র সেন)।

১২৯৪ *মাঘ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৬০৪।* ক. **মহাত্মা জন হাওয়ার্ড** (শ্রী চরণ চক্রবর্তী)। খ. **ভগিনী ডোরা**। গ. **বুদ্ধদেব চরিত** (গিরীশ চন্দ্র ঘোষ)। ঘ **নলদময়ন্তী** (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ)।

১২৯৪ *ফাল্গুন। ক পৃষ্ঠা ৬৬২-৬৬৪।* ক. **তামাকের গুণ ও দোষ** (সাতকড়ি দত্ত)।

১২৯৪ *চৈত্র। ক পৃষ্ঠা ৭২৪।* ক. **আফগান বিবরণ** (কেশবচন্দ্র আচার্য)।

১২৯৫ *বৈশাখ। ক-গ পৃষ্ঠা ৫৯-৬১।* ক. **হারমোনিয়াম শিক্ষা** (উপেন্দ্রকিশোর রায়)। খ. **ক্ষুদিরাম** (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। গ. **ফুলহার** (রামলাল চক্রবর্তী)।

১২৯৫ *আষাঢ়। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০।* ক. **অমৃত পুলিন**। খ. **ললনা সুহৃদ** (সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী)। গ. **শঙ্করাচার্য** (অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী)। ঘ. **সাহিত্য প্রসুন** (সংগ্রহ নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়)।

১২৯৫ *শ্রাবণ। ক-ছ পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৭।* ক. **কিরণময়ী**। খ. **কবিতা পাঠ**। গ. **অবসর বিকাশ**। ঘ. **কারারুদ্ধ বালরাজ** (মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত)। ঙ. **সুরাপান বা বিষপান**। চ. **ভারতের গোধন রক্ষা**। ছ. **বিটকেলের দপ্তর** (বিপিন বিহারী বসু)।

১২৯৫ অগ্রহায়ণ। ক পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৭৮। ক **বিজ্ঞান প্রবেশ** (অনু-কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১২৯৫ পৌষ। ক পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৭। ক. **ক্রীড়া ও কৌতুক** (সাময়িক পত্র)।

১২৯৫ মাঘ। ক-গ পৃষ্ঠা ৫৯৩-৫৯৬। ক. **প্রেম ও ফুল** (গোবিন্দ চন্দ্র দাস)। খ. **প্রকৃতির শিক্ষা**। গ. **বিষাদ সিন্ধু** (মীর মশাররফ হোসেন)।

(বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ভারতী পত্রিকার এই সংখ্যায় ৫৮৯ ৫৯২ পৃষ্ঠা নেই। কাজেই এই পৃষ্ঠাগুলিতে সমালোচিত পুস্তকের তালিকা দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

১২৯৫ চৈত্র। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৬৯৭-৬৯৮। ক. **মা ও ছেলে** ২য় ভাগ (চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়)। খ. ....**ক্রম** (বিপিন বিহারী ঘটক)। গ **নীতিহার** (কেদারনাথ সরকার)। ঘ. **পুণ্যের জয়**। ঙ **গোজীবন** (মীর মশাররফ হোসেন)।

১২৯৬ বৈশাখ। ক-গ পৃষ্ঠা ৬০-৬২। ক **নারীতত্ত্ব** (বরদাকান্ত মজুমদার)। খ. **রমণী**। গ **সবিরাম ও অপরাপর জ্বর ও আনুষঙ্গিক রোগের ভৈষজ্য গুণ সংগ্রহ**।

১২৯৬ আশ্বিন। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৩৫৬। ক **সংঘারাশ্রম** (হারাণচন্দ্র রক্ষিত)। খ. **রত্নাবলী** (জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী)। গ. **কবিতাহার** (দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ)। ঘ **বিজন সঙ্গীত**। ঙ. **কবিতা** (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)।

১২৯৬ কার্ত্তিক। ক পৃষ্ঠা ৪০৮-৪১৬। ক. **পরম কল্যাণ গীতা** (শিবনারায়ণ স্বামী)।

১২৯৬ মাঘ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৫৮১-৫৮২। ক. **ছায়াময়ী পরিণয়** (শিবনাথ শাস্ত্রী)। খ. **বনফুল** (হেমেন্দ্র সিংহ)। গ. **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা** (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঘ. **গণিত প্রবেশিকা** (সিদ্ধেশ্বর দাস)।

১২৯৭ আষাঢ়। ক-ঙ পৃষ্ঠা ১৬৬-১৭০। ক. **আভাষ** (গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী)। খ. **হিমানী**। গ **প্রবাদ সংগ্রহ** (কানাইলাল ঘোষাল)। ঘ. **জয়দেবের গীতগোবিন্দ** (অনু-গিরিধর)। ঙ. **সিন্দুর বিন্দু** (সুরেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত)।

১২৯৭ ভাদ্র। ক-চ পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০০। ক. **একঘরে** (দ্বিজেন্দ্র লাল রায়)। খ. **প্রমীলা**। গ **ভাব ও চিন্তা** (ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ)। ঘ. **আদি রমণী**। ঙ **দার্জিলিং ভ্রমণ**। চ. **প্রেমবন্ধন বা কবিতার বিবাহ** (নটেন্দ্র ভূষণ মজুমদার)।

১২৯৭ মাঘ। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৫৬৪-৫৬৯। ক. **শ্রীমদ্ভগবদগীতা**। খ. **আত্মবোধ** (শ্রী শঙ্করাচার্য)। গ. **শিশুরঞ্জন রামায়ণ** (নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য)। ঘ. **বিষাদ সঙ্গীত** (বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়)। ঙ. **যোগা** (হরিদাস চট্টোপাধ্যায়)।

১২৯৮ বৈশাখ। ক-ঝ পৃষ্ঠা ৫৯-৬৩। ক. **সীতা** (অবিনাশ চন্দ্র দাস)। খ **উদাসীন পথিকের মনের কথা** (মীর মশাররফ হোসেন)। গ. **ছিন্ন আশা** (যতীন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী)। ঘ **অভিলাষ কুসুম** (বিনয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঙ. **বিকাশ** (সুরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু)। চ. **ঊষা চিন্তা** (স্বর্ণময়ী গুপ্তা)। ছ **এমার্সন সন্দর্ভ**। জ. **অপচয় ও উন্নতি** (বিষ্ণুচরণ মৈত্র)। ঝ **পাতঞ্জল যোগসূত্র**।

১২৯৮ আষাঢ়। ক পৃষ্ঠা ১৭৭। ক **যোগনাথ**।

১২৯৮ শ্রাবণ। ক পৃষ্ঠা ২২৫-২৩৫। ক. **ত্রিধারা** (চন্দ্রনাথ বসু)-সমা-যোগিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

১২৯৮ ভাদ্র। ক পৃষ্ঠা ২৯৩। ক. **জগন্নাথের মূর্তি প্রকাশ**।

১২৯৮ মাঘ। ক পৃষ্ঠা ৫৭৩-৫৭৪। ক **দেহাত্ত্বিক তত্ত্ব** (ডাক্তার সাহা) সমা-প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

১২৯৯ বৈশাখ। ক-গ পৃষ্ঠা ৫৯-৬১। ক. **উন্মাদিনী**-১ম ভাগ (পশুপতি মিত্র)। খ. **নির্ঝর** (বিনয়কুমারী বসু)। গ. **প্রভাত কুসুম** (শরৎচন্দ্র ধর)।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ। ক-চ পৃষ্ঠা ১১৪-১১৮। ক **বীরমালা** (যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়)। খ. **মিহির** (সাময়িক পত্র)। গ. **আয়ুর্বেদ প্রবেশ** (রামচন্দ্র যোগবিশারদ কবিরাজ)। ঘ. **তরুবালা** (অমৃতলাল বসু)। ঙ. **রাজা বাহাদুর** (অমৃতলাল বসু)। চ. **নবীনা জননী** (প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়)।

১২৯৯ আশ্বিন। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৮। ক. **লালা গোলক চাঁদ** (সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু)। খ. **যুগল চিত্র**: গ. **মণিপুর প্রহেলিকা** (জানকীনাথ বসাক)। ঘ. **পঞ্চামৃত** (তারাকুমার কবিরত্ন)।

১২৯৯ অগ্রহায়ণ। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮২। ক. **প্রেমের জয়** (শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী)। খ **জীবন ছায়া**। গ. **দাসী** (সাময়িক পত্র)। ঘ. **নবগ্রাম**। ঙ. **স্ত্রী ধর্ম্মনীতি**।

১২৯৯ পৌষ। ক পৃষ্ঠা ৫৪২-৫৪৬। ক. **অশোকচরিত** (কৃষ্ণবিহারী সেন)।

১২৯৯ ফাল্গুন। ক পৃষ্ঠা ৬৭৪। ক **অপরিচিতের পত্র**:
**(চৈত্র মাসের শেষ পৃষ্ঠা পাইনি)*

১৩১৫ ভাদ্র। ক-গ পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮। ক **ধ্রুবতারা** (যতীন্দ্রমোহন সিংহ)। খ. **হোমশিখা** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। গ. **বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত** (পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১৩১৫ আশ্বিন। ক-জ পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৬। ক **ঠাকুরমার ঝুলি বা বাঙ্গালার রূপকথা** (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)। খ. **মা বা আহুতি** (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)। গ. **কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প** (সরোজ কুমারী দেবী)। ঘ. **বঙ্গীয় কবি** (কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত)। ঙ. **যৎকিঞ্চিৎ** (সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়)। চ. **সারথি** (সাময়িক পত্র)। ছ. **জগজ্জ্যোতি** (সাময়িক পত্র)। জ **সাহিত্য সংহিতা** (সাময়িক পত্র)।

১৩১৫ কার্তিক। ক-গ পৃষ্ঠা ৩৪৪। ক. **শারদোৎসব** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। খ. **নবরত্নমালা** (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। গ **ভুতুড়ে কাণ্ড** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)।

১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ক পৃষ্ঠা ৩৯২। ক **চীন ভ্রমণ** (ইন্দুমাধব মল্লিক)।

১৩১৫ মাঘ। ক-জ পৃষ্ঠা ৪৭০ ৪৭৩। ক **ঠাকুরদাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতকথা** (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **ভারত চিত্র গ্রন্থাবলী** (কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **আর্য্যনারী** (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ **হস্তলিপি লিখন প্রণালী** (শিবরতন মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **তীর্থ সলিল** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **আমপারা** (কিরণগোপাল সিংহ) সমা-সত্যব্রত সিংহ। ছ **অবসর** (ফুলকুমারী গুপ্ত) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। জ **প্রোফেসর বোসের অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত**: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৫ ফাল্গুন। ক-খ পৃষ্ঠা ৫৪০। ক. **জাপানী ফানুস** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)-সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **মুকুট** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭। ক **ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষ** (অনু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **সিদ্ধিতত্ত্ব বা কর্ম্মপথ** (কুমুদিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **লেখা** (যতীন্দ্রমোহন বাগচী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **রাখী করণ** (গঙ্গাচরণ নাগ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৬ আষাঢ়। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫। ক **স্বদেশ কুসুম**। খ **বিবাহ মঙ্গল** (বিধুশেখর শাস্ত্রী)। গ. **সারস্বতকুঞ্জ** (কেদারনাথ মজুমদার)। ঘ. **দেবালয়** (সাময়িক পত্র)।

১৩১৬ ভাদ্র। ক-ঘ পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৮। ক **ভারতীয় বিদুষী** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **কেশব জ্যোতি** (নিস্তারিণী দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ **সাজি** (হিমাংশু প্রকাশ রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ **সহধর্ম্মিনী** (ভোলানাথ কবিরত্ন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৬ আশ্বিন। ক-জ পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৭। ক. A Dying Race (U N Mookerjee) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ **ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র**: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র**: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **ভারত শিল্প** (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ **বিরাম কুঞ্জ** (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **আর্যনারী** (কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **মাধুরী**: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ **জীবনস্রোত না আশালতা**: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৬ কার্তিক। ক-ঠ পৃষ্ঠা ৪০৩-৪০৬। ক **গুরুগোবিন্দ সিংহ** (বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত

শর্ম্মা। খ. **বিদ্যাসাগর** (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **গাথা** (অবিনাশ চন্দ্র দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **সরল পূর্ত্তশিক্ষা** (কুঞ্জবিহারী চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **বালিকা নীতি** (সৈরিন্ধ্রীবালা ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **ঋদ্ধি** (জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **চয়নিকা** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **হোমিও গাথা** (শ্রীকূল চন্দ্র দে) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **নারায়ণী** (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **পৌরাণিক কথা** (পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **রামায়ণ** (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ. **সাবিত্রী** (কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

** 'ভারতী'র এই সংখ্যায় সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন : 'আমরা ভারতীর পাঠক পাঠিকাগণকে এই নারী লেখিকাগণের গ্রন্থ ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের মানস করিতেছি।' প্রভৃতি। তারপর এই সংখ্যার ৩৮৬-৩৮৮ এই তিন পৃষ্ঠা জুড়ে প্রসন্নময়ী দেবী-র জীবনী ও নিম্নলিখিত চারখানি পুস্তক সমালোচনা করেন।*

পুস্তকগুলির নাম : ক. **নীহারিকা**। খ. **আর্য্যাবর্ত্ত**। গ. **অশোকা**। এবং ঘ. **নীহারিকা**।

১৩১৬ *অগ্রহায়ণ। ক-জ পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭৩।* ক. **কল্পকথা** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। খ. **চাকমাজাতি** (সতীশচন্দ্র ঘোষ)। গ. **ভাষাতত্ত্ব** (শ্রীনাথ সেন)। ঘ. **দুর্গা** (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)। ঙ. **সতীলক্ষ্মী** (বিধুভূষণ)। চ. **বৈদ্যনাথ কথা**। ছ. **ম্যালেরিয়া** (সৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত)। জ. **সতী-শতক** (নির্ম্মল বালা চৌধুরানী)।

১৩১৬ *পৌষ। ক-গ পৃষ্ঠা ৫৪০।* ক. **সরল বিজ্ঞান সোপান** (কুঞ্জবিহারী)। খ. **কাদম্বরী** (তারাশঙ্কর তর্করত্ন)। গ. **সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব** (বিশ্বেসর দাস)।

১৩১৬ *মাঘ। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৫৮৮-৫৯০।* ক. **বিক্রমপুরের ইতিহাস** (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। খ. **শিবাজী ও মারাঠা জাতি** (শরৎ কুমার রায়)। গ. **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়** (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। ঘ. **বেতাল পঞ্চবিংশতি** (ঈশ্বর চন্দ্র)। ঙ. **সূচনা** (গিরিজা প্রসন্ন রায়)।

১৩১৭ *বৈশাখ। ক-খ পৃষ্ঠা ৮৮।* ক. **মনীষা** (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) সমা-শ্রী.গ। খ. **দশচক্র** (সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়) সমা-শ্রী.গ।

১৩১৭ *জ্যৈষ্ঠ। ক-জ পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮।* ক. **গন্ধপুষ্প** (মতিলাল দাস)। খ. **শান্তিনিকেতন**-নবম ও দশম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। গ. **সীতার বনবাস** (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। ঘ. **শকুন্তলা** (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। ঙ. **সঙ্গীত দর্পণ** (সংকলন : পূর্ণচন্দ্র বসু)। চ. **ফরিদপুরের ইতিহাস**-১ম খণ্ড (আনন্দ নাথ রায়)। ছ. **যেমন-কে-তেমন** (সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়)। জ. **হিন্দু সমাজ**-১ম ও ২য় খণ্ড (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

১৩১৭ *আষাঢ়। ক-ঝ পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৬।* ক. **নকুড় বাবু** (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **দময়ন্তী** (বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **ঋণ পরিশোধ** (কালীপ্রসন্ন দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **সরলচণ্ডী** (কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **খোকাখুকুর খেলা** (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **চিত্ররেখা** (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **বিনিময়** (বীরেন্দ্রনাথ রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **রাবেয়া** (বীরেন্দ্রনাথ রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **সাবিত্রী** (শশাঙ্কমোহন সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৭ *শ্রাবণ। ক-ছ পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৭।* ক. **জীবনের দৃশ্যমালা** (ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা প্রণীত)। খ. **মোসলেম কর্ম্মবীর চরিতমালা**-১ম খণ্ড (হামেদ আলি)। গ. **বিলাত ভ্রমণ**-১ম ভাগ (ইন্দুমাধব মল্লিক)। ঘ. **ঋগ্বেদ সংহিতা** (অনু রামচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী)। ঙ. **বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান** (অঘোরনাথ অধিকারী)। চ. **জাপানী ফানুস** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। ছ. **টাক্ ডুমা ডুম ডুম** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)।

১৩১৭ *ভাদ্র। ক-ঠ পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪২।* ক. **ওয়াল-টেয়ার** ভিজাগাপত্তন (শ্রীদাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **মা** (মোহিনী রঞ্জন সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **অমর বাণী** (অনু বিনয়ভূষণ সরকার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ **বনফুল** (মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ **মানব জীবন** (নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **আমিষ ও নিরামিষ ভোজন** (সংকলন : কালীপ্রসন্ন সিংহ)। ছ. **উষারানী** (সীতানাথ চক্রবর্ত্তী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **মেঘদূত** (অনু নিতাই চাঁদ শীল) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **বীর বালক** (প্রফুল্লময়ী দেবী)

-সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **বেদান্তের আমি** (ভগবৎ দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট **পুরান দর্শন সূত্র-উপক্রমণিকা অথবা আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ** (ভুবন মোহন শর্ম্মা) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ **বঙ্গীয় নাট্যশালা** (ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৭ ***আশ্বিন। ক-ঝ পৃষ্ঠা।*** ক. **গীতাঞ্জলি** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। খ. **কাশীরাম দাসের চরিত্র মহাভারত** (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। গ. **মূর্ত্তিপূজা** (হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঘ. **শিখগুরু ও শিখজাতি** (শরৎকুমার রায়)। ঙ. **আল্পনা** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। চ. **বিষ্ণুপুরাণ** (অনু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ছ. **পরদেশী** (সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়)। জ. **পুষ্পপত্র** (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঝ. **তীর্থরেণু** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।

**এ ছাড়াও এই সংখ্যার ৫২৩ ৫৩২ এই দশ পৃষ্ঠা জুড়ে "অশ্রুকণা রচয়িত্রী" শিরোনামে গিরীন্দ্র মোহিনী দাসের জীবনী ও নয়খানি পুস্তক সমালোচিত হয়েছে।*

পুস্তকগুলির নাম : ক. **অশ্রুকণা**। খ. **আভাষ**। গ. **অর্ঘ্য**। ঘ. **শিখা**। ঙ. **সিন্ধুগাথা**। চ. **গণেশ বন্দনা**। ছ. **ভারত কুসুম**। জ. **কবিতাহার** এবং ঝ. **স্বদেশিনী**।

১৩১৭ ***কার্তিক। ক-ন পৃষ্ঠা ৬১৬-৬২০।*** ক. **ঝুমঝুমি** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **হৃদয় ও মনের ভাষা** (হেমেন্দ্রনাথ সিংহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব** (রামগতি ন্যায়রত্ন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **কবীর**-১ম খণ্ড (অনু ক্ষিতিমোহন সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ **সাবিত্রী** (কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **রেখা** (যতীন্দ্রমোহন বাগচী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **টুনটুনির বই** (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **আর্য্য বিধবা** (প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **গার্গী** (প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **বঙ্গের রত্নমালা** (কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **খোকার বই** (মোহিনীমোহন বসু) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ. **মেহের নেগার কাব্য** (আব্বাছ আলী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ড. **উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক** (অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঢ. **কায়স্থ দর্পণ**-১ম ভাগ (অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ণ. **শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা** (বিনয় কুমার সরকার) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ত. **ধ্রুব** (প্যারীশঙ্কর দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। থ. **সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত** (সঙ্কলন : সতীশচন্দ্র ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। দ. **অভিনয় প্রণালী ও অথার** (কৃষ্ণবিহারী দত্ত) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ধ. **সংসারী** (এন.সি.ব্যানার্জী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ন **খাদ্য** (চুনীলাল বসু) সমা-ইন্দুমাধব মল্লিক।

১৩১৭ ***অগ্রহায়ণ। ক-ঝ পৃষ্ঠা ৭০২-৭০৩।*** ক **পারস্য উপন্যাস** (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। খ. **রবিন্সন ক্রুশো** (অনু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। গ. **জোলেখা** (সংকলন . আব্দুল লতিফ)। ঘ. **শিশির** (হেমন্তবালা দত্ত)। ঙ. **জাপান** (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। চ. **আদর্শ রমণী** (শেখ আব্দুল জব্বার)। ছ. **মদিনা শরিফের ইতিহাস** (শেখ আব্দুল জব্বার)। জ. **শুক্লা** (সুখরঞ্জন রায়)। ঝ. **পুণ্যের জয়** (সুধাকৃষ্ণ বাগচী)।

১৩১৭ ***পৌষ। ক-জ পৃষ্ঠা।*** ক. **ঠগী কাহিনী** (অনু কুলদাপ্রসাদ মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **পাগলের কথা** (দেবেন্দ্রনাথ দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **কাননিকা** (ইন্দুপ্রভা) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **বৈভ্রাজিকা** (ইন্দুপ্রভা) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **পাপ ও পুণ্য** (কুমুদনাথ লাহিড়ী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **ইসলাম চিত্র** (সম্পাদক : শেখ আব্দুল জব্বার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **মক্কা শরীফের ইতিহাস** (শেখ আব্দুল জব্বার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা** (বিজয় নারায়ণ গুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৭ ***ফাল্গুন। ক-জ পৃষ্ঠা ৯৫৯-৯৬০।*** ক. **বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা** (শেখ আব্দুল জব্বার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **শিক্ষাকোষ ৫ম সংখ্যা** (মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **চণ্ডিকা বিজয়** (কমল লোচন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **পত্রলেখা** (প্রিয়ম্বদা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **শঙ্খ** (অক্ষয় কুমার বড়াল) সমা-শ্রী.গ। চ **পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু** (খগেন্দ্রনাথ মিত্র) সমা-শ্রী.গ। ছ. **প্রাকৃতিক চিকিৎসা** (দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য) সমা-শ্রী.গ। জ **গৃহধর্ম্ম** (বিদ্যাবতী আরিয়ার সরস্বতী) সমা-শ্রী.গ।

১৩১৭ ***চৈত্র। ক-ঠ পৃষ্ঠা ১০৪০-১০৪২।*** ক. **নদীয়া কাহিনী** (কুমুদনাথ মল্লিক)। খ. **সহজ সংস্কৃত শিক্ষা** (বনমালী বেদান্ততীর্থ)। গ. **মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত** (বঙ্ক বিহারী কর)। ঘ. **বঙ্গের কবিতা** (অনাথ কৃষ্ণ দেব)। ঙ. **বৈজ্ঞানিক পাকপ্রণালী** (ইন্দুমাধব মল্লিক)। চ. **শ্রীশ্রী ফলাহারতত্ত্বম** (সংকলন : জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ)। ছ. **আরব জাতির ইতিহাস**-১ম খণ্ড (শেখ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ)। জ. **শাহাজান** (রমণীরঞ্জন

দেব)। ঝ. **ঊষা** (বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদ)। ঞ **নবযুগের সাধনা** (কুলদা প্রসাদ মল্লিক)। ট. **কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব** (ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঠ. **মরণ রহস্য** (নিখিলনাথ রায়)।

১৩১৮ বৈশাখ। ক-খ পৃষ্ঠা ৯৮-১০০। ক **রচনা প্রণালী** (নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **আত্মবোধ** (উমেশ চন্দ্র মৈত্র) সমা-সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ। ক-ঙ পৃষ্ঠা ২০০। ক. **জ্যোতি** (হেমলতা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **এলোকেশী** (বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **মন্দার** (বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির** (যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ **শেফালীগুচ্ছ** (সুকুমারী দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৮ আষাঢ়। ক-গ পৃষ্ঠা ২৭৩। ক. **নির্ব্বাস কাহিনী** (মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ **ভারতীয় বিদুষী** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **ছেলেদের চণ্ডী** (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৮ শ্রাবণ। ক পৃষ্ঠা ৪০০। ক. মেঘনাদ বধ কাব্য (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

১৩১৮ ভাদ্র। ক-ঝ পৃষ্ঠা ৪৯৮-৫০০। ক. **ভাগ্যচক্র** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **ভূদেব জীবনী** সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **আঙুর** (পাঁচুলাল ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **ঝরাফুল** (করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **মেগাস্থিনাসের ভারত বিবরণ** (রজনী কান্ত গুহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা** (সাময়িক পত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **বঙ্গলক্ষ্মী** (অনুকূল চন্দ্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **পঞ্চপ্রদীপ** (সুবোধচন্দ্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **বাঙ্গলা বুককিপিং** (চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৮ আশ্বিন। ক-ঙ পৃষ্ঠা ৬২৬-৬২৮। ক সওগাত (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। খ. **ফুলের ফসল** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। গ. **ছোট্ট রামায়ণ** (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)। ঘ. **খৃষ্ট** (অজিত কুমার চক্রবর্তী)। ঙ. **নির্ঝর** (সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়)।

১৩১৮ কার্তিক। ক-চ পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৪। ক. **যূথিকা** (আমোদিনী ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **ভিখারিণী** (অমলা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **চীন ভ্রমণ** (ইন্দুমাধব মল্লিক) সমা-সত্যব্রত মল্লিক। ঘ. **মণিভদ্র** (প্রমথনাথ তর্কভূষণ) সমা-সত্যব্রত তর্কভূষণ। ঙ **ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ** (হেমেন্দ্রনাথ দেব) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **খাদ্য** (চুনীলাল বসু) সমা-ইন্দুমাধব মল্লিক।

১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৮২৩-৮২৪। ক. **প্রকৃতি পরিচয়** (জগদানন্দ রায়)। খ. **পাট ও নালিতা** (দ্বিজদাস দত্ত)। গ. **হেমলতা** (মনোরমা দেবী)। ঘ **গ্রহের ফের** (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)।

১৩১৮ পৌষ। ক-ধ পৃষ্ঠা ৮২৩-৮২৪। ক. **পৃথিবীর ইতিহাস-২য় খণ্ড** (দুর্গাদাস লাহিড়ী)। খ. **কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ** (সুধাকুমার ঘোষাল)। গ. **জীবন শিক্ষা** (জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ)। ঘ. **প্রথম শিক্ষা** (জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী)। ঙ. **কণা** (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। চ. **সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ** (দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত)। ছ. **অবকাশ** (রামসহায় কাব্যতীর্থ)। জ **তর্কবিজ্ঞান** (প্রকাশ চন্দ্র সিংহ)। ঝ **ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা** (বনমালী বেদান্ততীর্থ)। ঞ. **চিত্রকাব্য** (শ্রীপতিসুন্দর ঠাকুর)। ট. **সতীলক্ষ্মী** (অর্জুনচন্দ্র বসু)। ঠ. **পঞ্চকমালা** (বিজয় চন্দ্র মজুমদার)। ড. রাজা **রামমোহন রায়ের জীবনী** (শশিভূষণ বসু)। ঢ. **শান্তি**। ণ. **পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব** (বিনোদ বিহারী রায়)। ত. **বীরকুমার বধ কাব্য** (মানকুমারী)। থ. **মার্কাস তারিনিয়াসের আত্মচিন্তা** (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। দ. **সতীর পতিভক্তি** (মঞ্জুমা খায়রণ নেছা খাতুন)। ধ **সোহং গীতা** (সোহং স্বামী)।

১৩১৮ মাঘ। ক-গ পৃষ্ঠা ১০৩১-১০৩২। ক. **স্বাস্থ্যতত্ত্ব** (হরিনাথ ঘোষ) সমা-ইন্দুমাধব মল্লিক। খ. **গোধূলী** (ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী)। গ **অশোক** (চারুচন্দ্র বসু)।

১৩১৮ ফাল্গুন। ক-ঠ পৃষ্ঠা ১১২৯-১১৩২। ক. **কৃষি রসায়ন** (নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী)। খ. **মন বুলবুল** (সুশীল মালতী)। গ. **সর্বানন্দ** (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। ঘ. **ফোয়ারা** (ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঙ. **ব্যাকরণ বিভীষিকা**

(ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। চ. **পালি প্রকাশ** (বিধুশেখর শাস্ত্রী)। ছ. **জাপান প্রবাস** (মন্মথনাথ ঘোষ)। জ. **ভারত উচ্ছ্বাস বা রাজভক্তি** (শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত)। ঝ. **রাজ-আবাহন** (নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়)। ঞ. **রাজ-পূজা** (মহেন্দ্রনাথ মিত্র)। ট **সাত ভাই চম্পা**। ঠ Bangabasi College Magazine (সাময়িক পত্র)।

**এই সংখ্যার ক-ঠ পুস্তকগুলির সমালোচক সত্যব্রত শর্ম্মা।*

১৩১৮ চৈত্র। ক-চ পৃষ্ঠা ১২৩৫-১২৩৬। ক. ON FOOD & COOKING (I M MALLIK)। খ. **সমবায় বিভাগ**। গ. Speeches of this Majesty George the Fifth, delivered in India and the official Despatches (Surendranath Banerjee)। ঘ **শৈলজা** (অমৃতলাল প্রামাণিক)। ঙ **উৎসবে উপহার** (সুখব্রত গুপ্ত)। চ. **পূজার নির্ম্মাল্য** (সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

১৩১৯ বৈশাখ। ক-ঙ পৃষ্ঠা ১১১-১১২। ক. **আশীর্ব্বাদ** (রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **মিরণ** (সরলা বালা দাসী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। গ **বাণীর বরপুত্র নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিয়োগে সঙ্গীতাচার্য শ্রী দেবকণ্ঠ বাগচী বিরচিত শোকোচ্ছ্বাস** সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. Village Panchayet Scheme (Raj Kinga Lala Sing Saraswati) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা ঙ **স্বরবিবেক** (নিবারণ চন্দ্র হালদার) সমা-ইন্দিরা দেবী।

১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ক-ড পৃষ্ঠা ২২১-২২৪। ক ওঁ **সনাতন ধর্ম্ম সঙ্গীত** (অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ **গল্প চারিটি** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **শিশির** (ভুজঙ্গধর রায়) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **মঞ্জরী** (গিরিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **উপাসনার গুরুত্ব** (বসন্ত কুমারী বসু) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ **ওঁ জ্যোতিঃ পথ** (ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **ভারত কাহিনী** (রজনীকান্ত গুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **ভারত প্রসঙ্গ** (রজনী কান্ত গুপ্ত) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ **আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়** (রজনী কান্ত গুপ্ত)। ঞ. **হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়** (রজনী কান্ত গুপ্ত) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ট **মেরী কার্পেণ্টার** (রজনীকান্ত গুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ. **হিন্দু হোস্টেল কবি সম্মিলনী** (সাময়িক পত্র) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ড. **দরিয়া** (সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়) সমা-শ্রী গ।

১৩১৯ আষাঢ়। ক-খ পৃষ্ঠা ৩৩৮। ক. **করঙ্ক** (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **বৈতানিক** (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৯ শ্রাবণ। ক-খ পৃষ্ঠা ৪৫০। ক. **মৌনীবাবা** (নির্ঝরিণী ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার**-১ম খণ্ড (সৌরীন্দ্র কিশোর রায়) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৯ ভাদ্র। ক-থ পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৫৪। ক. **নির্বেদ** । (সরলা বালা দাসী)। খ **রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী** (শশিভূষণ বসু)। গ **ধ্রুব** (অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। ঘ **প্রসঙ্গ** (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ঙ. **তত্ত্ব জিজ্ঞাসা** (কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়)। চ. **নারীর ভাগ্যচিত্র**-১ম খণ্ড। ছ. **ছড়া ও গল্প** (ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। জ **গৌড় রাজমালা** (রামপ্রসাদ চন্দ)। ঝ. **ডালি** (এমজাদ আলী)। ঞ **সোনাবিবি** (শশিভূষণ বিশ্বাস)। ট. **কাছাড়ের ইতিবৃত্ত** (উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ)। ঠ. **রত্নাবলী** (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ড **সদালাপ** ১ম খণ্ড (মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়)। ঢ. **বাজে কথা** (সুশীলা সুন্দরী দাসী)। ণ. **সিদ্ধার্থ** (বিনয় ভূষণ সরকার)। ত. **বনতুলসী** (কুমুদ রঞ্জন মল্লিক)। থ **রূপকথা** (মনোজ মোহন বসু)।

১৩১৯ আশ্বিন। ক-ঠ পৃষ্ঠা ৬৬৮-৬৭২। ক **কুহু ও কেকা** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) সমা-শ্রী.গ। খ. **ঝাঁপি** (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-শ্রী.গ। গ. **ধূপছায়া** (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-শ্রী.গ। ঘ. **হানাযি** (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-শ্রী.গ। ঙ. **জন্মদুঃখী** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। চ **রেখাক্ষর বর্ণমালা** (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **মিবার গৌরব কথা** (হেমলতা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ **পুরীর চিঠি** (হেমদাকান্ত চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. Megasthines & Arrian সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ **কাহিনী** (গুরুদাস আদক) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **দেবদূত** (দেবকুমার রায়চৌধুরী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ A System of Indian Scientific Terminology Part-I (Manindra Nath Banerjee) সমা-ইন্দুমাধব মল্লিক।

১৩১৯ কার্তিক। ক-ছ পৃষ্ঠা ৭৮৭-৭৮৮। ক **চীনের ধূপ** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। খ. **সাঁঝের বাতি** (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)। গ. **নবীন সন্ন্যাসী** (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **আহলাদে আটখানা** (ললিত

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঙ. **হিন্দুস্থানী উপকথা** (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **নির্ম্মাল্য** (ইন্দিরা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **অর্থশাস্ত্র** (যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ক পৃষ্ঠা ৮৮১-৮৮৩। খ-ত পৃষ্ঠা ৮৮৯-৮৯২। ক. **পোষ্যপুত্র** (অনুরূপা দেবী) সমা-গোলক বিহারী মুখোপাধ্যায়।

**পুস্তকটি সমালোচনাকালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে : পোষ্যপুত্র "ভারতীতে দুই বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল— এক্ষণে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।"*

খ. **আলেখ্য** (ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **ভারত প্রদক্ষিণ** (দুর্গাচরণ রক্ষিত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **প্রাণের বেদনা** (শরচ্চন্দ্র দেব) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **গিরি কাহিনী** (প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **শৈব্যা** (মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **কিন্ডার গার্টন পুস্তক** (সম্পাদক : আর.ডি.বমওয়েস পি.এল) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **সারকথা** (হেমলতা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **সপ্তক** (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **রাজা দেবী দাস** (সত্যরঞ্জন রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **অভ্যাস যোগ** (ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঠ. **তমসা** (সতীশ চন্দ্র চৌধুরী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ড. **প্রবাহিনী** (ললিতমোহন সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঢ. **মন্দার কুসুম** (প্রফুল্ল নলিনী ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ণ. **গল্পের বই** (সুখলতা রাও) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ত. **বঙ্গের কবিতা** (অনাথ কৃষ্ণ দেব) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩১৯ পৌষ। ক পৃষ্ঠা ৯৯২-৯৯৪। ক. **গীতাঞ্জলি** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১৩১৯ মাঘ। ক-ঞ পৃষ্ঠা ১১০৪-১১০৬। ক. **এষা** (অক্ষয় কুমার বড়াল) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **মোহিনী বিদ্যা** (ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **কুহকিনী** (যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **বিচিত্রা** (কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **মহাভারতের বৃহৎ সূচী** (সঙ্কলক : জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **উৎসব** (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **ময়না কোথায়** (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **আমার খাতা** (ইন্দিরা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **সার্ব্বধর্ম্ম*** সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **নীলাম্বরী** (খগেন্দ্রনাথ মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

** সার্ব্বধর্ম্ম গ্রন্থটি সম্পর্কে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় : 'পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।'*

১৩১৯ ফাল্গুন। ক-ট পৃষ্ঠা ১২০৮-১২১০। ক. **চাণক্য-নীতিসার সংগ্রহ** (জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **জাতি বিকাশ** (পীতাম্বর সরকার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **দেবেন্দ্র মঙ্গল** (মোহিতমোহন মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **মর্ম্মভেদী** (সুরেশ্বরী দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **আদর্শ ছাত্রজীবন** (গৌরীপ্রসাদ মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **রঙ্গমহাল** (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **সাবিত্রী সত্যবান** (সুরেন্দ্রনাথ রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **শৈব্যা** (সুরেন্দ্রনাথ রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **রাক্ষস রহস্য** (উমেশচন্দ্র মৈত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **ভগীরথ** (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী** (কুমুদিনী মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ বৈশাখ। ক-ঘ পৃষ্ঠা ১১১-১১২। ক. **বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক** (শিবরতন মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **শুক্তি** (দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **আদর্শ মহিলা** (নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **শিখের কথা** (যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

** এই সংখ্যার পুস্তক সমালোচনা অংশে ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ঘোষণা করেন : "এই বৎসর হইতে আমরা উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরই বিশদভাবে সমালোচনা করিব।"*

১৩২০ জ্যৈষ্ঠ। ক-ঞ পৃষ্ঠা ২২২-২২৪। ক. **মিডিয়া** (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **খাজাঁহান** (ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **পদার্থ পরিচয়** (অঘোরনাথ অধিকারী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **পুষ্পরেণু** (হরনারায়ণ সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **বাঙ্গলার বেগম** (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **পারিজাত** (হবিবর রহমান) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **খেরীগাথা** (বিজয় চন্দ্র মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ **প্রাচীন ইতিহাসের গল্প** (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **আদ্যার গম্ভীরা** (হরিদাস পালিত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **মানস প্রসূন বা মায়াবতী** : সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ আষাঢ়। ক-ঘ পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫০। ক. **ইউরোপ ভ্রমণ** (নরেন্দ্রনাথ বসু) সমা-শ্রী সু। খ. **শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ**

গীতা (সঙ্কলন : বিজয়নাথ মজুমদার) গ. **বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার** (জগদানন্দ রায়)। ঘ. **ঋগ্বেদ সংহিতা** (রমেশচন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি)।

১৩২০ শ্রাবণ। ক-ছ পৃষ্ঠা ৪৬২-৪৬৪। ক. **তপতী** (জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **কারবালা** (আবদুল বারি) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **ঢাকার ইতিহাস** (যতীন্দ্রমোহন রায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **উজানি** (কুমুদ রঞ্জন মল্লিক) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **ডালি** (শরৎশশী মিত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **খুকুরাণীর ডায়েরী** (বিনোদিনী দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **পরিণাম** (সরলাবালা দেবী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ ভাদ্র। ক-ট পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৮৬। ক. **সোণায় অরুচি** (উমেশচন্দ্র মৈত্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **দেবব্রত** (কালী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **সদ্ভাব কুসুম** (রজনীকান্ত সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **ফরাসী বীরাঙ্গনা** (নগেন্দ্র কুমার গুহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **ধর্ম্মমঙ্গল** (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **স্নেহ উপহার** (হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী) সমা সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **সুভদ্রা** (বিধুভূষণ বসু) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **তপোবন** (জীবেন্দ্র কুমার দত্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **ধ্যানলোক** (জীবেন্দ্র কুমার দত্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **নদীয়া কাহিনী** (কুমুদনাথ মল্লিক) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।। ট. **শ্রীকণ্ঠ** (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ অগ্রহায়ণ। ক-জ পৃষ্ঠা ৯৪৩-৯৪৪। ক. **আকাশের গল্প** (যতীন্দ্রনাথ মজুমদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **আরব জাতির ইতিহাস**-২য় খণ্ড (শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **মন্দিরা** (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **নারী পঞ্চ-চত্বারিংশ** (শরৎ কুমার সিংহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **আদর্শ লিপিমালা** (আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **সম্রাট মার্কাস আরেলিয়াস আন্টোনিয়মের আত্মচিন্তা** (অনু : রজনীকান্ত গুহ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **কবিতা প্রসুন** (বলহরি ঘোষ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **আমার অশ্রুমালা** (তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ পৌষ। ক-জ পৃষ্ঠা ১০১৯-১০২২। ক. **গৃহিণী কর্ত্তব্য** (আনন্দ চন্দ্র সেন) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **বানান সমস্যা** (ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **অনুপ্রাস** (ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **উপমন্যু** (বিনয় ভূষণ সরকার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **আধুনিক সভ্যতা** (শিবেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **রাঢ়ীয় কুলক্রম**-১ম খণ্ড (সংগ্রাহক : চন্দ্রকান্ত ঘটক বিদ্যানিধি) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **ত্রিস্রোতা** সমা-শ্রী নঃ। জ. **স্বরলিপি গীতিমালা**-১ম ভাগ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) সমা শ্রী....দেবী।

১৩২০ মাঘ। ক-ঝ পৃষ্ঠা ১১৪৯-১১৫২। ক. **বিবাহ ও তাহার আদর্শ** (গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **আক্ষেপ** (তিলোত্তমা দাসী) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ সেবা: সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **অভিধানকল্প দীপিকা** বা **পালি শব্দকোষ** (সংগ্রাহক · জ্ঞানানন্দ স্বামী) সমা-সত্যব্রত শ র্মা। ঙ. **কালিনী** (যোগীন্দ্রনাথ সরকার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **কবিতা মঞ্জরী** (কেদারনাথ দত্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস** (বৃন্দাবন চন্দ্র পূততুণ্ড) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. **মাল্য ও নির্ম্মাল্য** : সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **শারীর স্বাস্থ্য-বিধান** (চুনীলাল বসু)-সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা।

১৩২০ ফাল্গুন। ক পৃষ্ঠা ১২৫৪-১২৫৮। ক. **হিত গ্রন্থাবলী**-১ম খণ্ড (হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১৩২০ চৈত্র। ক-ঠ পৃষ্ঠা ১৩৫৩-১৩৫৮। ক. **অজন্তা** (অসিত কুমার হালদার) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। খ. **পরাগ** (গঙ্গাচরণ দাস) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। গ. **পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ** (বীরেন্দ্র নাথ বসু) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঘ. **কমল কুমার** (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঙ. **সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত** (হাফিজল হাসান) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। চ. **জৈনধর্ম্ম** (উপেন্দ্রনাথ দত্ত) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ছ. **সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ** (নগেন্দ্র কুমার চন্দ্র) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। জ. Childs Simple Grammer (নগেন্দ্র নাথ চন্দ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঝ. **ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর** (শ্রীনাথ চন্দ) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ঞ. **শান্তিজল** (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়) সমা-সত্যব্রত শর্ম্মা। ট. **সমসাময়িক ভারত** (যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার) সমা-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠ. Orissa and Her Remains (Monmohon Ganguli) সমা-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

*★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, শ্রীউকিল রায়।***

স্বর্ণকুমারী দেবী : জীবনপঞ্জি

সংকলক পরেশনাথ দাস

১৮৫৬	আগস্ট ২৮, জোড়াসাঁকোয় জন্ম।
১৮৬৭	নভেম্বর ১৭ রবিবার, জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিবাহ।
১৮৬৮	কন্যা হিরণ্ময়ীর জন্ম।
১৮৭০	বোম্বাই গমন।
১৮৭১	পুত্র জ্যোৎস্নানাথের জন্ম।
১৮৭২	কন্যা সরলা জন্ম।
১৮৭৪ (?)	কন্যা উর্মিলার জন্ম।
১৮৭৬	ডিসেম্বর ১৫, **'দীপ-নির্ব্বাণ'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৭৭	**'ভারতী'** পত্রিকার সূচনা।
১৮৭৯	নভেম্বর ৪, **'বসন্ত উৎসব'** (গীতিনাট্য) প্রকাশিত।
১৮৭৯	নভেম্বর ৪, **'ছিন্নমুকুল'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৮০ (?)	কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিলার মৃত্যু।
১৮৮০	মার্চ ২৫, **'মালতী'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৮০	ডিসেম্বর ২০, **'গাথা'** প্রকাশিত।
১৮৮২	সেপ্টেম্বর ২৭, **'পৃথিবী'** (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) প্রকাশিত।
১৮৮৩	কারোয়ারে অবস্থান।
১২৯১	**'ভারতী'** পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ।
১৮৮২-৮৩	কারোয়ারে অবস্থান।
১৮৮২—৮৬	লেডিস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী।
১৮৮৬	আগস্ট ১২, **'সখিসমিতি'** প্রকাশিত।
১২৯৩	**'সখিসমিতি'** নামে মহিলাসমিতি স্থাপন।
১৮৮৭	জুন ১৭, **'মিবাররাজ'** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৮৭	দার্জ্জিলিং যাত্রা।
১৮৮৮	জানুয়ারি ৮, **'হুগলীর ইমামবাড়ী'** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৮৮	আগস্ট, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গাজিপুর ও কাশী ভ্রমণ।
১৮৮৯	মার্চ, **'গল্পসল্প'** প্রকাশিত।
১৮৮৯	কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে যোগদান।
১২৯৬	**'গাজীপুর'** পত্রের প্রকাশ।
১৮৯০	জানুয়ারি ২৩, **'স্নেহলতা'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।

১৮৯০	বোলপুর ভ্রমণ।
১৮৯০	কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদান।
১৮৯০	সোলাপুর গমন।
১৮৯০	আগস্ট ৯, '**বিদ্রোহ**' (ঐতিহাসিক উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৯২	দ্বিতীয়বার সোলাপুর গমন।
১৮৯২	মে ১৩, '**বিবাহ উৎসব**' (নাটক) প্রকাশিত।
১৮৯২	আগস্ট ১৭, '**নবকাহিনী**' (ছোটগল্প) প্রকাশিত।
১৮৯৪	সরলাকে নিয়ে মহীশূরের উদ্দেশ্যে সাতারা গমন।
১৮৯৫	ফেব্রুয়ারি ১৮, সম্পাদিত গ্রন্থ : '**হাসি ও অশ্রু**' (কাব্য) সরোজকুমারীদেবী।
১৮৯৫	মার্চ ১২, '**ফুলের মালা**' (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৮৯৫	মে, নীলগিরি ভ্রমণ।
১৮৯৫	ডিসেম্বর ১, '**কবিতা ও গান**' প্রকাশিত।
১৩০২	মাদ্রাজে উপস্থিতি।
১৩০২	মহীশূরে অবস্থান।
১৩০২	'**ভারতী**' পত্রিকার সম্পাদকতা ত্যাগ।
১৮৯৮	জুলাই, '**কাহাকে?**' (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৯০১	'**কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা**' প্রকাশিত।
১৯০২	'**সচিত্র বর্ণবোধ**' প্রকাশিত।
১৯০২	'**বাল্যবিনোদ**' প্রকাশিত।
১৯০৪	'**আদর্শনীতি**' প্রকাশিত।
১৯০৫	পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
১৯০৫	বৈদ্যনাথে অবস্থান।
১৯০৬	ফেব্রুয়ারি ২৬, '**দেবকৌতুক**' (কাব্যনাট্য) প্রকাশিত।
১৯০৬	'**কনে বদল**' (প্রহসন) প্রকাশিত।
১৯০৬	বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা।
১৩১৫	দ্বিতীয়বার '**ভারতী**' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ।
১৯১০	'**প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ**' প্রকাশিত।
১৩১৭	শিল্পসমিতির বিধবাশ্রমের সাহায্যে ভিক্ষা প্রার্থনা।
১৯১১	ফেব্রুয়ারি ২৮, '**পাকচক্র**' (প্রহসন) প্রকাশিত।
১৯১৩	এপ্রিল ১৭, '**রাজকন্যা**' (নাট্যোপন্যাস) প্রকাশিত।
১৯১৩	মে ২, স্বামীর মৃত্যু।
১৩২১	'**ভারতী**' পত্রিকার সম্পাদকতা ত্যাগ।
১৩২২	বৈশাখ, '**বিদায় গ্রহণ**' সম্পর্কিত রচনার প্রকাশ।
১৯১৬-১৭	**স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী**, ১ম—৬ষ্ঠ ভাগ প্রকাশিত। (বসুমতী)
১৯১৭	এপ্রিল ৩, '**নিবেদিতা**' (নাটক) প্রকাশিত।

১৯১৮	জানুয়ারি ২০, **'যুগান্ত কাব্যনাট্য'** প্রকাশিত।
১৯২০	মে ৭, **'বিচিত্রা'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৯২১	অক্টোবর ২৪, **'স্বপ্নবাণী'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৯২৩	জানুয়ারি ১৮, **'গীতিগুচ্ছ'** (স্বরলিপি) ১ম ভাগ প্রকাশিত।
১৯২৫	**'মিলনরাত্রি'** (উপন্যাস) প্রকাশিত।
১৯২৭	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক **'জগত্তারিণী'** স্বর্ণপদক লাভ। মহিলাগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই সর্ব প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন।
১৩৩৬	মাঘ ১৯ — ২১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রী।
১৯৩০	ফেব্রুয়ারি ২—৪, ভবানীপুর উনবিংশ বাৎসরিক সম্মেলনে সভানেত্রী।
১৯৩১	স্বর্ণকুমারী কর্তৃক তাঁর যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব **'সখি শিল্প সমিতি'**কে দান।
১৯৩২	**'বাল-বোধ ব্যাকরণ'** প্রকাশিত।
১৯৩২	জুলাই ৩, বালিগঞ্জের বাসভবনে মৃত্যু (১৩৩৯ আষাঢ় ১৯)।
